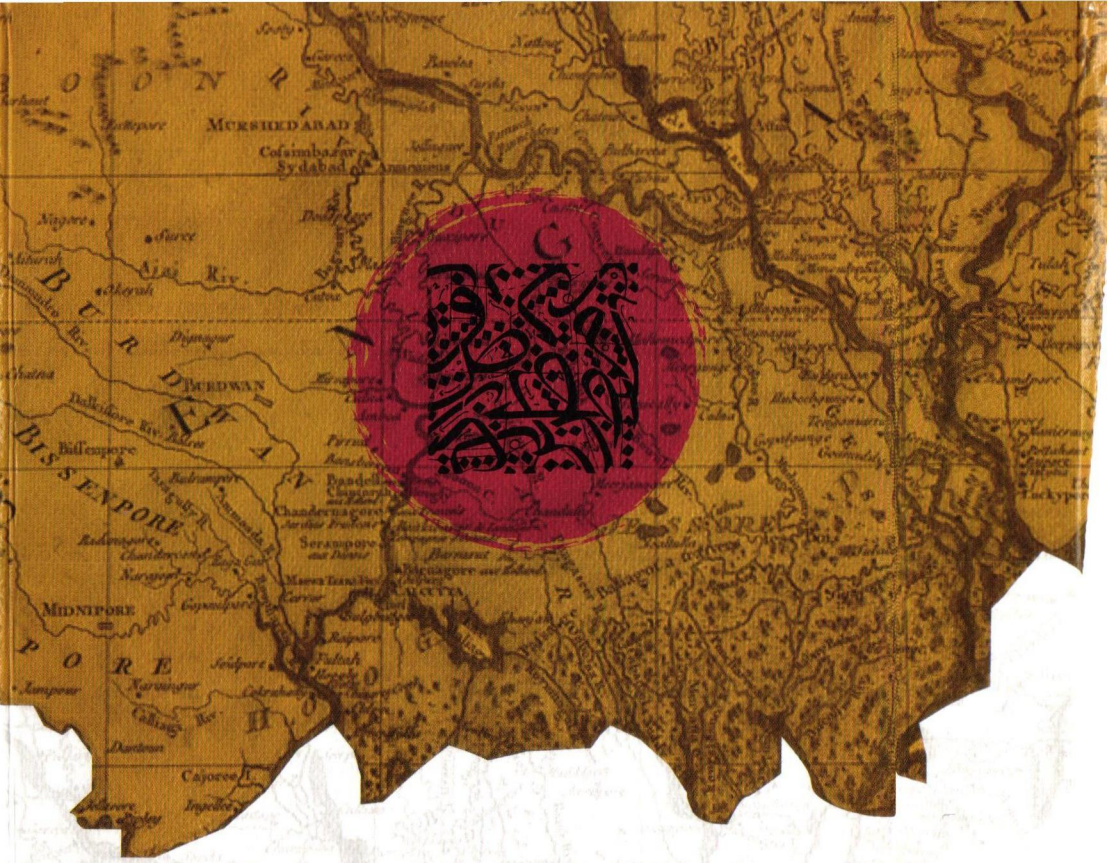

বাংলায় ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

ড. সায়ীদ ওয়াকিল।

জন্ম রাজশাহীতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রথম স্থান অধিকার করে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছেন এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু। অদ্যাবধি এই পেশায় রত আছেন। লেখালিখি তার জীবনের ব্রত।

লেখকের প্রকাশিত কিছু বই—*মুসলিম সভ্যতা সিরিজ* (১-৫ খণ্ড), *মিশর ও ইখওয়ান*, *আফগানিস্তান ও তালেবান*, *ফিলিস্তিন ও হামাস*, *অ্যা ডিভাইন স্টেট*, *ব্রিটিশ আমলে পূর্ব-বাংলায় স্থাপিত শিল্প-কলকারখানা* পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। *বাংলায় ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা* গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত তার প্রথম গ্রন্থ।

বাংলায় ইসলাম ও
মুসলিম সভ্যতা

বাংলায় ইসলাম
ও
মুসলিম সভ্যতা

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

https://nagorikpathagar.org

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	২৭ অক্টোবর, ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	আবদুর রহমান রাফি
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৫৫৮২-০-০
ফিক্সড প্রাইস	৩০০ টাকা

https://nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর বুকে মানুষের মতো ইতিহাসও অকাট্যভাবে সরল ও একরৈখিক পথে চলে না। সভ্যতার বিবর্তন, সাংস্কৃতিক রদবদল, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, এমনকি নেহায়েত জলবায়ুর প্রভাবেও ইতিহাসের গতিপথ ক্রমাগত বদলে যায়, পালটে যায় তার অভিমুখ ও গতি। বাংলার ইতিহাসও সময়ের জটিল ধারা পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আবর্তিত ও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের এই বহুরূপী ও বহুমাত্রিক বাঁক বদল এ অঞ্চলের ইতিহাসচর্চায় নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ প্রযত্নে আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে বাংলার ইতিহাস ঘিরে তৈরি হয়েছে নানাবিধ জল্পনাকল্পনা, মিথ, প্রোপাগান্ডা, অনুমান ও ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। এই বইটি সেইসব ভিত্তিহীন অনুমান ও অকেজো তত্ত্বের বিপরীতে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নির্মাণের প্রাথমিক প্রয়াস।

গ্রন্থটিতে একাধারে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা অঞ্চলের নিজস্ব ভূপ্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর প্রামাণ্য ইতিহাস। এর অনাড়ম্বর প্রাঞ্জল গদ্যে উঠে এসেছে বাংলায় মুসলমানদের আগমন, বিস্তার, শাসন ও সভ্যতা বিকাশের ইতিবৃত্ত। লেখক এখানে বাংলায় মুসলমানদের আগমনবিষয়ক প্রচলিত তত্ত্বসমূহকে কেবল পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং ঐতিহাসিকদের মতামত তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রস্তাব করেছেন এক নিরবচ্ছিন্ন ও পূর্ণাঙ্গ ধারাবিবরণী। প্রচলিত তত্ত্ব ও অনুমানের ঘূর্ণাবর্ত থেকে তিনি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ বয়ানে। তথ্য, তত্ত্ব, বিশ্লেষণ আর পর্যালোচনায় ঠাসা এ গ্রন্থ ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠকের খোরাক মেটাবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ উদ্ধৃতির সব কটি আঁটোসাঁটো (Indentation) করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। অভ্যন্তরীণ অক্ষরবিন্যাস ও সজ্জা সমুন্নত রাখতেই এমনটি করা হয়েছে। পাশাপাশি ফুটনোটের বাহুল্য এড়াতে গ্রন্থ শেষে একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, সচেতন পাঠক ও গবেষক এর মধ্য থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সূত্র কিংবা নিদর্শন খুঁজে পাবে।

https://nagorikpathagar.org

গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের ওপর ন্যস্ত করায় লেখকের প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ। কৃতজ্ঞতা জানাই বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সকল সহকর্মীর প্রতি। সবশেষে প্রত্যাশা—আমাদের অতীত দিনে দিনে আরও বেশি পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠুক, আগামী হোক সত্যের মতোই অটুট ও অকাট্য।

নূর মোহাম্মদ
বাংলাবাজার, ঢাকা।

https://nagorikpathagar.org

॥ সূচিপত্র ॥

ভূমিকা ॥ ৯

বাংলার পরিচিতি : জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক অবস্থান ॥ ২৭

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন : প্রচলিত মিথ ও মিথ্যা ॥ ৩৬

বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার : রাজশক্তির ভূমিকা ॥ ৪৩

বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়ামক শক্তি ॥ ৭০

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ॥ ১১০

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ॥ ১৩৪

নগর, দরবার, গার্হস্থ্য ও বিনোদন ॥ ১৪২

মুসলিম শাসনামলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ॥ ১৬৮

নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা ॥ ১৭৫

মুসলিম বাংলায় শিল্পের বিকাশ ॥ ১৭৮

বাংলার অতুলনীয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ॥ ১৮৮

বাংলার মুদ্রা ও প্রশাসন ॥ ২০৪

বাংলার চারুকলা ও লিখনকলা ॥ ২১২

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ২১৮

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

০১

পৃথিবীর ইতিহাসে 'বাংলা' নামক ভূখণ্ডটি বর্তমানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃত এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্ম-পরিচয়ে মুসলিম। বর্তমানের মুসলিম দেশসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশ লাগালাগি অবস্থান করছে। কিন্তু বাংলা এমনটি নয়। কীভাবে এবং কেনই-বা এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম, তা জানার জন্য অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রায় দেড় শ বছর ধরে বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্যের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চলছে নানা বিতর্ক। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খান বলেন—

> চিরাচরিত প্রজ্ঞামতে ইতিহাস কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয় না; ইতিহাস নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই এবং যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলোও নিশ্চিত নয়। তথ্যের অভাবে বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে সকল আলোচনাই অনুমান অথবা তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।

ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী—আশরাফ শ্রেণির মুসলমানদের বসতি স্থাপন, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ, বৌদ্ধদের ইসলামে দীক্ষা এবং সুফি দরবেশদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম। চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে, ঐতিহাসিকগণ এই পাঁচটির যেকোনো একটিকে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে মতবাদটি জনপ্রিয় হয়েছে তা হলো—বাংলাদেশে সুফি, দরবেশ ও পীরগণ ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। ড. আকবর আলী খান বলেন—

> এই তত্ত্বের দুর্বলতা হলো মুসলমান সুফি, দরবেশ ও পীরগণ ইসলামের বাণী নিয়ে শুধু বাংলা প্রদেশেই আসেননি, ভারতের সর্বত্র তারা গিয়েছেন। এই পীরেরা কেন শুধু বাংলায় সফল হয়েছেন, অথচ ভারতের সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছেন, তারও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

https://nagorikpathagar.org

খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কীভাবে এ সময়ে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছে, তার সকল বিবরণ নিশ্চিত জানা যায় না। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ বলেন—

> বাংলাই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রসারের গতি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসরণ করেনি। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বহু পূর্বেই বাংলায় মুসলিম বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এ অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি আছে। এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে ইসলামি সংস্কৃতির মূল ভাব, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও যুক্তিবাদিতার প্রসারই হয়েছিল বেশি।

ড. আবদুল করিম বলেন—

> মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে সুফি দরবেশ এসেছিলেন কি না ইতিহাস তা বলতেও পারে না। তবুও পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি ও সোলেমান, সুরদাদবেহ, আল ইদ্রিসী, আল-মাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদুদল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়।

মূলত তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির বিজয়ের পরই ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস পায়। আর জনসাধারণের মাঝে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধর্মবেত্তাগণ। এ কাজে তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ কথা স্বীকার্য যে, রাজশক্তি ভিন্ন বিশ্বে কোথাও ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তা-ই নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অভাব হেতু অনেক জায়গায় মুসলমানগণ পুরোপুরিভাবে উৎখাত হয়ে গেছেন সুদীর্ঘকালের ইসলামি খিলাফতের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও। স্পেন আমাদের সামনে তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বিনির্মাণে রাজশক্তিই সর্বদা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে; বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে পীর-মাশায়েখ-আউলিয়াদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর ভেতরে সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষক শ্রেণি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা নিয়ে আধুনিক সময় পর্যন্ত তেমন মাতামাতি আছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

https://nagorikpathagar.org

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—বাংলায় এত মুসলমান কোথা থেকে এলো? বেভারলি বলেন—'বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্যের কারণ হলো, বিপুলসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে।' ড. আকবর আলী খান বলেন—

> ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, বাংলাদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। খোন্দকার ফজলে রাব্বি, ডক্টর আবদুর রহিম ও ডক্টর মোহর আলি মনে করেন যে, বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর; ধর্মান্তরিত হিন্দুরা মুসলমান জনসংখ্যার বড় বংশ নয়।

বাংলাদেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক নৃতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করেন হার্বার্ট রিজলি নামক একজন সিভিলিয়ান। এই জরিপের ফলাফল ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। রিজলির মতে, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের (যেমন : পাদ, কোচ ও চণ্ডাল) লোকজনের মিল বেশি। ফলে রিজলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, বাংলার মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বেভারলি ও রিজলির বক্তব্য সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি। তিনি বলেন—বাংলার মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়নি; তাদের অধিকাংশই পশ্চিম এশিয়া হতে আগত অভিবাসী আশরাফ মুসলমানের সন্তান। তিনি বলেন, রিজলির জরিপ ২৮৫ জন বাঙালি গরিব মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এরা ছিল জেলের কয়েদি। দ্বিতীয়ত, রিজলি হিন্দুদের ১৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করে জরিপকার্য সমাধা করলেও সব মুসলমানকে একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন। তৃতীয়ত, রাব্বি দাবি করেন—দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বাস করার ফলে মুসলমান অভিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও মুসলমান অভিবাসী আর হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চেহারায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি আরও দাবি করেন, ভারতের ৫৬২ বছরের অবিচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনামলে এমন কোনো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলায় দলে দলে মানুষ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, আরব ও ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমানদের বাংলায় অভিবাসনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এজন্য বাঙালি মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা ও উচ্চারণ বাঙালি হিন্দু থেকে ভিন্ন। ড. আকবর আলী খান বলেন—

> রিজলির পরিমাণ ভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দুর্বলতাগুলো রাব্বি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাংলার বেশির ভাগ মুসলমানই যে অভিবাসীদের সন্তান, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারেননি।

https://nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি অনুল্লিখিত থাকার কারণে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, ধর্মান্তকরণ আদৌ ঘটেনি। কিন্তু বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের অনুমানকে সমর্থন করে।

রিজলি সাহেবের কাজের সময় তাঁকে সহায়তা করেছিলেন বাবু কুমুদ বিহারী। ড. রাব্বি বলেন—'আমি তাঁর নিকট জানতে পারি যে, তিনি (রিজলি) ইচ্ছা করেই উচ্চ বংশজাত, সম্মানযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের মাপজোখ গ্রহণ করেননি; কেবল নিম্নতম শ্রেণির মুসলমানদের মাপজোখই গ্রহণ করেছেন।' তিনি আরও লেখেন—

> রিজলি সাহেবের মতানুযায়ী দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুন্দর নাক ও মোটামুটি সুশ্রী মুখমণ্ডল যদি একটি উৎকৃষ্টতর জাতির লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে একই শ্রেণির হিন্দুদের চাইতে উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যেই সেগুলোর সাক্ষাৎ অধিক পরিমাণে মিলবে। এ দুটি জাতির কেবল নাকের পরীক্ষা থেকেই এ কথা প্রমাণিত হবে যে, এ দেশের অধিকাংশ মুসলমান বাংলার আদিম জাতি ও উপজাতির বংশধর নয়।...
>
> বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কারণ, অধিকাংশ পরিবারই এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে যে, ঐ সমস্ত পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত তাদের কুল এবং পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত বিবরণের কথা খুব সামান্যই জানে। অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য তাদের এত বেশি নিম্ন পর্যায়ে এনেছে যে, তারা এখন জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আকবর আলী খান বলেন—

> যদিও অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নরগোষ্ঠীর শ্রেণি বিচারে সমরূপ; তবুও বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান অভিবাসী যে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে অবিসংবাদিত প্রমাণ রয়েছে। বাংলার কিছু মুসলমানের জন্ম হয়েছে স্থানীয় ও অভিবাসী মানুষের সংমিশ্রণে।...
>
> বিতর্কের মূল বিষয় তাই দাঁড়িয়েছে, বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার কত অংশ অভিবাসী, তা নির্ধারণ করা। ১৯০১ সালে ই. এ. গেইট বাংলার আদমশুমারি পরিচালনা করার সময়ে মুসলমানদের শতকরা কত অভিবাসীদের বংশধর, তার একটি হিসাব করার চেষ্টা করেন। তার মতে সেই সংখ্যাটা ১৬.৬ শতাংশের অধিক হওয়া সম্ভব নয়।

https://nagorikpathagar.org

গেইটের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে ১৯০১ সালে এ. এ. গজনভি অনুমান ব্যক্ত করেছিলেন—'আমার ধারণা, মোটামুটিভাবে এখনকার শতকরা ২০ ভাগ মুসলমান বিদেশি অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ বংশধর, শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।' ড. মোহর আলিও গেইটের উপরিউক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁর অভিমত হচ্ছে—'বাংলায় অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।' তিনি আরও বলেন—'সাহিত্যিক, নৃতাত্ত্বিক ও বাংলার মুসলমানদের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রায় ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে।' ঐতিহাসিক ড. অতুল সুর বলেন—

> বাংলার মুসলমানদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—আগন্তুক মুসলমান, ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং সংমিশ্রিত মুসলমান। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাংলার মুসলমান শাসক ও পাঠান সুলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আনীত বিদেশি মুসলমানদের বংশধর। দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যারা স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণির মুসলমান হচ্ছে উপরিউক্ত দুই শ্রেণির সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তার মতে এই সকল মুসলমানদের উদ্ভব ঘটেছিল সাড়ে ৫০০ বছরের মধ্যে (১২০৩-১৭৬৫)। এরপরের মুসলমানদের তিনি দেশজ মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।...
>
> জোর জুলুম করেই যে মুসলমান করা হতো, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হতো। এরা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকা দ্বারা আকৃষ্ট হত। খানকাগুলো ছিল মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া-দাওয়া দুই-ই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল দেশে দাসদাসীর ব্যবসা। অসময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে মেয়ে বেচে দিত। মুসলমানরা তাদের কিনত এবং তাদের ধর্মান্তরিত করত। উচ্চশ্রেণির বর্ণ হিন্দুরা কমই ধর্মান্তরিত হতো। মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোনো জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন,

https://nagorikpathagar.org

তাহলে তাঁকে সপরিবার মুসলমান করা হতো।...এক কথায়, বাঙালি মুসলমান বাঙালি; তারা আগন্তুক নয়।

ড. এবনে গোলাম সামাদ বলেন—

পালদের পরে আসেন সেন রাজারা (১০৯৫-১২০০ খ্রি.)। সেন রাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু এবং তারা বাংলার লোক ছিলেন না। এরাই বাংলায় বর্ণাশ্রম (Caste System) চালু করে এবং এদের অত্যাচারে বৌদ্ধরাই সম্ভবত দলে দলে গ্রহণ করে ইসলাম। এই প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সারা ভারতের শতকরা ৩৬ ভাগ মুসলমানের বাস বাংলায়। প্রধানত বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতেই তাদের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কখনোই পুরোপুরি হিন্দু ছিল না। এই অঞ্চলে মুসলমান আগমনের আগে প্রচলিত ছিল এক ধরনের বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করত অশুচি। এই অপমানিত বৌদ্ধরাই পাঠান আমলে বিশেষভাবে সাড়া দেয় ইসলামের ডাকে।

ড. এবনে গোলাম সামাদ মনে করেন, বাংলায় যেসব মুসলমান আসেন তাদের মধ্যে মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা (পাঠান) অধিকসংখ্যক এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের লোক বেশি। তিনি বলেন—

মুসলমান নৃপতিরা জোর করে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল, এই মতে আর স্থির থাকা যাচ্ছে না। কেননা, ১৮৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ক্রমশ মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে। মুসলমান নৃপতিদের আমলে নয়, ইংরেজ শাসনামলে এ দেশে ঘটেছে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি। আর ইংরেজ আমলে জোর করে হিন্দুকে মুসলমান করার সুযোগ ছিল না। তাই বলা চলে না, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ হিন্দুদের বল প্রয়োগ করে মুসলমান করা।...

বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব এসেছে দুটি ভিন্ন দিক থেকে। স্থলপথে মধ্য এশিয়া থেকে এসেছে তুর্কিরা; আফগানিস্তান হয়ে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আরব মুসলমান বণিকরা এসেছেন দক্ষিণের সমুদ্র পথ ধরে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান এখন তুর্কিদেরই মতো হানাফি মাজহাবভুক্ত। ইসলামি আইনের যে ব্যাখ্যা তারা মানেন,

https://nagorikpathagar.org

তা ইমাম আবু হানাফি (রহ.) প্রদত্ত। কিন্তু দক্ষিণ আরবের লোক শাফেয়ি মাজহাবভুক্ত এবং ইন্দোনেশিয়াতেও শাফেয়ি ফিকাহ প্রচলিত। কেননা, ইন্দোনেশিয়াতে আরব বণিকরাই ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, বাইরে থেকে অনেক মুসলমান এখানে এসে বসতি করেছিলেন। অন্যদিকে বহু স্থানীয় বাসিন্দাও গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম। এ দুয়ে মিলেই গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাদেশের মুসলিম জনসমাজ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের একটি বড় কারণ হলো বাইরে থেকে এই অঞ্চলে অনেক মুসলমানের আগমন ও বসতি স্থাপন। বাংলার উর্বর ভূমি ও বাণিজ্য সম্পদ তাদের আকৃষ্ট করেছিল। আর বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে প্রধানত তাদের অধিক প্রজনন (Superior Fertility) হারের কারণে। কেবল বাংলাদেশে নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের জন্মহার অধিক। মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ এবং উন্নতমানের আমিষ খাদ্য গ্রহণ এই উচ্চ জন্মহারের সহায়ক।[১]

বাংলাদেশ রাজশক্তি কর্তৃক বিজিত হয়েছে; ফলে এখানে দ্রুত অভিবাসন ঘটেছে। আলিম-উলামা, সুফি এবং প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর এভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরও বাংলা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত হতে সক্ষম হয়নি। বিশ্বাস করা হতো, বাংলা প্রদেশও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একটি হিন্দু প্রদেশ। ১৮৭২ সালে বাংলায় প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আদমশুমারিতেই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, বাংলায় প্রায় ৫০ শতাংশ লোক মুসলমান। ১৮৭০ সালের বাংলা প্রদেশে মুসলমান ছিল ১ কোটি ৭৬ লাখ, কিন্তু ১৯০১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ১৫ লাখে। এই যে ত্রিশ বছরে প্রায় ৪০ লাখ মুসলমান বৃদ্ধি পেল; এতে কিন্তু কোনো অভিবাসন, ধর্মান্তর, জোরজবরদস্তি কিংবা পীর-সুফিদের কেরামতি প্রয়োজন পড়েনি। এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সর্বপ্রথম বাংলার হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা, গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায়। এতে প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যায় সামান্য তারতম্য ছিল। ১৮৮১ সালে

---

[১] এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম* (রাজশাহী : পরিলেখ, ২০১৯) পৃ. ২৯-৩১

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় সেন্সাস রিপোর্টে ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ জনসমষ্টির মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বেশি হয়। মোটকথা শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিকসূত্রে মিশ্র রক্ত ধারার মানুষ—এ বিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন এবং বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও মুসলমান সমাজের পত্তন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালি মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০২

সুন্দরচিত্ত মানুষের প্রভাবেই সভ্যতা সৃষ্টি হয়। পরস্পরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, স্রষ্টা ও পরকালে বিশ্বাস, নারীর প্রতি সম্মান ও সমদর্শিতা সভ্যতার অনিবার্য গুণ বলে অনেকের বিশ্বাস। কেউ কেউ মনে করেন, সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সভ্যতার বিশেষ লক্ষ্য নয়। রোমকদের চেয়ে রোম বিজয়ী বর্বরদের সভ্য বলা বাতুলতা, আর মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতিবিধ্বংসী তাতার জাতি যে জানোয়ারের বাড়া ছিল না, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত।[২]

প্রাচীনপন্থি ঐতিহাসিকদের মতে, বিভিন্ন সময়ে মাত্র চারটি দেশ সুসভ্য হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০ অব্দের আথেনীয় সভ্যতা, রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের সভ্যতা, রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় সভ্যতা আর সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফরাসি সভ্যতা। আধুনিকরাও এই মতে সমর্থন করেন, তবে রোমকে সুসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করতে তারা নারাজ। অনেকের মতে, কোনো যুগেই রোম বর্বরতার সীমা অতিক্রম করে সুসভ্য হতে পারেনি। রোমে আলোক ও মাধুর্যের সাধনা গভীরভাবে হয়নি। প্রগাঢ় প্রেম, সুগভীর সৌন্দর্যাবেগ ও সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষমতা রোমকদের ছিল না বললেই চলে। রুচির ব্যাপারে তারা তেমন উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে পারেনি। আইনের ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ তারা দেখিয়েছে, তাও গ্রিক প্রভাবের ফল। তবে গ্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈততা নেই। অনেকের মতে, মলোস থেকে অ্যারিস্টটল ও আলেকজান্ডার পর্যন্ত (৫৮০-৩২৩) যে সুদীর্ঘকাল, তা ছিল সভ্যতার ঐশ্বর্য যুগ। বোকাচিওর মৃত্যু থেকে রোমের লুণ্ঠন অবধি ইতালীয়রা এমন এক উঁচু সভ্যতা সৃষ্টি করে, যার সম্বন্ধে কোনো প্রকার মতদ্বৈততা নেই।[৩] আর ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ—এই সময়ব্যাপী ফরাসি জাতি যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল, তা

---

[২] মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সভ্যতা* (ক্লাইভ বেল অবলম্বনে), (ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ৯-১৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

https://nagorikpathagar.org

পেরিক্লিসীয় সভ্যতার[৪] মতোই বিখ্যাত ছিল। সুসভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন হলো সপ্ত-অষ্টাদশ শতকের এই ফরাসি সভ্যতা।[৫]

সকল ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতো লন্ডনের ব্রুমসবারি গ্রুপের (১৯০৭-১৯৩০) অন্যতম চিন্তক ক্লাইভ বেলও মুসলমানদের সভ্যতাকে এড়িয়ে গেছেন, এড়িয়ে গেছেন চৈনিক সভ্যতাকেও। তবে তিনি এতটুকু বলেছেন—

> সুরুচি ও মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী হলেও কোনো সুস্পষ্ট চেহারা নেই বলে তাকে (টাংসাং যুগীয় চৈনিক সভ্যতা) আমাদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। হাফিজ, উমর, বুলবুল, সাকির পারস্যকেও একই কারণে বাদ দেওয়া গেল। পারস্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত স্বল্প যে, অনেক সময় পারস্য সভ্যতাকে খেলাফতের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়। আর শাহদের মোগল সম্রাট বলে ভুল করা হয়। বিরাট মুসলিম সভ্যতার ধারণা এই ভুলের গোড়ায়। মুসলিম সভ্যতা বিশেষ দেশে ও কালে পুষ্পিত হয়ে ওঠে; অসীম কাল ও স্থানে ছড়িয়ে পড়ে না। এ ধারণার অভাব হলে সুসভ্যতা নিরূপণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন মুসলিম দেশকে একত্রে সাধারণভাবে মুসলিম সভ্যতা বলা যায়; কিন্তু বিশেষভাবে যখন কোনো দেশ কোনো সময়ে সভ্যতার আরাধনা করে, তখন তাকে সাধারণ নামে অভিহিত না করে বিশেষ নামে অভিহিত করা ভালো। দেশের নামানুযায়ী বা যুগের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তার নামকরণ করা উচিত।[৬]

ক্লাইভ বেলের মতে—'রাষ্ট্র আর সভ্যতা এক জিনিস নয়। রাষ্ট্র সভ্যতা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না।' তিনি আরও বলেন—

> রাষ্ট্রের কাজ নিরাপত্তা ও অবসর সৃষ্টি করা; কিন্তু সেই নিরাপত্তা ও অবসর নিয়ে মানুষ কী করবে তা নির্ধারণের ভার রাষ্ট্রের ওপর নয়, মানুষের ওপর।... অতীত ও বর্তমানের উৎকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহ যখন মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে এবং তাদের উপযুক্ত মূল্য দেয়, তখনই সত্যতার সৃষ্টি হয়। তাই সভ্যতার জন্য প্রতিভার চেয়ে সমঝদারির প্রয়োজনীয়তা বেশি। কেননা, সমঝদারির ফলেই আলোক ও মাধুর্যের বিকিরণ সম্ভব হয়। আর তাদের বিকিরণই সত্যতা।[৭]

---

[৪] পেরিক্লিস ছিলেন একজন অভিজাত বংশীয় গ্রিক জেনারেল। তার নেতৃত্বে এথেন্সের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। ইতিহাসে তার যুগকেই 'পেরিক্লিস যুগ' বলা হয়।

[৫] মোতাহের হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

https://nagorikpathagar.org

অনেকে সভ্যতা বলতে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানকে বুঝিয়ে থাকেন। যোগাযোগব্যবস্থা, স্থাপত্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকারখানা, উৎপাদন যন্ত্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সভ্যতার নিদর্শন হতে পারে। তবে সংস্কৃতি অবস্তুগত হলেও সভ্যতা সূর্যের আলোর মতোই স্পষ্ট। এটাকে কোনো দেশের গণ্ডির মধ্যে রাখা যায় না, এটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

সভ্যতার বড়ো বিশেষত্ব হচ্ছে শহর। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহ সিন্ধু, গঙ্গা, নীলনদ, হোয়াংহো, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। উত্তর আফ্রিকার মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার সুমের—উভয় স্থানেই প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল ছিল। তাই এসব জায়গায় শহর গড়ে ওঠে। উভয় স্থানেই স্বাভাবিক সেচের সুবিধা ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সময়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল মাটির তৈরি পাত্র। পরবর্তী সময়ে পাথরের কারুকার্যেও মানুষ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। তামা গলিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি তারা ব্যবহার করতে শেখে। তামার সঙ্গে টিন ও সিসা মিশিয়ে আবিষ্কার করে ব্রোঞ্জ। মিশরের রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে মাটির পাত্রে পালতোলা নৌকার চিত্র এবং সিরিয়া, সুমেরে ষাঁড় দিয়ে টানা চার চাকার গাড়ি প্রভৃতি সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মিলনস্থল পরিচিত ছিল সেন্নার নামে। সেন্নারের সমুদ্র অঞ্চলে সুমেররা এবং উত্তর দিকে আক্কাডিয়ানরা বাস করত। সুমের ও আক্কাডিয়ানরা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম মৃত্তিকা স্তূপের ওপর শহর, গ্রাম ও মন্দির নির্মাণ করেছিল। এরা উন্নত বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটা এবং যন্ত্রের সাহায্যে সেচ দেওয়া জানত। এখানে কয়েক শ জমিদারি ছিল। উৎকৃষ্ট জমিগুলো জমিদাররা নিজেদের দখলে রাখত। কৃষকদের উচ্চহারে খাজনা প্রদান করতে হতো এবং জমিদারদের জমিতে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হতো। প্রাসাদ ও মন্দিরের চারিদিকে ছিল কারিগরদের বসতি। সময়ের পরিক্রমায় অনেক জমিদারের ওপর বিজয়ী জমিদার 'ইসাক' বা রাজা হয়ে বসে। এসব ইসাকরা নিজেদের ঈশ্বরের বংশধর বলে দাবি করত। একসময় সকলের চেয়ে প্রতিপত্তিশালী সামন্তপ্রভু হয়ে বসেন আক্কাডার রাজা সারুকেনু। সেন্নারের সকল সামন্ত তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তিনি সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করেন এবং সুমের ও আক্কাডিয়ানদের যুক্তরাজ্য সেন্নার গড়ে তুলেন ২৬৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

ব্যাবিলনের ষষ্ঠ রাজা হাম্বুরাবি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৫০ সালে সুমেরদের পরাজিত করে ব্যাবিলন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। সুমের ও আক্কাডিয়ানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুছে যায়

https://nagorikpathagar.org

এবং সেন্নারের নাম হয় ব্যাবিলন। ধীরে ধীরে ব্যাবিলন সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তী টাইগ্রিসের উপরিভাগ ইরান সীমান্তে বসবাসকারী এসিরীয় জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০-৬৬৮ সালের মধ্যে এসিরীয় বাহিনী সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও আর্মেনীয়া জয় করে। ব্যাবিলন স্বেচ্ছায় সিরিয়ানদের বশ্যতা স্বীকার করে। একপর্যায়ে এসিরীয় রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটলে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৬ অব্দে ক্যালডিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পারসিয়ান রাজা কাইরুস খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৭ সনে টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর জয় করলে মাত্র ৯০ বছরের ক্যালডিয়ান রাজত্বের অবসান ঘটে। ক্যালডিয়ান ও পারসিক সামন্তপ্রভুদের আমলে বিজিত দেশের লোকদের নির্মমভাবে শোষণ করা হতো। পারসিক রাজারা পুরোহিতদের খুশি করার চেষ্টা করত। ফলে পুরোহিতরা ঘোষণা করেছিল, রাজা কাইরুস ও তার উত্তরাধিকারীরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ক্যালডিয়ান ও পারসিয়ানদের রাজত্বকালে ব্যাবিলন সমগ্র প্রাচ্যের বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্যালডিয়ান রাজা নেবুচাঁদ নেজারের সময় ব্যাবিলনে মন্দির, অট্টালিকা ও প্রমোদকুঞ্জ তৈরি হয় এবং কয়েকটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানেরও আবির্ভাব ঘটে। ব্যাংকারদের তত্ত্বাবধানের বহু শিল্প গড়ে ওঠে।[৮] পারসিয়ানদের পতন পর্যন্ত ব্যাবিলন অর্থনৈতিক, ব্যাবসায়িক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সনে গ্রিকরা ব্যাবিলন দখল করে।

সেন্নারের মতো মিশরেও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তারাও বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, বাড়িঘর, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেছিল। খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর ৩০ থেকে ৪০টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০০ অব্দে সারা মিশর একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মিশরের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সকলের ওপরে ছিল রাজা, তারপর সামন্ত জমিদার ও মন্দিরের পুরোহিত। এখানে প্রায় সাতাশটি রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল।[৯] পরবর্তী সময়ে ফারাও (রাজা) শাসিত মিশর বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে হোয়াংহো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা। খ্রিষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগেই এখানে সামন্ত নৃপতিরা রাজত্ব করত। তবে চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ১১২২ সাল থেকে। তখন এই সামন্ত রাষ্ট্রের শাসক ছিল চৌ রাজবংশ। এ সময় চীনে একশ বড়ো সামন্ত এবং পনেরো শ ছোটো সামন্ত ছিল। সিল্কের পোশাক, রাস্তাঘাট, বাঁধ ও প্রাসাদ নির্মাণে এরা দক্ষতা অর্জন করেছিল। তেমনিভাবে সিন্ধু সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা ও রোমান সভ্যতা বিশ্বের বুকে নিজেদের অমর কীর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

---

[৮] রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৪১

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

https://nagorikpathagar.org

নীলনদের উপত্যকা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের তীরভূমি এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বতটে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তারই নবীন উত্তরাধিকারী মুসলমানরা। আটলান্টিক সাগরের বিস্তীর্ণ বালুতট থেকে চীনের নিবিড়তম অঞ্চল পর্যন্ত এই নবীন বিশ্বজয়ীরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আয়তনে এই সাম্রাজ্য ছিল সুবর্ণ যুগের রোম সাম্রাজ্যের চেয়েও বিশাল। ত্বরিত ও ব্যাপক এই বিস্তার ইতিহাসে নজিরবিহীন। বর্ণ, ভাষা ও আকৃতিতে ভিন্ন যে অজস্র জনগোষ্ঠী আরবীয় রাজদণ্ডের আওতায় আসে; তার তুলনায় হেলেনীয়, রোমান, অ্যাংলো-স্যাকসন বা রাশিয়ান সাম্রাজ্যও তুচ্ছ। আরবীয়রা শুধু এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে তোলেনি, সৃষ্টি করেছিল এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির। গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির ধারায় পরিপুষ্ট আরবীয়রা এই সংস্কৃতির নির্যাস পৌঁছে দিয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপের বিদগ্ধজনের কাছে। আবরীয় এবং আরবিভাষীদের অগ্রণী ভূমিকাতেই মধ্যযুগে মানবসভ্যতার বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেছিল। ব্যাবিলনীয়, ক্যালডীয়, হিট্টাইট এবং ফিনিশীয়রা আজ বিলুপ্ত, কিন্তু আরবীয় এবং আরবিভাষীদের অস্তিত্ব আজও প্রখরভাবে বিদ্যমান।[১০] মক্কায় মহানবি (সা.)-এর উত্থান থেকে আব্বাসীয়দের পতন (১২৫৮ খ্রি.) এবং পরবর্তী সময়ে উসমানীয়দের উত্থান—পুরো মধ্যযুগজুড়ে মুসলিম ভূখণ্ডে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা-ই মূলত মুসলিম সভ্যতা হিসেবে পরিচিত। পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের নির্যাস থেকে সমৃদ্ধ হলেও এ সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্য স্বীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সভ্যতার শিল্পকলা, চিত্রকলা, লিপিকলা ও স্থাপত্য অবশ্যই স্বতন্ত্র এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। মুসলিম সভ্যতা বিকাশের একেবারে শেষের দিকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। মুসলিম চিন্তাধারার ধারক ও বাহকেরা এখানেও ইসলামি সভ্যতার সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণভাবে মনে করা হয়—মধ্য এশিয়া থেকে যেসব তুর্কি বা তুরানি মুসলমান এই উপমহাদেশে এসে রাজ বিস্তার করেছিলেন, তাদের কোনো উন্নত সংস্কৃতি বা সভ্যতার ঐতিহ্য ছিল না; তারা কেবলই ছিলেন রণনিপুণ যোদ্ধামাত্র। কিন্তু এ ধারণা মোটেও সত্য নয়। তারা এই উপমহাদেশে মধ্য এশিয়া থেকে বহন করে এনেছিলেন একটা উন্নত সভ্যতার ঐতিহ্যকে।[১১] মুসলমান শাসকদের সঙ্গে বঙ্গদেশে কেবল ইসলাম ধর্ম আসেনি, একটা বিশাল অঞ্চলের বিচিত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতাও এসেছিল।[১২]

---

[১০] ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১-২; অনু. জয়ন্ত সিংহ ও অন্যান্য।

[১১] এবনে গোলাম সামাদ, *আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (রাজশাহী : পরিলেখ, ২০১৯), পৃ. ৩২

[১২] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা : অবসর, ২০১২), পৃ. ২৯

https://nagorikpathagar.org

বাংলায় আগমনকারী মুসলমানগণ মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন। এসব অঞ্চল বাংলা বিজয়ের পরপরই ইসলামি সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। যদি স্থাপত্যের কথাই ধরি, তাহলে দেখব—বাংলা বিজয়ী মুসলিমগণ মধ্য এশিয়া থেকে একটি পূর্ণ মুসলিম স্থাপত্যের ধারণা নিয়েই বাংলায় এসেছিলেন। তারা তাদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন স্থানীয় ভাবধারার। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুনত্বের। মুসলমানগণই এ দেশে খিলান, গম্বুজ ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন। পাথরের স্বল্পতা হেতু নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ব্যবহার করলেও তারা ইমারতের বহিঃগাত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তরটালি (Slab) ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যমান নিদর্শনাবলি থেকে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলো ছিল ক্ষুদ্রাকার এক কক্ষবিশিষ্ট এবং ছাদ উঁচু শিখরে আবৃত। মুসলিম শাসনামলে নির্মিত স্থাপনাগুলো বিস্তৃত এবং দোচালা ও চৌচালা ছাদবিশিষ্ট। বাংলার বাঁশ-খড়ে নির্মিত জীর্ণ কুটিরের বক্রাকার চালা মুসলিম শাসনামলে ইট নির্মিত হয়ে দেখা দেয়। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে মুসলমানগণ তাদের স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন। অলংকরণের বিষয়বস্তুতে জীবন্ত প্রতীক ও ভাস্কর্যের স্থলে তারা বিমূর্ত প্রতীক, প্যাঁচানো লতাপাতা, লিপিকলা, গোলাপ নকশা ও জ্যামিতিক নকশার প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সময়ে মুসলিম স্থাপত্যের নির্মাণ উপকরণ, নির্মাণ কৌশল, নির্মাণ কাঠামো ও অলংকার বাংলার মন্দির স্থাপত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

আরব সভ্যতা (ইসলামি সভ্যতা) বলতে আমরা যা বুঝি, তা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আদৌ আরবীয় নয়। এর মধ্যে আরবের যেটুকু অবদান ছিল, তা ভাষাগত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। খলিফাদের আমলে সিরীয়, পারসি, মিশরি, মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত বা খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা ছিল সমাজে আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রতীকস্বরূপ। আরব ইসলামি সভ্যতা তৃণমূলে গ্রিক, সিরীয় ও ইরানি সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। বিরাট অর্থে, যে সাবেক সেমেটিক সভ্যতা এসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, আরামীয়, ফিনিশীয় ও হিব্রু ধারার মারফত বিকশিত হয়; তারই যুক্তিযুক্ত পরিণতি ছিল আরব ইসলামি সভ্যতা। এই সভ্যতার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার ঐক্য পরিণতি লাভ করে।[১৩]

সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য শিল্প এক ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এই স্থাপত্য দিল্লির সুলতানি অথবা পশ্চিম এশিয়ার সামসময়িক স্থাপত্য থেকে ভিন্নতর। এই শিল্প পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য থেকে বহুলাংশে নীত, তবুও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে

---

[১৩] ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, অনু. জয়ন্ত ও অন্যান্য (কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৯৩

https://nagorikpathagar.org

বাংলার স্বকীয় শিল্পরূপ এবং পদ্ধতি এই নতুন ধারায় বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখে।[১৪] পূর্ববর্তী রোমান স্থাপত্য শিল্প ব্যতীত যেমন গথিক স্থাপত্য অথবা প্রাচীন গ্রেকো-রোমান, সিরীয়, বাইজান্টাইন ও সাসানীয় কলা ছাড়া যেমন প্রাথমিক মুসলিম স্থাপত্যের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনিই বাংলাদেশেও মোগল নির্মাণ শিল্পের গঠন ও বিকাশ পূর্ববর্তী সুলতানি স্থাপত্যের প্রভাব ছাড়া কল্পনা করা যায় না। মসজিদ ও সমাধি, মিনার ও ঈদগাহ, দুর্গ ও কাটরা, রাজপ্রাসাদ ও হাম্মামখানা, কদম রসূল ও ইমামবাড়া ইত্যাদি পূর্ববর্তী দুটি প্রাচীন রীতির ফসল—একটি সুলতানি স্থাপত্য ধারা এবং আরেকটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম শৈলী।

স্থাপত্য যদি মুসলিম শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে মুসলিম স্থাপত্যের প্রাণরূপী প্রধান অঙ্গ মসজিদই সর্বতোভাবে এর চূড়ান্ত অর্জনের প্রতীক। সর্বযুগে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তুলনামূলকভাবে মসজিদই অধিক পরিমাণে নির্মিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের শাসক, সরকারি আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, অমাত্য ও আর্থিকভাবে সচ্ছল সাধারণ নাগরিকবৃন্দ—সকলেই মসজিদ নির্মাণে ব্রতী ছিলেন। ফলে মুসলিম স্থাপত্যের অন্য কোনো ইমারত শুধু সংখ্যা বিচারেই নয়, জাঁকালো অবকাঠামো ও দীপ্তিমান অলংকরণ—কোনো বিশেষত্বেই মসজিদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

ইতিহাসচর্চার আলোকিত সময়ে মুসলমানগণ বাংলা অধিকার করে। দিল্লিতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই মুসলিম ইতিহাসচর্চা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেন, যে ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়; বরঞ্চ একটি মিশ্রিত ধারার জন্ম দিয়েছে। তখন থেকে এই মিশ্রিত ধারাই বাংলার ইতিহাসের একটি উৎকৃষ্টতম দিক হিসেবে বিবেচিত।[১৫] সম্পূর্ণ পৃথক ধ্যানধারণা নিয়ে আসা মুসলিম শাসকদের সাথে প্রাথমিকভাবে দেশীয় সংস্কৃতির একটা সংঘাতও উপস্থিত হয়। তবে বৌদ্ধ চিন্তাচেতনা ও হিন্দু আধ্যাত্মবাদের সাথে মিলিত হয়ে তারা থেকে যায় এ দেশের সংস্কৃতিতে। কালক্রমে বিজিত ও বিজেতা একটি ভারসাম্যে আসতে সমর্থ হয়। তবে বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রাথমিক যুগের শিল্প-নিদর্শন অপ্রতুল।

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

https://nagorikpathagar.org

মুসলমানদের আগমন এ দেশের সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলায় যে ব্যাপক, গভীর ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে, তার খুব সামান্যই আমরা জানি। উপরন্তু এত কম এবং ভুল জানি যে—বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় তা যে মুসলমানদেরই দান, সে কথা শুনলেই অনেকে চমকে ওঠেন। এক ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখেছেন—'মুসলমানরাই এ দেশে পানি ও মাটি বিভাজনকারী।' অথচ তারা এ দেশে আসার পর এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী মানুষের মর্যাদা পেত না। মুসলমানরাই এ দেশে একটি সভ্যতা গড়ে তোলেন। বলা দরকার, ব্রিটিশ আমলে ২০০ বছর পরাধীন এবং বাংলাদেশ আমলে ৫২ বছর স্বাধীন থাকার পরও আমরা জানতে পারিনি আমাদের সঠিক অতীতকে। তাই আমরা মনে করি, চিরকাল ভারতীয় বাংলার লোকেরাই আমাদের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা সবকিছুর জোগান দিয়েছে। আসল কথাটা পুরোপুরি বিপরীত। ৫০০ বছর (১৩০১-১৮০০ খ্রি.) ধরে এবং বাঙ্গাল-এর বাঙালরাই গৌড়ীয়দের সভ্যতা, কৃষ্টি, সাহিত্য, উন্নত ধর্ম ও জীবনপ্রণালির জোগান দিয়ে এসেছে। কিন্তু সেসব ইতিহাস হারিয়ে গেছে, তা পুনরায় খুঁজে পাওয়ার পথও এতকাল আমরা পাইনি। সেজন্য মুসলমানরাই বাংলা ভাষার আদি ওয়ালেদ বা পিতা বললে আমাদের সন্দেহ হয়। কারণ, এমন কথা প্রচলিত কোনো ইতিহাসগ্রন্থে লেখা নেই। কেউ লেখেননি। কেউ বলেননি। তাই এ কথা আজ কবুল না করে উপায় নেই যে, ২০০ বছরের পরাধীনতা ও ৫২ বছরের স্বাধীনতা আমাদের ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির সত্যিকার কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই।[১৬] কেন এমন হলো? ড. এস.এম. লুৎফর রহমান বলেন—

> এর কারণ হলো গত ২০০ বছর (১৮০১-১৯৯৯) আমরা সর্বক্ষেত্রেই ভুল ও বিকৃত তথ্যের বা Wrong information-এর মধ্যে রয়েছি। আমাদের অসচেতন বা Uncritical পড়াশোনা, লেখালেখি, আলোচনা গবেষণা কেবল একটি নির্দিষ্ট লাইনে, কাটা খাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ খাতটি আমাদের বানানো নয়। ওর নির্মাতা ইঙ্গ-হিন্দু পণ্ডিতগণ; যারা হাড়ে হাড়ে ছিলেন মুসলিমবিদ্বেষী; ইতিহাসের শত্রু এবং সত্যেরও শত্রু।...এ দেশের সব রকম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই 'বিদ্বেষ' ও 'শত্রুতা' এত সূক্ষ্ম, এত বেমালুম এবং এত অভিভূতকারী যে—তার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়। এরা ইতিহাসকে কেবল ঘুরিয়েই লেখেনি, ইতিহাস বিকৃত করেছে, বর্জন করেছে, গোপন

[১৬] ড. এস. এম. লুৎফর, 'মুসলমানরাই ভাস্কর আদি ওয়ালেদ', *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, সম্পা. শেখ তোফাজ্জল হোসেন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১১৯

https://nagorikpathagar.org

করেছে, তথ্যহীন করেছে, প্রয়োজনে তথ্য নির্মাণও করেছে। তার একটা নজির দিয়ে বলা যায়, সুবিখ্যাত ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস এ লিখেছেন—'সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে।' এই বাক্যে যে মিথ্যা, ভুল বা বিকৃত তথ্য আছে তা হলো—নীহাররঞ্জন রায় ভালো করেই জানতেন যে, 'তথাকথিত পাঠান আমলে' সমগ্র বাংলাদেশ 'বঙ্গ' নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়নি; হয়েছে 'বাংলা' বা 'বাংলাহ' নাম নিয়ে। কিন্তু এই শব্দটা নীহাররঞ্জন রায়-এর নিকট 'পাপ-শব্দ' বলে তা বদলিয়ে লেখা হয়েছে। নাম-শব্দের এই পরিবর্তন কি সঠিক ইতিহাসেরও পরিবর্তন নয়? দ্বিতীয়ত, রায় মশাই ঐ বাক্যে 'হিন্দু আমল'-এর বিপরীতে বসিয়েছেন 'তথাকথিত পাঠান আমলে'। তিনি যদি 'হিন্দু আমলে ঘটে নাই। তাহা ঘটিল মুসলিম আমলে' লিখতেন, তাহলে কি অন্যায় হতো? বরং সেটাই ঠিক হতো জেনেও নীহাররঞ্জন রায় 'মুসলিম' শব্দটা এড়াবার জন্যই লিখেছেন 'তথাকথিত পাঠান' শব্দদ্বয়। পরবর্তী অংশে আবার 'পাঠান আমলে'র অনিচ্ছাকৃত উল্লেখের পর মোগল আমলের উল্লেখ না করে লিখেছেন 'আকবরের আমলে'। এদিকে আসল কথার কাছেও তিনি এলেন না। বললেন না শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজাদের সময় যা ঘটেনি, তা ঘটল যে মুসলিম শাসকের আমলে—তিনি কে বা তাঁর কি নাম, সেই নামটিও তিনি এড়িয়ে গেছেন। একি ইতিহাস বর্জন নয়? [১৭] বাংলাদেশে পাঠান যুগ এক হিসেবে বাংলা বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতার যে শ্রী ফুটে উঠেছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বেড়ে গিয়েছিল। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তা জগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হলো। এই স্বাধীনতার ফলে বাংলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পেয়েছিল, এ দেশের ইতিহাসে অন্য কোনো সময়ে এমন দ্রুত বিকাশ সচরাচর দেখা যায় না।[১৮]

০৩

পৃথিবীর এক কোণে অবস্থিত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, এটা সত্যিই বিস্ময়কর। তাই বলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠার পেছনে যা-তা একটা কারণ বলে

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২২

[১৮] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

https://nagorikpathagar.org

দিলেই তা যথার্থ হবে, এমন নয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলার ইতিহাস বিশেষ করে মুসলিম শাসনামল সম্পর্কে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কমই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কে বাংলার পি. কে. হিট্টি হিসেবে খ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম যা আলোকপাত করেছেন, তৎসম্বন্ধীয় পরবর্তী রচনাগুলো তারই চর্বিতচর্বণ। দু-একটা শব্দ এদিক-সেদিক করে 'বিদগ্ধ' লেখকগণ তা নিজ নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থটি বাংলায় মুসলিম শাসনামল নিয়ে রচিত অসংখ্য অপ-ইতিহাসের আংশিক জবাব।

আমরা এখানে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিনি, শুধু বাংলায় ইসলামের প্রসার ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। লেখাটিও বেশ অনেক দিন আগের। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে ধন্যবাদ জানাই। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ। মহান আল্লাহ সবাইকে সুস্বাস্থ্য ও হায়াতে তাইয়েবা দান করুন, আমিন!

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

https://nagorikpathagar.org

বাংলার পরিচিতি :
জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক অবস্থান

বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনামলে উত্তর বাংলা প্রথমে পুণ্ড্র, পরে বরেন্দ্র; পশ্চিমবঙ্গ প্রথমে সুহ্ম, পরে রাঢ়; পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল বঙ্গ এবং মেঘনা তীরবর্তী এলাকা সমতট হিসেবে পরিচিত হলেও মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষী ভূ-ভাগ বাঙ্গালা বা বাংলা নামে পরিচিত হয়।[১৯] 'বঙ্গ' ছিল একটি অতি প্রাচীন জনপদ। ঋগবেদ বঙ্গের কোনো উল্লেখ না থাকলেও *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০] বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত ১৬টি জনপদের অন্যতম জনপদ হচ্ছে 'বঙ্গ'।[২১] রামায়ণ ও মহাভারতেও 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে, তবে এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায়, এটা ছিল ভগীরথীর পূর্বাঞ্চল।[২২] মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে মুসলিম শাসক ও ঐতিহাসিকরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বঙ্গ ও বাঙ্গালা বলে অভিহিত করত। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতি, রাঢ়, বাঙ্গালা প্রভৃতি অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করেন এবং নিজে শাহ-ই-বাঙ্গালা বা সুলতান-ই-বাঙ্গাল উপাধি ধারণ করেন। এ সময় থেকে সমগ্র বাংলাভাষী ভূ-ভাগ বাঙ্গালা নামে পরিচিতি লাভ করে। এর পূর্বে শুধু বাঙ্গালার (পূর্ব বাংলার) অধিবাসীকে বাঙ্গালা বা বাঙালি বলা হতো। তবে ইলিয়াস শাহের সময় থেকে রাঢ় ও লখনৌতির লোকেরাও বাঙালি নামে অভিহিত হয়।[২৩]

ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর বর্ণনার কয়েক স্থানে বঙ্গ-এর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—'বখতিয়ার খলজি লখনৌতি, বিহার, বঙ্গ ও কামরূপ

---

[১৯] ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৯; ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭), পৃ. ১

[২০] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন; ১৯৯৯), পৃ. ১৬

[২১] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

https://nagorikpathagar.org

রাজ্যে পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন।'[২৪] মিনহাজ আরও বলেন—'সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজিকে (১২১২-১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) জাজনপুর, বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত রাজ্যসমূহ কর প্রদান করত।'[২৫] মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র এলাকা ছিল না; বরং তা ছিল একটি রাজ। সুতরাং পশ্চিমে ভগীরথী ও করতোয়া নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর—এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিয়ে প্রাচীন বঙ্গ রাজ ছিল। সপ্তদশ শতকে লিখিত তথ্যানুযায়ী বঙ্গ-এর সীমা ছিল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত। সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে দেখা যায়, ঢাকা-ফরিদপুর-বাকেরগঞ্জ বঙ্গ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনায় বোঝা যায়, রাঢ় ও বরেন্দ্রের পূর্বে বঙ্গ অবস্থিত ছিল। আবুল ফজল মোগল আমলের সুবা বাঙ্গালার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সুবা বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, সুবা বাঙ্গালা পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার অবস্থিত ছিল। মোগল হতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত পশ্চিমে তেলিয়াগড় থেকে পূর্বে চট্টগ্রাম এবং উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বাংলার সীমানা।

'বঙ্গ' থেকেই 'বাঙ্গালা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, বঙ্গ-ই বঙ্গালাহ নামে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গালাহ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক মরক্কোর অধিবাসী ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনিতে। মূলত শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে বঙ্গালাহ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। মোগল এবং মোগল যুগের আফগান ঐতিহাসিকগণ সকলে বঙ্গালাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। টোডরমলের ভূমি বন্দোবস্তে সুবা বঙ্গালার বিবরণ আছে। আবুল ফজল শুধু যে সুবা বাংলার উল্লেখ করেছেন তা-ই নয়, তিনি সুবা বাংলার সীমাও বর্ণনা করেছেন—যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী* এবং গোলাম হোসেন সলীমের *রিয়াজ-উস-সালাতিনে* সুবা বাংলার আয়তন যা দেওয়া হয়েছে, তা আবুল ফজলের বর্ণনার সাথে মিলে যায়।

ইউরোপীয়রা প্রথম দিকে বাংলাকে Bengala বা Bengal বললেও মোগল সুবা বাঙ্গালা ইংরেজদের অধিকারে যাওয়ার পরে Bengal নামেই পরিচিত হয়।

---

[২৪] মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরি*, আ.শ.ম. যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২১

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

https://nagorikpathagar.org

Bengal বা Bengala হলো বাঙ্গালা'রই ইউরোপীয় বা ইংরেজি রূপ। বাংলার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা; পূর্বে লুসাই, খাসিয়া ও জয়ান্তিকা পর্বতমালা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন এবং পশ্চিম সীমান্ত জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল। এ কারণে বাংলাদেশে বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা ছিল খুব কম। বাংলাদেশের উত্তরে পর্বতমালা এবং আরও উত্তরে পার্বত্য দেশ তিব্বত। তিব্বত ও বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে তিব্বতের অধিবাসীরা ঘোড়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উত্তর বাংলার বাজারে যাওয়া-আসা করত। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা বেষ্টিত কোচ, কামতা ও কামরূপ রাজ্য ছিল। কামরূপ ও কামতার সাথে বাংলার মুসলিম সুলতানদের সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। পূর্ব সীমান্তে ছিল ত্রিপুরা রাজ। গোমতী নদী উভয় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় এ পথ দিয়ে বহিরাক্রমণের তেমন কোনো আশঙ্কা ছিল না। কেননা, সমুদ্রপথে যুদ্ধ করার মতো ভারত উপমহাদেশের কোনো অঞ্চলেরই নৌবাহিনী ছিল না। তবে ইউরোপীয়দের আগমনের পর সমুদ্রপথে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়।

বর্তমানে রাজমহলের উত্তর-পশ্চিম এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সংকীর্ণ তেলিয়াগড় পথের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। তা ছাড়া ত্রিহুত, সাঁওতাল পরগনা ও সিংহভূমের দিক দিয়েও ভারতের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল। ত্রিহুতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করা যেত বলে এর নাম ছিল দ্বার-ই-বঙ্গ বা বাংলার দরজা। বেশ কয়েকটি খরস্রোতা নদী থাকায় এ পথটি ছিল দুর্গম। সাঁওতাল পরগনা ও সিংহভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পথটি ঝাড়খন্দ নামে পরিচিত ছিল। এ পথটি তেমন ব্যবহৃত হতো না। সীমান্ত পথে এসব প্রাকৃতিক বাধার কারণে বাংলাদেশে প্রবেশ করা ছিল কঠিন। ফলে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কয়েকটি প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলা একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি এবং পলিমাটির দেশ। এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদনদী। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, করতয়া, মহানন্দা, কুশিয়ারা এবং তাদের শাখা-প্রশাখা যুগ যুগ ধরে বাংলার অধিবাসীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অসংখ্য শহর ও নগরের উত্থান-পতনে এ নদীগুলোর ভূমিকা ছিল। গোড়া থেকেই এগুলো ছিল বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎস। বাংলার জমির অসাধারণ উর্বরতা, শস্যের প্রাচুর্য এবং অধিবাসীদের সমৃদ্ধি এ নদনদীগুলোর কারণেই সম্ভব হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা প্রদেশে নদনদীগুলোর ভাঙা-গড়ার ধারা অব্যাহত ছিল।

https://nagorikpathagar.org

আবুল ফজলের মতে, গ্রীষ্মকালে বাংলার গরম খুব প্রখর ছিল না এবং শীতকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকত এবং এ সময় বাংলার অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন থাকত। এ সময় বাংলায় যে কালবৈশাখীর তাণ্ডবলিলা, নদনদীর প্লাবন এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকত, তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নদনদীর গতি পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিত। ফলে মশা, মাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যেত। ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটত। তাই বাংলার প্রতি বহিরাগত পর্যটকদের বিরূপ মনোভাব ছিল। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা বাংলাকে দুর্গম করেছিল এবং এটা বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করত। বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থান এ দেশের শাসনকর্তাদের বিদ্রোহী কিংবা স্বাধীন থাকতে উৎসাহিত করত। আবুল ফজল বলেন, জলবায়ুর সুবিধার কারণে বাংলায় বিরোধের ধূলি সর্বদা উত্থিত হয়েছে। সেজন্য প্রাচীন লেখকদের বর্ণনায় এটা 'বালগাক খানা' বা 'বিদ্রোহের নগরী' নামে অভিহিত হয়েছে।

প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার জনসাধারণ সাধারণত হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্ত্যজ শ্রেণির অধিবাসী এবং কিছুসংখ্যক জৈনদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তবে এর আদিম অধিবাসী ছিল বঙ্গ ও পুণ্ড্র। এরা দ্রাবিড় ও আর্যদের থেকে পৃথক ছিল এবং বর্তমানকালের কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি লোকদের আদিপুরুষ ছিল। পণ্ডিতরা বাংলার অধিবাসীদের অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক নামে অভিহিত করেছেন। এরা নিষাদ জাতি হিসেবেও পরিচিত। এরপর আরও কয়েক জাতির লোক এখানে আসে। এদের মধ্যে মোঙ্গল, দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক আসে; যদিও তারা মোঙ্গল বা দ্রাবিড় ছিল না।

পরে পামির অঞ্চল থেকে হোমো আলপাইনাস নামে এক জাতীয় লোক আসে। এদের থেকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য হিন্দুদের উদ্ভব হয়েছে। এরা বৈদিক আর্য জাতি থেকে পৃথক ছিল। পরবর্তীকালে কিছুসংখ্যক আর্য বাংলায় আসে। বৈদিক যুগের শেষভাগে বাংলায় আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডারের বিজয় পরবর্তী সময় বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে মৌর্যোত্তর বাংলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষদিকে এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম থেকে গুপ্ত শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উত্তর বাংলায় গুপ্ত শাসন অব্যাহত ছিল। এ সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার ঘটলেও গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রসার ঘটে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়।

https://nagorikpathagar.org

উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ এবং মগধ 'গৌড় জনপদ' নামে সুপরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনো একসময় শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যে ক্ষমতাসীন হন। সামন্তরূপে জীবন শুরু করলেও ৬০৬ খ্রিষ্ট-পূর্বে শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শশাঙ্কের রাজত্বের পর বাংলার ইতিহাস ছিল প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সময় কোনো স্থায়ী শাসন গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেনি। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং ধনিক শ্রেণি নিজ নিজ গৃহে ও আশেপাশের এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। এ অরাজকতার মধ্য থেকেই পাল বংশের গোপাল বাংলার রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনের ওপর ভিত্তি করে তার পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অবনতি ও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।

একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় এক নতুন রাজবংশের উদ্ভব হয়। উত্তর বাংলায় সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহের সময় পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন বিজয় সেন। সেন রাজবংশের আদিপুরুষের নাম সামন্ত সেন। ঐতিহাসিকদের মতে, সামন্ত সেনই সেন বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তবে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কি না, তাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হেমন্ত সেনের পর তার পুত্র বিজয় সেন ক্ষমতা দখল করেন। তিনিই ছিলেন এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বিজয় সেন পশ্চিম ও উত্তর বাংলা থেকে পাল শাসন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে বর্ম শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রায় সমগ্র বাংলায় স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলায় একক স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় সেনদের শাসনাধীনে। বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন বল্লাল সেন। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই লক্ষণ সেনের শাসনামলেই বাংলায় বখতিয়ার খলজির আগমন ঘটেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি[২৬] সম্ভবত ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে[২৭] নদীয়া আক্রমণ করেন। নদীয়া বিজয়ের পর

---

[২৬] মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির প্রকৃত নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মিনহাজ-ই-সিরাজ *তবকাত-ই-নাসিরি*-তে নামটি উল্লেখ করেছেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজিরূপে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুসলিম বাংলার বিজেতার নাম ইখতিয়ার

https://nagorikpathagar.org

বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মনাবতী (গৌড়) দখল করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বখতিয়ার খলজির রাজ পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বখতিয়ার খলজি রাজশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তবে তিনি সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর লখনৌর মুকতা[২৮] মুহাম্মাদ শিরান খলজি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২০৭-১২০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিরান খলজির পর হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি দিল্লির অধীনস্থ শাসক হিসেবে ১২০৮ থেকে ১২১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির আরেক সহচর আলি মর্দান খলজি কুতুব উদ্দিনের গভর্নর হয়ে লখনৌতিতে এলে হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি আলি মর্দানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

এ বছরই কুতুব উদ্দিনের মৃত্যু হলে লখনৌতিতে আলি মর্দান খলজি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি ধারণ করেন। আলি মর্দান খলজির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে খলজি আমিরেরা একতাবদ্ধ হন এবং গোপনে আলি মর্দান খলজিকে হত্যা করে হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজিকে নেতা নির্বাচিত করেন। হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি "সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজি" উপাধি ধারণ করে

উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে, বখতিয়ার খলজির ছেলে ইখতিয়ার উদ্দিন বাংলা বিজয় করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বঙ্গ বিজেতার নাম ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি বা সংক্ষেপে বখতিয়ার খলজি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

[২৭] সামসময়িক ইতিহাস গ্রন্থ *তবকাত-ই-নাসিরি*তে নদীয়া আক্রমণের কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকলেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে নদীয়া আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট ও এডওয়ার্ড টমাস নদীয়া আক্রমণের সন ১২০৩-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ এবং হেনরি বখম্যান ১১৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দ বলে মন্তব্য করেছেন। ঐতিহাসিক মনমোহন চক্রবর্তী, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ও কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ ঐতিহাসিক বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের তারিখ ১১৯৯-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম মন্তব্য করেছেন, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে শীত মৌসুমে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দকেই নদীয়া জয়ের তারিখ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

[২৮] মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি তার অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেছিলেন। এগুলো ইকতা নামে পরিচিত ছিল। ইকতার শাসককে বলা হতো মুকতা। বখতিয়ার খলজির সময়ের তিনজন মুকাতার নাম পাওয়া যায়; আলি মর্দান খলজি, মুহাম্মাদ শিরান খলজি ও হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি।

https://nagorikpathagar.org

১২১২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক এবং লখনৌতির মুসলিম রাষ্ট্রকে সুসংহতকারী। সুশাসক, ন্যায়বিচারক ও প্রজাহিতৈষী সুলতান ইওজ খলজির প্রতিপত্তি দিল্লির সুলতান শামস উদ্দিন ইলতুৎমিশ কখনো ভালো চোখে দেখেননি। সুলতান ইলতুৎমিশ জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করতে প্রেরণ করেন। নাসির উদ্দিন মাহমুদ সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজিকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা দখল করেন। এরপর থেকে বাংলার মুসলিম রাজ দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লির অধীনে ছিল। এ সময়ের মধ্যে লখনৌতির কোনো কোনো গভর্নর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সুলতান শামস উদ্দিন ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর ৩০ বছরব্যাপী দিল্লিতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলছিল। ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের পর এ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অবসান হয়। এই ৩০ বছর লখনৌতিতে দিল্লির গভর্নররা ইচ্ছেমতো শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে বলবন বাংলার স্বাধীন সুলতান মুগিস উদ্দিন তুঘলককে পরাজিত করে বাংলার মুসলিম রাজকে দিল্লির শাসনাধীনে নিয়ে আসেন এবং স্বীয় পুত্র বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

বুঘরাখান ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির শাসনকর্তা হিসেবে বাংলা শাসন করলেও পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করেন এবং নাসির উদ্দিন মাহমুদ উপাধি ধারণ করেন। বুঘরা খান পরবর্তী সময়ে পুত্র রুকন উদ্দিন কায়কাউসের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। রুকন উদ্দিন কায়কাউস নয় বছর (১২৯১-১৩০২ খ্রি.) শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুলতান কায়কাউসের পর সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩০২ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের পর তার পুত্র গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু নাসির উদ্দিন ইবরাহিম নামক এক ভাই তার শাসন মেনে না নিয়ে দিল্লির সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন এবং গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরকে পরাজিত করে বন্দি করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বাংলার মুসলিম রাজকে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক গভর্নর নিযুক্ত করেন।

গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তার ছেলে মুহাম্মাদ বিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতা কর্তৃক বন্দি গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরকে

https://nagorikpathagar.org

মুক্ত করে দেন এবং বাহরাম খানের সাথে তাকে সোনারগাঁওয়ের যুগ্ম গভর্নর নিযুক্ত করেন। অল্প কিছুদিন পর গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বাহরাম খান তাকে হত্যা করেন। এভাবে ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরের পতন হয়। এরপরে প্রায় ১০ বছর বাংলার শাসন শান্তিপূর্ণভাবেই পরিচালিত হয়। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের গভর্নর বাহরাম খান মৃত্যুবরণ করলে তার সিলাহদার বা বর্মরক্ষক ফখরা 'ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ' উপাধি ধারণ করে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন সোনারগাঁও রাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফখর উদ্দিন কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাই বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করে। এ সময় থেকে বাংলা দিল্লি সালতানাত থেকে সরে আসে এবং উত্তর ভারতের শাসকদের প্রতি নামমাত্র বশ্যতাও অস্বীকার করে। এরপর থেকে বাংলা পরপর কয়েকটি রাজবংশ দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসিত হতে থাকে। এ রাজবংশগুলো হলো—ইলিয়াস শাহি বংশ (১৩৪২-১৪১৪), জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহের পরিবার (১৪১৫-১৪৩৫), পরবর্তী ইলিয়াস শাহি বংশ (১৪৩৬-১৪৮৬), হাবশি বংশ এবং হোসেন শাহি বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮)।

কেবল ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল শের খান গৌড় জয় করলে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলা দিল্লির অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইসলাম খানের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫-৫২ খ্রিষ্টাব্দ) এটা দিল্লি সালতানাতের একটি অঞ্চলরূপে শাসিত হয়। ১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বাংলার আফগান শাসনকর্তা মুহাম্মাদ খান সুর 'মুহাম্মাদ শাহ' উপাধি ধারণ করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং এই প্রদেশে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মুহাম্মাদ খান সুরের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ সুর (১৫৫৫-৬০) ও জালাল শাহ সুর (১৫৬০-৬৪) শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর গিয়াস উদ্দিন নামক এক জবরদখলকারী জালাল শাহ সুরকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু তাজ খান নামক এক কররানি আফগানপ্রধান ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর তাজ খানের মৃত্যু হলে তার ভাই সুলাইমান কররানি (১৫৬৫-৭২ খ্রি.) গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি তার রাজ্যের সীমা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা দখল করেন।

সুলাইমানের পুত্র বায়েজিদ কররানি (১৫৭২ খ্রি.) ও দাউদ কররানি (১৫৭২-৭৬ খ্রি.) পিতার মতো বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন না। ফলে আফগানদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়। বাংলা ও বিহার জয় করার এ সুযোগ আকবর অবহেলা

https://nagorikpathagar.org

করেননি। মোগল বাহিনীর নিকট দাউদ খান কররানি রাজমহলের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজত্বের অবসান হয় এবং বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়।

মোগল সম্রাট আকবরের সময় নামমাত্র বাংলা বিজিত হয়েছিল। কররানি রাজত্বের অবসানের পর বারোভুঁইয়া নামে বাংলার শক্তিশালী জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যতম শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আকবরের খ্যাতনামা সেনাপতিগণ বারোভুঁইয়াদের বশীভূত করতে সক্ষম হননি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইসলাম খান কূটনীতির সাহায্যে জমিদারদের ঐক্য বিনষ্ট করেন এবং তাদের দমন করতে সমর্থ হন। এর ফলে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোগল শাসনামলে বাংলা স্বল্পকালের জন্য নিযুক্ত সুবেদার কর্তৃক শাসিত হতো। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সময় সুবেদার মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-২৭ খ্রি.) মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ দিল্লির সম্রাটের প্রতি কেবল আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রদর্শন করতেন এবং সম্রাটকে নামমাত্র নজরানা দিতেন। প্রাদেশিক শাসনের ব্যাপারে তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

মুর্শিদকুলি খানের সময় উড়িষ্যা, বাংলা সুবেদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। তার জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সুজা উদ্দিন (১৭২৭-৩৯ খ্রি.) আজিমাবাদ (বিহার) প্রদেশকে তার সুবেদারির অন্তর্ভুক্ত করেন। সুজা উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০ খ্রি.) আজিমাবাদের নায়েব সুবেদার আলিবর্দির সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সুদক্ষ শাসক আলিবর্দি খান মারাঠা বর্গিদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন এবং প্রদেশের সুখ-সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ মোটেই নিষ্কণ্টক ছিল না। আত্মীয়স্বজন, ইংরেজ কোম্পানি ও হিন্দু প্রধানগণ নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অবশেষে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। এর ফলে বাংলার স্বাধীনতার অবসান হয় এবং এখানে আধিপত্য কায়েম করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন : প্রচলিত মিথ ও মিথ্যা

চিরাচরিত প্রজ্ঞামতে ইতিহাস কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয় না; ইতিহাস নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই এবং যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলোও নিশ্চিত নয়। তথ্যের অভাবে বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে সকল আলোচনাই অনুমান অথবা তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।

—ড. আকবর আলী খান

পৃথিবীর ইতিহাসে 'বাংলা' নামক ভূখণ্ডটি বর্তমানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃত এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্ম পরিচয়ে মুসলিম। পৃথিবীর এক কোণে অবস্থিত এবং প্রায় চারিদিক দিয়ে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই বাংলা মুলুকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম—এটা পৃথিবীর এক বিস্ময়। বর্তমানের মুসলিম দেশসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রায় দেশগুলো লাগালাগি অবস্থান করছে। কিন্তু বাংলা এমনটি নয়। কীভাবে এবং কেনই-বা এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম, তা জানার জন্য অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রায় দেড় শ বছর ধরে বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্যের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চলছে নানা বিতর্ক। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খানের তথ্যমতে, ঐতিহাসিকগণ বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে এখানে ইসলামের সাফল্যের পাঁচটি কারণ নির্ণয় করেছেন। যথা :

ক. বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত আশরাফ মুসলমানদের বসতি।

খ. মুসলমানগণ জোর করে এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে স্থানীয় হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

গ. উচ্চবর্ণের হিন্দু কর্তৃক নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

https://nagorikpathagar.org

ঘ. যখন বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করত। হিন্দুরা বৌদ্ধদের অত্যাচার করত। হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখানকার বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ঙ. বাংলাদেশে মুসলমান সুফি, দরবেশ ও পীরগণ ইসলাম প্রচার করেছেন। তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

শেষোক্ত কারণটি সম্বন্ধে আকবর আলী খান বলেন—এই তত্ত্বের দুর্বলতা হলো মুসলমান সুফি, দরবেশ ও পীরেরা ইসলামের বাণী নিয়ে শুধু বাংলা প্রদেশেই আসেননি; ভারতের সর্বত্র তারা গিয়েছেন। এই পীরেরা কেন শুধু বাংলায় সফল হয়েছেন, অথচ ভারতের সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছেন, তারও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।[২৯] সুফিদের মাধ্যমে এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে—এই তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন ঐতিহাসিক ড. মোহাম্মদ হান্নান। 'প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন' সম্পর্কে তিনি তিন খণ্ডের এক ঢাউস গ্রন্থ নিয়ে হাজির হয়েছেন। তার নতুন তত্ত্বমতে, দ্বীনের মেহনত এবং তাবলিগের মাধ্যমে এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলার ইতিহাস পঠন-পাঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। তবে বঙ্গ বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির প্রতি এবং বিশ্বজয়ী মুসলিম সৈন্য ও সেনাপতির প্রতি তার বিশেষ অভিমান। কেন এ অভিমান, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তার উপস্থাপনটা এ রকম—

> বখতিয়ার মাত্র ১২ জন অথবা ১৭ জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বাংলা দখল করে ফেলেন। কিন্তু আমার কাছে কাহিনি সত্য মনে হলেও এর পেছনের রহস্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগে। এটা অসম্ভব যে, একদল বিদেশি ঘোড়ায় চড়ে এসেই সিংহাসন দখল করে নিল, আর স্থানীয় রাজা রান্নাঘরের পেছন দিয়ে পালিয়ে গেল। এটা কোনো গৌরবের কথাও না যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হচ্ছেন বিদেশি সৈন্যদের হাতে।[৩০]

সচেতন পাঠক একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, আমাদের ভূখণ্ডে ইসলামের ঝান্ডা উত্তোলনকারী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি তার মতে বিদেশি সৈন্য। সম্মানিত এই মুসলিম বিজেতাকে তিনি শুধু বখতিয়ার

---

[২৯] আকবর আলী খান, *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯), পৃ. ১৮-১৯

[৩০] ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৯), ভূমিকা

https://nagorikpathagar.org

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর বাংলার প্রজা নিপীড়ক, ব্রাহ্মণবাদের আসন পোক্তকারী, দক্ষিণ ভারত থেকে আগত লক্ষ্মণ সেন নাকি আমাদের পূর্বপুরুষ! অবশ্য তিনিই আবার স্বীকার করছেন—'যদিও সেন শাসকরাও বাঙালি ছিলেন না।'[৩১] এরপরই তিনি লেখেন—

> এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, সমগ্র বাংলা তখন ইসলামের দাওয়াতে টালমাটাল ছিল। রাজশক্তি ও স্থানীয় উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের দ্বারা সমগ্র বাংলার নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও সকল শ্রেণির বৌদ্ধরা নিপীড়িত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। যখন ইসলামে শ্রেণি ভেদহীন ধর্মাবস্থা ও সমাজ বাস্তবতা তাদের সামনে এসে হাজির হলো, তখন তাদের আর এতে সাড়া না দিয়ে উপায় থাকল না। এর প্রভাব যখন সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল, তখনই বখতিয়াররা এসে হাজির হয়। বখতিয়ারের তখন 'ফাঁকা মাঠে গোল' দেওয়ার মতো অবস্থা। কারণ, যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? প্রজা সব মুসলিম, রাজার পক্ষে এগিয়ে আসবে কে! সেদিন অসহায় লক্ষ্মণ সেনের তাই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর পথ ছিল না।[৩২]

হায় সেলুকাস! কী বিচিত্র এই ঐতিহাসিক! আমাদের আজ বলতে হচ্ছে, ইতিহাস হলো ঘটনার যৌক্তিক বিশ্লেষণের নাম; কোনো কল্পকাহিনি বা সাহিত্যের নাম ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক হবেন নির্মোহ ও নিরাসক্ত; তবেই না সত্য উন্মোচিত হবে। ঐতিহাসিক ড. মোহাম্মদ হান্নানের আরও কিছু বক্তব্য পড়লেই অনুধাবন সহজ হয়ে যায়, তিনি ইতিহাসের চাইতে সাহিত্য রচনায় বেশি মনোযোগী। তিনি বলেন—

> পাশাপাশি মুসলিমদের ইসলাম প্রচার বা তাবলিগ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ চাকরির মানসিকতা থেকে মুক্ত; বরং নিজেরই খেয়ে নিজেরটা পরে আখেরাতের কামাই হিসেবে মুসলিমরা তাদের নবি (সা.)-এর আমল থেকে কাজটা যেভাবে শুরু করেছিলেন, বর্তমানেও তাবলিগ জামায়াতের মাধ্যমে একই কায়দায় একই রীতিতে তা অব্যাহত আছে। আর এতে সম্পূর্ণই আল্লাহ তায়ালাকে রাজি-খুশি করাই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মুসলিম নামবিশিষ্ট লেখক-গবেষক, যাদের নামের অংশে 'মুহাম্মাদ' এবং 'ইসলাম' শব্দও জুড়ে আছে, তাদেরও অনেকে মনে করে তলোয়ারের জোরেই ইসলাম বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। আমাদের দেশে এবং বহির্বিশ্বেও এমন অনেক ইসলামিক রাজনৈতিক দল আছে, যারা মনে

---

[৩১] প্রাগুক্ত

[৩২] প্রাগুক্ত

https://nagorikpathagar.org

করে ইসলাম শক্তির জোরেই দুনিয়ার দেশে দেশে প্রসারিত হয়েছিল। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের তালেবান, আল-কায়েদা; বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী, আহলে হাদীস; ভারতের লস্করে তৈয়বা এবং মিশরের ব্রাদারহুড প্রভৃতি দল এ মতবাদের নিদর্শন। এইসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী দল প্রকৃতপক্ষে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রচারনাকেই শক্তি জুগিয়ে থাকে। মুসলিমরা তাদের নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর আমল থেকেই নিজ সম্পদ অকাতরে এজন্য ব্যয় করে পরকালের জন্য সঞ্চয় গচ্ছিত রাখছে। সাহাবাদের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের তাবলিগ জামাত পর্যন্ত এভাবেই এবং একই উদ্দেশ্যে কার্যক্রম চলমান।[৩৩]

ইতিহাস বিকৃতির জন্য ঐতিহাসিককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আসুন। আমরা মহানবি (সা.) এবং তৎপরবর্তী যুগের মুসলমানদের কার্যক্রম একটু নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করি। মক্কা ছিল আরববাসীর দ্বীনি কেন্দ্র। এখানকার লোকেরা ছিল গোঁড়া পৌত্তলিক এবং দেবমূর্তির তত্ত্বাবধায়ক। তাই মহানবি (সা.) দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ গোপনীয়ভাবে চালাতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তারা ঈমান গোপন রেখেই চলাফেরা করতেন ও পরস্পরের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। মহানবি (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম নামাজের সময় পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামাজ আদায় করতেন।

রাসূল (সা.)-এর জীবনের প্রথম তিন বছর তাবলিগের কাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে গোপনেই চলছিল। যখন প্রকাশ্যে তাবলিগের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তাবলিগের বিষয়বস্তু ছিল কুরাইশদের পূজনীয় মূর্তিগুলোর বাস্তব দিক তুলে ধরা। এই তাবলিগ ছিল নিকটাত্মীয়ের মধ্যে। রাসূল (সা.) সাফা পাহাড়ের ওপর থেকে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তার বিষয়বস্তু ছিল পৌত্তলিকতার নোংরামি, মূর্তিসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা ও মূল্যহীনতা। এতে পৌত্তলিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে মহানবি (সা.)-কে বিদ্রুপ-উপহাস করে, তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়ার পথ বেছে নেয়। এমনকি নবুয়তের পূর্বে আবু লাহাবের যে দুই ছেলের সাথে মহানবি (সা.)-এর দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, তাঁদেরও তালাক দিয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তী সময়ে রাসূল (সা.) 'দারে আরকাম'-কে দ্বীনের দাওয়াত ও মুসলমানদের সাথে মেলামেশার কেন্দ্ররূপে নির্ধারণ করেন। এখানে ইসলামে দীক্ষা, ইবাদত-বন্দেগি, তাবলিগ, পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ সবই হতো গোপনে। নবুয়তের ছয়

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২

https://nagorikpathagar.org

বছর পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকে হামজা ও উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর ফারুক (রা.) মুসলমান হওয়ার পর ইসলাম পর্দার বাইরে আসে এবং প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়।

সুহাইব ইবনে সিনান রুমি (রা.) বলেন—'এরপর আমরা কাবাঘরের পাশে গোল হয়ে বসে এবং তাওয়াফ করে যারা আমাদের ওপর কঠোরতা করেছে, তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। তাদের কিছু অত্যাচারের জবাব দিয়েছি।' এরপর কুরাইশরা মহানবি (সা.), তাঁর অনুসারী এবং তাঁর গোত্রের লোকদের সর্বাত্মকভাবে বয়কট করে। এ সময় শিয়াবে আবু তালিবে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নারী-পুরুষ-শিশু সবাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমেই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। গাছের পাতা ও চামড়া খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। তিন বছর এভাবে মহানবি (সা.) শিয়াবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন। এ সময় রাসূল (সা.) তাবলিগের কাজ একাকীই করতেন। তিনি যখন তায়েফে (৬১৯ খ্রি.) গমন করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে শুধু তাঁর আজাদকৃত ক্রীতদাস জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ছিলেন। কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা তীব্র হলে একান্ত বাধ্য হয়ে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। এই যে দীর্ঘ ১৩টি বছর তিনি তাবলিগের কাজ করলেন, এতে কতজন লোক ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন? খুবই সামান্য।

রাসূল (সা.) মদিনায় এলেন। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। মদিনাবাসীর সামনে 'মদিনা সনদ' উপস্থাপন করলেন, যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত প্রথম সংবিধান। কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন। গুজব, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও ফ্যাসাদে সিদ্ধহস্ত মদিনার তিনটি ইহুদি গোত্রকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করলেন। এর মধ্যে বনু কুরাইজাকে সমূলে উৎপাটন করলেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ বদর হলেও কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাসূল (সা.)-এর সেনাদল নিজেদের নিরাপত্তা এবং মক্কার ওপর নজরদারি রক্ষার জন্য নৈশ টহল দিত। বদর যুদ্ধের পূর্বেই মহানবি (সা.) আটটি সারিয়া ও গাজওয়া প্রেরণ করেছিলেন।[৩৪] ৮ নং অভিযানটি ছিল সারিয়ায়ে নাখলা। এতে অংশ নিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে ১২ জন মুহাজির সাহাবি। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবি মুহাম্মাদ (সা.)

---

[৩৪] সিরাত রচয়িতাদের পরিভাষায় সারিয়া বলা হয় সেসব সামরিক অভিযানকে, যাতে নবি (সা.) অংশগ্রহণ করেননি, চাই যুদ্ধ হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে গাজওয়া বলা হয় সেসব সামরিক অভিযানকে, যাতে নবি করিম (সা.) অংশগ্রহণ করেছেন, যুদ্ধ হোক বা না হোক। বদরের পূর্বে চারটি গাজওয়ার নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ (সা.)।

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন বাদশাহ ও আমিরের নামে চিঠি প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহাবিদের কয়েকজনকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। চিঠিতে সিলমোহর দেওয়া হতো। এ কারণে তিনি একটি রুপার আংটি তৈরি করেন। এতে মুহাম্মাদ, রাসূল ও আল্লাহ খোদাই করা ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর কুরাইশদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হলে রাসূল (সা.) ইহুদিদের দিকে নজর দেন। কেননা, কুরাইশদের উপেক্ষা করে ইহুদিদের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। এবার তাদের হিসাব-নিকাশের দিন ঘনিয়ে আসে। মহানবি (সা.) খায়বারে অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রচুর পরিমাণে গনিমতের মালিক হন।

অষ্টম হিজরিতে মহানবি (সা.) হারেস ইবনে উমায়ের (রা.)-কে একখানা চিঠিসহ বসরার গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রোমের কায়সারের গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর রাসূল (সা.)-এর দূতকে হত্যা করলে তিনি তিন হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে মুতার প্রান্তরে প্রেরণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করেন এবং ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করেন। মক্কা বিজয়ের ১৯তম দিনে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে হুনাইনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং এ যুদ্ধ থেকে ৬ হাজার যুদ্ধবন্দি, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরি, ৬ কুইন্টাল চাঁদি গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত হন। এসব মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। নবম হিজরির মুহাররমের চাঁদ ওঠার পরই তিনি বিভিন্ন গোত্র থেকে জাকাত আদায়ের জন্য তহশিলদার প্রেরণ করেন। এ রকম তহশিলদার ছিলেন ১৬ জন।

এ ছাড়াও তিনি এ সময় বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি সেই সময়ের সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শাসক রোমকদের মোকাবিলা করার জন্য ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। তাবুকে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তিনি রোমকদের ঔদ্ধত্য ও অহংকারপূর্ণ আচরণ চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য এই বলে প্রেরণ করেন—'বালকা এলাকা ও দারুমের ফিলিস্তিন ভূখণ্ড সবওয়ারদের মাধ্যমে নাস্তানাবুদ করে এসো।' তবে রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদে এই বাহিনী মদিনায় ফিরে এসেছিলেন।

খলিফা আবু বকর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত শাসনকালের পুরোটাই ছিল রিদ্দা বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই। তিনি ভণ্ড নবি ও জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভণ্ড নবি মুসায়ালামাকে দমন করতে গিয়ে ইয়ামামার প্রান্তরে ৩৯ জন কুরআনের হাফেজসহ ১২০০ জন মুসলিম বীর প্রাণ হারান।[৩৫]

[৩৫] গোলাম মোস্তফা, *হযরত আবু বকর*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, (ঢাকা : ২০১৭), পৃ. ৬৩

https://nagorikpathagar.org

তিনি হাজরামাউত ও ইয়েমেন আক্রমণের জন্য মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া, বাহরাইন দখল করার জন্য আল আলা, বনু কুফা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমর এবং মাহরা ও উমান দখলের জন্য হানিফাকে প্রেরণ করেন। বিচ্ছিন্নতাকারীদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আবু বকর (রা.) ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন এই যুদ্ধগুলোর নায়ক। মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই মধ্য আরবের উপজাতিগুলো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পুরো আরব উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ সামরিক অভিযানের ফলে পুরো আরব উপদ্বীপ যেন একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল এবং আরবের মাটি বীর নায়কদের পরিপোষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইসলামের প্রভাবে প্রাচ্য আবার জেগে ওঠে এবং হাজার বছর ধরে পশ্চিমা দুনিয়ার কর্তৃত্বের পর আবার নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিজয়রথ অব্যাহত ছিল উমর (রা.)-এর সময়েও। তাঁর আমলে বিজয় হয় সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মিশর, ত্রিপোলি ও বারাকা। উসমান ও আলি (রা.)-এর সময়ে স্বল্প পরিসরেও হলেও এই জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিনিধি উকবা বিন নাফির গতিকে আটলান্টিকের ঢেউ রুদ্ধ না করা পর্যন্ত তিনি থামেননি। এভাবে মরুভূমির সন্তানরা নদী অতিক্রম করে, সমুদ্র অতিক্রম করে ইসলামের মহান বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পুরো পৃথিবীর পরাশক্তিকে পদানত করে বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিলেন। মুসলিম শাসক খলিফা হারনুর রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাইজান্টাইন অধিপতি নাইসিফোরাসকে (৮০২-৮১১ খ্রি.) লিখেছিলেন এই ভাষায়—'করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অধিনায়ক হারুনের হয়ে রোমান কুকুর নাইসিফোরাসকে লিখছি। এই চিঠিটির আদ্যোপান্ত আমি পড়েছি। হে অবিশ্বস্ত মায়ের সন্তান, চিঠির জবাব চাও তো মুখোমুখি হও! কানে শোনার মতো কোনো জবাব নেই।'

আর আজ জেসাসের চেয়ে সেইন্ট বড়ো হয়ে গেছে। মুসলমানদের এই ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরবকে মাটিচাপা দিতে একশ্রেণির মানুষ উঠেপড়ে লেগেছে। ম্রিয়মাণ সুফিজমকে গৌরবময় তেজোদীপ্ত ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। ভাবখানা এমন—মুহাম্মাদ (সা.), খোলাফায়ে রাশেদিন কিংবা প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের ইসলাম ইসলামই নয়; বরং সুফিজমই ইসলাম। বাংলার ইসলামও আরবের ইসলাম নয়; এখানে এসেছে অরাজনৈতিক আধ্যাত্মবাদী সুফি ইসলাম। অথচ রাসূল (সা.) থেকে শেষ খিলাফত পর্যন্ত মুসলমানদের বীরোচিত ইতিহাস এ দাবির বিরুদ্ধে সগৌরবে দণ্ডায়মান।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার : রাজশক্তির ভূমিকা

পশ্চিমা দার্শনিকদের অনেকে মনে করেন, সুফি শব্দের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'সোফিস্ট' (Sophist) থেকে। এর অর্থ জ্ঞানী। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে শব্দটি 'সুফ' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ—পশম বা উল। শাব্দিক বিবেচনায়, পশম বা উলের কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিবর্গই হলো সুফি। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে 'সুফি' শব্দটি নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও চারিত্রিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা যে সুফি জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এতে কোনো দ্বিমত নেই। মুসলিম দর্শনে সুফিবাদ তাসাউফ নামেও পরিচিত। আবহমানকাল থেকেই মানুষ তার স্রষ্টাকে জানতে ব্যাকুল, তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। আত্মার সাথে পরমাত্মার এই যোগসূত্র স্থাপনের যে প্রয়াস, সেটাই সুফি দর্শন বা সুফিবাদ নামে পরিচিত। সুফি দর্শনের মূল লক্ষ্যই হলো মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধন।

দার্শনিক ভনক্রেমার মনে করেন, ইসলামে সুফিবাদের আগমন ঘটেছে খ্রিষ্টীয় প্রভাব থেকে। খ্রিষ্টীয় ধর্মের প্রচারকরা সাদাসিধে জীবনযাপন করে। তাদের গায়ে থাকে পশমি বস্ত্র, তারা প্রার্থনার সময় জপমালা ও একধরনের সংগীতের অনুশীলন করে। ঐতিহাসিক নিকলসন মনে করেন, হেলেনীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পৃক্ত ভাবধারা থেকে সুফিবাদের উৎপত্তি। তাঁর মতে, সুফিবাদ গ্রিক দর্শনের সম্পৃক্ত ভাবধারা থেকে উদ্ভূত। হিজরি প্রথম শতকে খ্রিষ্টান মরমিবাদীরা আরব ও সিরিয়ায় তাদের ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। তাদের সংস্পর্শে আসার ফলেই মুসলমানগণ সুফিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেউ কেউ মনে করেন, সুফিবাদের উৎপত্তি হয়েছে পারস্য থেকে। পারসিয়ানরাই সুফিবাদের প্রবর্তক। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যের মানুষেরা ছিলেন জরথুস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী, অগ্নি উপাসক। আরবদের নিকট পরাজিত হওয়ার পর উন্নত জাতি হিসেবে পারসিয়ানদের মধ্যে নৈরাশ্য ও হীনম্মন্যতার জন্ম হয়। এরপর থেকেই তারা মরমিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

https://nagorikpathagar.org

অধ্যাপক ব্রাউনির মতে, পারসিকগণই সুফিবাদের প্রবর্তক। আবার এইচ মর্টেন ও গোল্ড জিহারের মতে, সুফিবাদের উদ্ভব হয়েছে বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা থেকে। তাদের মতে, বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ সুফিবাদের রীতিনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। মায়াবাদে ইহজগৎকে মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী, অলীক, অবাস্তব, দৃষ্টিভ্রম, মায়া ইত্যাদি বলা হয়েছে। এইচ মর্টেন ও গোল্ডজিহার মনে করেন, সুফিবাদেও ইহজগৎকে ক্ষণস্থায়ী ও অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সুফিবাদ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব থেকেই আগত। ভারতীয় যোগী ও ঋষিদের জীবন হলো নিরাসক্ত। তারা কঠোর সংযমী এবং কৃচ্ছ্রতাবাদী। গোল্ড জিহার বৌদ্ধ দর্শনের বেশ কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সুফিবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধ দর্শন থেকে।

ইমাম হাসান আল বসরিকে (মৃ. ৭৭২ খ্রি.) প্রথম সুফি হিসেবে অনেকে মনে করেন। হাসান আল বসরির আবাস মদিনাতে হলেও বসরায় তাঁর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল। আবার অনেকে মনে করেন, কুফায় জন্মগ্রহণকারী আবু হাসিমই (মৃ. ৭৭৭ খ্রি.) প্রথম সুফি। অনেকের মতে জাবির ইবনে হাইয়ান হলো প্রথম সুফি। তবে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সুফি নামকরণটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তী হিজরি শতকে সুফি মতবাদ বিকশিত হয়। হাসান বসরি (মৃ. ৭২৮ খ্রি.), রাবিয়া (মৃ. ৭৫৩ খ্রি.), ইবরাহিম আদহাম (মৃ. ৭৭৭ খ্রি.), আবু হাশিম (মৃ. ৭৭৭ খ্রি.), দারুদ তারি (মৃ. ৭৮১ খ্রি.), মারুফ কারখি (মৃ. ৮১৫ খ্রি.) প্রমুখই সুফিমতের আদি প্রবক্তা। পরবর্তী সময়ে সুফি জুননুন মিশরি (মৃ. ৮৬০), শিবল খোরাসানি (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদি (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকগণ সুফি মতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন।[৩৬]

ইমাম গাজ্জালির প্রচেষ্টায় সুফিবাদ একটি সমৃদ্ধ মতবাদে পরিণত হয়। তাঁর মতে, শরিয়ত হলো মানুষের জন্য নির্ধারিত কানুন, হাকিকত হলো আল্লাহর বিধানের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি। আবার শরিয়ত হলো আল্লাহর ইবাদত আর হাকিকত হলো তাঁর দর্শন। ইমাম গাজ্জালির সময় আল কুশাইরি (মৃ. ১০৪৫ খ্রি.), আবদুল কাদের জিলানি (মৃ. ১১৬৬ খ্রি.), শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি আল মকতুল (মৃ. ৯২২ খ্রি.), ফরিদ উদ্দিন আত্তার (মৃ. ১২২৯ খ্রি.) প্রমুখ সুফি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (মৃ. ১২৩৪ খ্রি.), বখতিয়ার কাকি (মৃ. ১২৩৫ খ্রি.), ফরিদ উদ্দিন গঞ্জশাকার (মৃ. ১২৫৬ খ্রি.) এবং নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (মৃ. ১২৩৪ খ্রি.) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্পেনীয় সুফি মহি উদ্দিন ইবনুল আরাবি (মৃ. ১২৪০ খ্রি.) একজন

---

[৩৬] আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফি সাহিত্য* (ঢাকা : অন্বেষা, প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ১৯

https://nagorikpathagar.org

প্রভাবশালী সুফি ছিলেন। তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সর্ব-খোদাবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভাবশালী সুফি জালাল উদ্দিন রুমি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফি সাধক শেখ আহমদ সারহিন্দি (মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানি) (মৃ. ১৬২৪ খ্রি.) তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এভাবে সুফিবাদ একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সমৃদ্ধ হয় এবং বহু মনীষী, আলিম-উলামার প্রয়াসে একটি সমৃদ্ধ মতবাদ হিসেবে পরিচিতি পায়। ড. আহমাদ শরীফ লেখেন—

> চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাংলায় প্রসার লাভ করে। এরপরে নকশবন্দিয়া এবং আরও পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সুফির সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্ন রূপ নিল। আচার ও চর্চার ক্ষেত্রে যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হলো। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও এ অভিন্নতা প্রথম আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই মিলনবিরোধী আন্দোলনও শতোর্ধ্ব বছর পরে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে-সানি শেখ আহমদ-সারহিন্দির (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে।[৩৭] পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দারা (আল্লাহর নাম কীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি) সাফি, ইশক প্রভৃতি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সুফিদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃত রয়েছে। সুফিদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানবশত অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে তাহারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায় সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরোপুরি বাঙালি রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিল না।[৩৮]

ইসলামকে দেখতে হবে ইসলামের দৃষ্টিতে কিংবা নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর দৃষ্টিতে; কিন্তু সুফিতত্ত্বে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকগণ ইসলামকে দেখতে চান নিজেদের দৃষ্টিতে এবং নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী। বিপত্তিটা বেঁধেছে এখানেই। তারা দেখতে চান বাবুরাম সাপুড়ের সাপের মতো ইসলামকে। সে সাপের না ছিল শিং, আর না ছিল নখ। তার ছিল না কোনো উৎপাত, খেত শুধু দুদভাত—কোনো রকম ফোঁসফাঁস বা ঢুসঢাস করত না। হিন্দুত্ববাদী ও তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা ইসলামের এ রকমই একটি কল্পিত রূপ দাঁড় করিয়েছে এবং

---

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

https://nagorikpathagar.org

সেখানে সুফিবাদকে ইসলামের সিংহাসনে বসিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। তাদের মতে, এই ইসলাম অনেক ভালো আর মুহাম্মাদ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং পরবর্তী মুসলিম বীরদের ইসলাম হলো জবরদখল, জঙ্গিবাদ!

সুফিরা যে বাংলায় ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেননি তা নয়, তবে সেটাই বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বৃহৎ কারণ নয়। তা ছাড়া আরব-ইরান-তুরান আর উত্তর ভারতের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ নিয়ে সুফিজম বাংলায় পৌঁছেছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধদের অনেক বিশ্বাস ও আচরণও মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। উনিশ শতকের ওহাবি আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এইসব অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচরণ দূর করার কোনো প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা, গোরপূজা, পীরের উদ্দেশ্যে মানত প্রভৃতি যেসব প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল, নিঃসন্দেহে তা শাস্ত্রীয় ইসলামের ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। সুফিজমের এই বিকৃত অবমিশ্রিত দশার ব্যাপারে ডক্টর এনামুল হক বলেছেন—

> আরবি-নবিশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি বাংলা-নবিশ পর্যন্ত কেউই এই শাস্ত্রীয় ইসলাম বিরোধী মতবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের তো কথাই নাই। ইহার ফলে আজ বাংলায় এক একজন খ্যাতনামা পীরের ষাট-সত্তর হাজার করিয়া মুরীদ বা শিষ্য আছে দেখিতে পাই।...
>
> পীরবাদ প্রধানত পারস্য পূর্ববর্তী বিশাল ভূখণ্ডেরই ইসলামি খিচুড়ি। এই খিচুড়ি পাকাইবার ব্যাপারে তুর্কি, তাজিক, আফগানি, ফারসি প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মত্যাগী মুসলমানগণই প্রধানত কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই খিচুড়িতে যে বৌদ্ধ মাল-মশলাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কী?[৩৯]

বলা বাহুল্য, একসময় বৌদ্ধ ধর্ম পারস্য ও তুর্কিস্তান অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল।[৪০] তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির বিজয়ের পরই ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস পায়। সে সময় জনসাধারণের মাঝে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধর্মবেত্তাগণ। এ কাজে তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তবুও তাদের দাওয়াতের পথ নিষ্কণ্টক ছিল না। তুরস্কের কুনিয়া শহর থেকে

---

[৩৯] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব* (ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৯), পৃ. ১৪৫-১৪৯

[৪০] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাঙালী জাতি, বাঙলাদেশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪), পৃ. ৭৮

https://nagorikpathagar.org

আগমনকারী শাহ জালাল (রহ.)-কে রাজা গৌড় গোবিন্দের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তিনি ৩৬০ জন সাথি ও মুরিদ নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন এবং সিলেট অভিযানে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। গৌড় গোবিন্দ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলে সিলেটের আশেপাশের এলাকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ জালাল (রহ.) তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিজিত অঞ্চল ভাগ করে দেন।[৪১] শাহ তুরকান (রহ.) কয়েকজন দরবেশসহ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাগদাদ থেকে রামপুর বোয়ালিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। সে সময়ে ওই স্থানের তান্ত্রিক রাজা অংশুদেও চন্ডবন্দি বর্মভোজ এবং তার ভাই অংশুদেও খের্জুরচন্ড খড়্গ বর্মগুজভোজ তাদের দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষ ও শিশুদের বলি দিত। দরবেশদের সাথে রাজার সংঘর্ষ বাধে এবং দরবেশগণ বহু দেওসৈন্যকে হত্যা করেন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে অসমযুদ্ধে দরবেশগণ সকলেই নিহত হন। আনুমানিক ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে শাহ তুরকান শহিদ হন এবং মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে তার মাজার প্রস্তুত হয়।[৪২]

এরপর রাজশাহীতে আগমন করেন বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী (১২৩৭ খ্রি.) সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস ওরফে শাহ মখদুম (রহ.)। তিনি তিন শতাধিক সঙ্গীসহ ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তিনি এসেছিলেন মূলত তুরকান শাহ (রহ.)-এর শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রাজশাহী অঞ্চলে তাঁর ইসলাম প্রচারের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শাহ মখদুম (রহ.) শহিদ তুরকানের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নৌপথে মহাকালগড় আক্রমণ করেন। এখানকার দেওরাজাদের সাথে ঘোড়ামারা নামক স্থানে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক দেওসৈন্য নিহত এবং মুসলমানদের অনেকে শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম সৈন্যগণ দেওরাজার প্রাসাদ অবরোধ করে। দেওরাজ সে যাত্রায় পলায়ন করে প্রাণে বাঁচে। শাহ মখদুম (রহ.) মহাকালগড় ত্যাগ করলে দেওরাজারা পুনরায় ঐক্যজোট হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শাহ মখদুম (রহ.) আবারও মহাকালগড়ে আগমন করেন। আবারও যুদ্ধ শুরু হয় এবং দেওরাজা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। শাহ মখদুম (রহ.) সকলকে ক্ষমা করে দিলে তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি দেওমন্দিরের সকল আসবাবপত্র ও মূর্তি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন। শাহ

---

[৪১] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৯, সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩০৯-৩১০

[৪২] ড. আবু নোমান মো. আসাদুল্লাহ, *রাজশাহীর প্রথম ইসলাম প্রচারক তুরকান শাহ শহীদ* (রাজশাহী : হেরিটেজ রাজশাহী, ২০১৯), পৃ. ১৭২

https://nagorikpathagar.org

মখদুম (রহ.) ও তাঁর অনুচরবৃন্দ মহাকাল দেওমন্দিরের স্থানেই আস্তানা স্থাপন করেন এবং এই মহান দরবেশের স্মৃতি রক্ষার্থে মহাকালগড়কে নতুন নামে অভিহিত করা হয়—বুয়ালিয়া (বু আউলিয়া, বোয়ালিয়া)।[৪৩]

সুলতান বারবক শাহের আমলের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) একজন পরিচিত দরবেশ হলেন শাহ ইসমাইল গাজি (রহ.)। মহানবি (সা.)-এর বংশধর শাহ ইসমাইল গাজি বাংলার বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলার দক্ষিণ সীমান্তে উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে পরাজিত করে তার কাছ থেকে সীমান্তফাঁড়ি মান্দারগণ দখল করে নেন। সফল এই সেনানায়ককে এরপর কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হয়। কামেশ্বর পরাজিত হয়ে সুলতানকে কর দানে বাধ্য হন।[৪৪] বগুড়ার শাহ সুলতান মাহীসাওয়ার (রহ.) ছিলেন একজন দরবেশ। তিনি মধ্য এশিয়ার বলখের জনৈক রাজার পুত্র ছিলেন। তিনি বলখি নামেও পরিচিত। পরবর্তী সময়ে তিনি দামেশকের পীর শেখ তৌফিক শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশে বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তিনি সমুদ্রপথে প্রথমে সন্দ্বীপ অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে হরিয়াম নগরে আসেন। এখানকার কালী উপাসক শাসক বলরামের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে রাজা মারা যান এবং তার মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচান। অতঃপর শাহ সুলতান মহাস্থানগড়ের দিকে অগ্রসর হন। স্থানীয় রাজা পরশুরাম ও তার বোন শিলাদেবী শাহ সুলতানকে বাধা দেন। ফলে দু-পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা নিহত হন এবং শিলাদেবী করতোয়া নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি মাহিসাওয়ার (মাছের পিঠে আরোহণকারী) নামে সমধিক পরিচিত।[৪৫]

বাংলায় আগত সুফিদের মধ্যে শাহ সুলতান রুমিকে সর্বপ্রাচীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তিনি মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই বাংলায় আসেন। তিনি ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহে আসেন। বর্তমান নেত্রকোনার মদনপুরে তাঁর সমাধি রয়েছে। কিংবদন্তি অনুযায়ী, সামসময়িক কোনো রাজা শাহ সুলতান রুমির আধ্যাত্মিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদনপুর গ্রামটি তাঁকে দান করেন। প্রাথমিক বাংলায় মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে এ পর্বের সুফি সাধকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। এই

---

[৪৩] মুহাম্মাদ, জোহরুল ইসলাম, *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮), পৃ.৯৩

[৪৪] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩০৮

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

https://nagorikpathagar.org

প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট যে, সেন যুগে অভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও রাজশক্তি এবং উচ্চবর্ণের অত্যাচারে সাধারণ হিন্দু সমাজ এবং পাশাপাশি বৌদ্ধ সমাজও কোণঠাসা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সুফিদের ধর্ম প্রচারে তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। সুফিগণ তাঁদের খানকা প্রতিষ্ঠা করে তাকে ঘিরে মসজিদ-মাদরাসাও স্থাপন করতেন। এগুলো ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। এর ফলে মুসলমান সমাজের বিস্তার ত্বরান্বিত হতে থাকে। সুফিদের তৎপরতা সমাজ জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। ফলে সাধারণ মানুষ সুফিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। এভাবে মসজিদ, মাদরাসা, খানকা রাজধানী ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সুফি ধারার বিস্তার বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। একটি আদর্শ খানকায় মসজিদ, মাদরাসা, লঙ্গরখানা, মুসাফিরখানা, চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকত। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে দুস্থ ও দরিদ্রদের ভিড় থাকত। খানকাগুলোকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে চারপাশের অঞ্চলে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। কখনো কখনো খানকাগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হতো। রাজশক্তির সঙ্গে সুফিদের যোগাযোগ এই ক্ষেত্রটিকে বিকশিত করে। ড. কাজী দীন মুহাম্মদ বলেন—

> আজ থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর অগে নূহ (আ.)-এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনের পর আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁর প্রপৌত্র 'বঙ' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এরপর যে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তা-ই বঙ্গ জনগোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। কালের বিবর্তনে উক্ত 'বঙ' থেকেই বঙ্গদেশের নামকরণ হয়েছে। কাজেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবদেশে হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের পর বাংলায় যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইসলামের বাণী পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়ী মুসলমান শাসকদের ভূমিকা কোথাও কোথাও থাকলেও মূলত ইসলামের ধারক ও বাহক সাহাবী ও মুফীয়া-ই-কিরামের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁদের চারিত্রিক মাধুর্য ও নিঃস্বার্থ মানবিক জীবনাদর্শনই ধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক ছিল।
>
> সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশ, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, এমনকি চীন দেশ পর্যন্ত এ সকল সুফি সাধক ও বণিকের মাধ্যমে ইসলামের তাওহিদ প্রচারিত হয়। হজরত মুহাম্মাদ

https://nagorikpathagar.org

(সা.)-এর পর খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে (৬৩৫-৬৪৫) বঙ্গে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়েছিল। তারা বাণিজ্যক্রমে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়। এতে নীরবে ইসলাম প্রচারের জন্য এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কীভাবে এ সময়ে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেন—তার বিবরণ নিশ্চিত জানা যায় না। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৪৬]

আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ বলেন—

বাংলাই বোধহয় একমাত্র দেশ, যেখানে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রসারের গতি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসরণ করেনি। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বহু পূর্বেই বাংলায় মুসলিম বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল—এ অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি আছে। এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে ইসলামি সংস্কৃতির মূলভাব—বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও যুক্তিবাদিতার অলক্ষ্য প্রসারই হয়েছিল বেশি। মুসলিম কিংবদন্তি ও লোকগাথার সবটাই যে মিথ্যা একবারও অবশ্য পুরোপুরি যুক্তিসংগত নয়। অপাঙ্‌ক্তেয় বৌদ্ধ সমাজে দুএকজন মুসলিম প্রচারকের সরব সক্রিয়তার প্রমাণ না থাকলেও একেবারেই অসম্ভব মনে করার হেতু নেই। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম সমাজের যতটুকু প্রভাব ছিল তার ঝোঁক মুখ্যত ধর্মগত নয় সংস্কৃতিগত।[৪৭]

ড. আবদুল করিম বলেন—

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে সুফি দরবেশ এসেছিলেন কি না, ইতিহাস তা বলতেও পারে না। তবুও পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আল ইদ্রিসী, আল-মাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদুদল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে স্বীকার করতে হয় যে—অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়।

---

[৪৬] ড. কে এম মোহসীন ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ১৬৭-১৭৬

[৪৭] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) *বাঙালির আত্মপরিচয়* (ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০১৮), পৃ. ১২০

https://nagorikpathagar.org

অবশ্য Periphus in the Erythrean Sea-এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বণিকেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। সে মতে, বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়েছিল কিনা জানা নেই। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুড়ে ময়নামতিতে কিংবা কামরূপে যাতায়াত ছিল কিনা বলা যাবে না। কেননা, তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বণিকগণ বা তাদের সাথিদের কেউ ইসলাম প্রচারে আগ্রহী হয়নি, এমন কথা ভাবব কেন! আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিম সমাজে সুফি মতবাদ প্রসার লাভ করেনি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধর্মীয় হাতে ছিল বলে এ দেশে যারা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তারা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সম্মান অর্জন করতে পারেননি।

চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে সুফি প্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সুফির কাহিনি এবং খানকা ও দরগাহর খবর আমরা জানি, তাদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন, বাবা আদম শহিদ। বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদম শহিদ বিক্রমপুরের এক সেনরাজা বল্লালের সামসময়িক। আনন্দ ভট্ট রচিত *বল্লালচরিতম* সম্ভবত এরই জীবন চরিত্র, লক্ষ্মনসেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।

নগেন্দ্র বসুর মতে, বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ওই সময়ের। চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং 'বদর মোকাম' খ্যাত বদর শাহ-বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচ পীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এর অবস্থিতি কাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে। শেখ জালাল উদ্দিন তবরেজীর নাম *শেক শুভোদয়া*-র সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ একে জাল গ্রন্থ বলে মনে করেন। এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষণ সেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রিষ্টাব্দের পরে বেঁচে থাকেন, তাহলে *শোকশুভোদয়া* তার রচনা করা সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে, ভাষার বিকৃতিতে ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে।...

আবদুর রহমান চিশতির মতে, জালালুদ্দনি তবরেজীর পুরো নাম ছিল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তবরেজী। তিনি শেখ শাহাবুদ্দিন

https://nagorikpathagar.org

সোহরাওয়ার্দীর শাগরেদ ছিলেন। তিনি কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দিন, জাকারিয়া নিয়ামুদ্দিন মুগরা ও দিল্লির সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের (১২১০-৩৬) সামসময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লি আসলে তাঁকে সুলতান ইলতুৎমিশ অভ্যর্থনা করেন—এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে, জালালুদ্দীন তবরেজী লক্ষণ সেনের আমলে বাংলায় আসেননি। আসলে শেখ বাংলা থেকেই দিল্লি গিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার শেখ জালালউদ্দিন তবরেজী ও সিলেটের জালালউদ্দিন কুনিয়াঙ্গকে অভিন্ন মনে করেন। ময়মনসিংহ জেলার মঙ্গলপুরে শাহ সুলতান রুমী নামে এক সুফির দরগাহ আছে। তিনি ৪৪৫ হিজরি বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তী কালের দলিলসূত্রে দাবি করা হয়। কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetteer-এ উল্লেখ আছে। কিন্তু আরও প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।[৪৮]

১৮৭২ সালে আদমশুমারির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য হেনরি বেভারলি (Henry Beverley)। তিনি দেখতে পান যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ১.৭ কোটির অধিক মুসলমান বাস করে। এতসংখ্যক মুসলমান তখন বেশির ভাগ দেশেই ছিল না। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, বাংলায় এত মুসলমান কোথা থেকে এলো? বেভারলি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসেন, বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্যের কারণ—বিপুলসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে। ড. আকবর আলী খান লেখেন—'ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, বাংলাদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। খোন্দকার ফজলে রাব্বি, ডক্টর আব্দুর রহিম ও ডক্টর মোহর আলি মনে করেন যে, বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা মুসলমান জনসংখ্যার বড়ো অংশ নয়।'[৪৯]

তিনি আরও বলেন—কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের ফলে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করে নেয়। অন্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন, বাংলাদেশে

---

[৪৮] আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, (ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ১১-১৫

[৪৯] আকবর আলী খান, *বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, পৃ. ১২

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম প্রচারে কমপক্ষে চার শ থেকে সাত শ বছর সময় লেগেছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারে সুফি, দরবেশ ও পীরদের ভূমিকা রয়েছে। এ ধরনের সুফি, দরবেশ ও পীরেরা শুধু বাংলাদেশেই আসেননি; তারা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। তাই বাংলায় ইসলাম প্রচারে সুফি, দরবেশ ও পীরদের ভূমিকা রয়েছে, সেটা বলাই যথেষ্ট নয়। কেন এই পীরেরা বাংলায় সফল হয়েছেন অথচ ভারতের অন্যত্র সফল হয়নি, তার ব্যাখ্যারও প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রজন্মের একজন তত্ত্ববিদ অসীম রায় মনে করেন, বাংলার অস্থিতিশীল সমাজে পীরগণ সংঘবদ্ধকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। তারা বাংলা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হন বলেই ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাফল্য অর্জন করেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের আরেকজন তাত্ত্বিক রিচার্ড এম ইটন মনে করেন, বাংলার পীরগণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য পীরের চেয়ে ভিন্ন ধরনের ছিলেন। তারা শুধু ইসলাম ধর্মই প্রচার করেননি, তারা ধর্মান্তরিতদের অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল করার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় ঘরানার ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজের গড়ন ও প্রকৃতি দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে গ্রামীণ সংগঠন ইসলাম প্রচারকে রোধ করেছে, কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা

রাজশক্তি ভিন্ন বিশ্বে কোথাও ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তা-ই নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অভাব হেতু অনেক জায়গায় মুসলমানগণ পুরোপুরিভাবে উৎখাত হয়ে গেছেন সুদীর্ঘকালের ইসলামি খিলাফতের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও। স্পেন আমাদের সামনে তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আর সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বিনির্মাণে দুনিয়াব্যাপী রাজশক্তিই সর্বদা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে; বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে পীর-মাশায়েখ-আউলিয়াদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর ভেতরে সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষক শ্রেণি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা নিয়ে আধুনিক সময় পর্যন্ত তেমন মাতামাতি আছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। ইতিহাস সর্বদা রাজশক্তিরই তোয়াজ করে থাকে। কেননা, রাজদণ্ডের ওপরই অপরাপর উপাদানের সফলতা নির্ভরশীল।

ড. বেরি ফিলের মতে, ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আমেরিকায় হাজির হয়েছিল মুসলমানরা। ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে আবুল হাসান আলি বিন মাসউদি তার ভূগোলে আমেরিকা ভূখণ্ডকে স্পষ্ট করেন। ৯৭৩ সালে আল বেরুনি আমেরিকা ভূখণ্ডকে

https://nagorikpathagar.org

'নিউ ওয়ার্ল্ড' নামে অভিহিত করেন। ৯৯৯ সালে ইবনে ফাররুখ জ্যামাইকা ও আমেরিকা উপকূলে অভিযান সম্পন্ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩১২ সালে মালি এবং পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমানদের একটি দল মেক্সিকো উপসাগরের কূলঘেঁষে মিসিসিপি নদী অতিক্রম করে আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।[৫০] মালাবারে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণ পাওয়া। এ বিবরণ অনুযায়ী প্রথম ধর্মপ্রচারকগণ ছিলেন সফল তীর্থযাত্রী, যারা আদম (আ.)-এর পদচিহ্ন জিয়ারত করার জন্য শ্রীলঙ্কা যাচ্ছিলেন। তারা ক্রাঙ্গানোরে পৌঁছলে সেখানকার রাজা তাদের ডেকে পাঠান। তীর্থযাত্রী দলের প্রধান ছিলেন শেখ শারাফ বিন মালিক। রাজার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি রাজদরবারে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই মালিক বিন দিনার ও ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক বিন হাবিব। শেখ শারাফ সুযোগ পেয়ে রাজদরবারে রাজার কাছে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার সততা রাজার অন্তরে প্রবেশ করে এবং রাজা ঈমান আনেন।[৫১]

মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মের বহুকাল পূর্ব থেকেই চীনের সাথে আরবীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। চীনারা মদিনায় নতুন মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়ের কথা জানত এবং চীনের ওই সময়কার ইতিহাসে ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ট্যাং বংশের (৬১৮-৯০৭) শাসনামলে আনাম, কম্বোডিয়া, মদিনা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে ব্যাপকসংখ্যক বিদেশি আগন্তুক ক্যান্টান নগরীতে আগমন করে। আরব বণিকেরা সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে চীন দেশে এসেছিলেন। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, মধ্য এশিয়া বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে চীন সম্রাটের রাজদরবারে দূত পাঠান এবং চীন সম্রাট উক্ত দূতকে প্রচুর উপঢৌকনসহ স্বদেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

চৈনিক ইতিহাসে উল্লেখ আছে, ৭২৬ সালে মুসলিম খলিফা হিশাম চীন সম্রাট সুয়াংটুং-এর রাজদরবারে সুলাইমান নামক এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট সু সাং আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুরের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করলে খলিফা চীন সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। আরব সেনাবাহিনী চীনকে দুটি শহর পুনরুদ্ধারে সহায়তা

---

[৫০] মুসা আল হাফিজ, *আমেরিকা মুসলমানদের আবিষ্কার* (ঢাকা : কালান্তর প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ৯৯-১০০

[৫১] টি. ডব্লিউ আর্নল্ড, *বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*, উৎস : *প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ হান্নান (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৯), পৃ. ২১৬

https://nagorikpathagar.org

করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে আরব সেনাবাহিনী আর স্বদেশে ফিরে যায়নি, তারা চীনা মহিলাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে চীন দেশে বসবাস করতে থাকেন। এদের বহু পূর্বেও চীনের ক্যান্টনে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়েছিল। বিষয়টি চীনা বিবরণে এসেছে এভাবে—

> এই সকল বিদেশি আগন্তুক সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করে। তাদের উপাসনালয়ে কোনো দেব-দেবীর মূর্তি, প্রতিমা কিংবা প্রতিচ্ছবির অস্তিত্ব নেই। মদিনা রাজটি ইন্ডিয়ার নিকটবর্তী একটি দেশ। সেই দেশে ওসব আগন্তুকের ধর্মের গোড়াপত্তন ঘটে এবং আগন্তুকদের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা সম্পূর্ণ একটি আলাদা ধর্ম। আগন্তুকেরা মদ্যপান করে না, শূকরের মাংস আহার করে না এবং নিজেদের জবেহ করা প্রাণী ব্যতীত অন্য প্রাণীর মাংস অপবিত্র মনে করে স্পর্শ পর্যন্ত করে না। তাদের হুইহুই বলা হয়ে থাকে। তারা সম্রাটের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় এবং ক্যান্টন নগরীতে বসবাস শুরু করে। তারা আমাদের স্থাপত্যকলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সুরম্য ভবন তৈরি করেছে। তারা সকলেই ধনী এবং তারা তাদের সমাজপতিদের নির্দেশ মেনে চলে।[৫২]

চীনা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে যে, চীন দেশে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক মাতা। তাঁর নামে ক্যান্টনে নির্মিত মাজারকে লোকজন অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে দেখে থাকে। মোঙ্গল অভিযানের সময় আরব, পারস্য ও তুরস্ক থেকে বিপুলসংখ্যক মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটে চীন দেশে। এদের কেউ বাণিজ্য উপলক্ষ্যে, কেউ কারিগর হিসেবে, কেউবা সৈনিক হিসেবে চীনে গমন করেছিলেন। যুদ্ধবন্দি হিসেবেও অনেক মুসলমান চীনে নীত হয়েছিলেন। এ সকল বহিরাগত অধিকাংশ চীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং তারা কালক্রমে একটি সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে ওঠে। মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে চীনা রাজদরবারে অনেক মুসলিম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১২৪৪ সালে চীনের রাজকোষ ও রাজস্বের প্রধান কর্মকর্তার পদে নিয়োজিত ছিলেন আবদুর রহমান নামের জনৈক মুসলিম। চীনের সকল প্রকার রাজস্ব ও শুল্কবিষয়ক দায়িত্ব তাঁর কর্তৃত্বে ছিল।

১২৫৯ সালে কুবলাই খাঁ চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে বোখারার অধিবাসী উমর

---

[৫২] টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড, *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*, অনু. মোঃ সিরাজ মান্নান ও অন্যান্য (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২), পৃ. ৩২৩-৩২৫

https://nagorikpathagar.org

শামসুদ্দিনকে নিযুক্ত করেন। উমর শামসুদ্দিন, সৈয়দ আজল নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ইউনান বিজয় ও সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পর উমর শামসুদ্দিন ওরফে সৈয়দ আজলকে ইউনান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ইউনান প্রদেশে তিনি বহু মসজিদ ও কনফুসীয় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অদ্যাবধি ইউনান প্রদেশে ইসলাম ধর্ম সেই সুনাম ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।[৫৩]

হিজরি প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে আরব ব্যবসায়ীরা মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাণিজ্যের পুরোটাই ছিল আরবদের হাতে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শ্রীলঙ্কা হয়ে চীনের সঙ্গে পরিচালিত তাদের এই বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আর দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তারাই ছিল প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচারের জন্য মুসলমানরা স্থানীয়দের ভাষা ও অনেক প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তারা স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করেন এবং নিজেদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য দাস ক্রয় করেন। শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রের প্রথম সারির সর্দারদের সঙ্গেও তাঁরা নিজেদের প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

এসব বণিক পরস্পর মিলেমিশে অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করতেন। ফলে সমন্বয়ের মাধ্যমে তারা স্থানীয়দের চেয়ে অধিক শক্তি অর্জন করেন। এদিকে তাদের অধীনে ছিল অনেক দাস-দাসী। এভাবেই তারা নিজেদের মধ্যে একধরনের সংঘ গড়ে তোলেন এবং পরিবারের মধ্যে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে একধরনের রাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করেন। বলা আবশ্যক যে, এভাবে মালয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানদের বসতিগুলো ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টার রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দের মতো তারা বিজয়ী হিসেবে এ দেশে আসেননি অথবা ধর্মান্তরিত করার জন্য তরবারিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেননি।[৫৪]

মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকতর সভ্য জাতিগোষ্ঠীগুলোই অত্যন্ত আগ্রহভরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে নিম্নশ্রেণির মধ্যে ইসলাম তেমন একটা জায়গা করে নিতে পারেনি। এরূপ ঘটেছে নিউগিনি ও তার উত্তর-পশ্চিমের ওয়াইগিউ, মিসুল, ওয়াইগামা, সালাওয়াতি প্রভৃতি দ্বীপে। ষোড়শ শতাব্দীতে নিউগিনির উত্তর-পশ্চিম উপদ্বীপসহ এ সকল দ্বীপ মালাক্কার রাজা বাতজানের সুলতানের শাসনাধীন ছিল। বাতজানের মুসলমান শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ সকল

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬-৩২৭

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬-৩৯৮

https://nagorikpathagar.org

দ্বীপের পাপুয়ান শাসকগণ ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫৫] পর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের আক্রমণের মুখে কীভাবে এখানে ইসলাম তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। আমরা শাহ মখদুম (রহ.)-এর সাথে দেওরাজাদের ঘটনাবলিও পর্যালোচনায় আনতে পারি। হজরত শাহ মখদুম (রহ.) দেওরাজাদের পরাজিত করে মখদুম নগরে (বাঘা) ফিরে গেলে দেওরাজরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে মহাকালগড়ে (রামপুর বোয়ালিয়া) উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত হজরত শাহ মখদুম (রহ.)-এর বাহিনীই জিতে যায়। মহাকালগড়ের এই তৃতীয় যুদ্ধের মাধ্যমেই মহাকালগড় তথা রামপুর বোয়ালিয়ার সম্পূর্ণ আধিপত্য মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে এবং হজরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহ.)-এর আস্তানা বাঘা থেকে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়।[৫৬]

বাংলাদেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক নৃতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করেন হার্বার্ট রিজলি নামক একজন সিলিভিয়ান। এই জরিপের ফলাফল ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। রিজলির মতে, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের চাইতে নিম্নবর্ণের পোদ, কোচ ও চণ্ডালদের মিল বেশি। ফলে রিজলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, বাংলার মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বেভারলি ও রিজলির বক্তব্য সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি। তিনি বলেন, বাংলার মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হননি; তাদের অধিকাংশই পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত অভিবাসী আশরাফ মুসলমানদের সন্তান। তিনি বলেন—

> রিজলির জরিপ ২৮৫ জন বাঙালি গরিব মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এরা ছিল জেলের কয়েদি। দ্বিতীয়ত, রিজলি হিন্দুদের ১৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করে জরিপ কার্য সমাধা করলেও সব মুসলমানকে এক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন। তৃতীয়ত, রাব্বি দাবি করেন যে—দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বাস করার ফলে মুসলমান অভিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও মুসলমান অভিবাসী আর হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চেহারায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি দাবি করেন, ভারতের ৫৬২ বছরের অবিচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনামলে এমন কোনো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে বাংলায় দলে দলে মানুষ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, আরব ও

---

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

[৫৬] মুহাম্মাদ জোহরুল ইসলাম, *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৯২-৯৩

https://nagorikpathagar.org

ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমানদের বাংলায় অভিবাসনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া বাঙালি মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা ও তার উচ্চারণ বাঙালি হিন্দু থেকে ভিন্ন।[৫৭]

ডা. আকবর আলী খান বলেন—

রিজলির পরিমাণ ভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দুর্বলতাগুলো রাব্বি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাংলার বেশির ভাগ মুসলমানই যে অভিবাসীদের সন্তান, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি অনুল্লিখিত থাকার কারণে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, ধর্মান্তকরণ আদৌ ঘটেনি। কিন্তু বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের অনুমানকে সমর্থন করে।[৫৮]

রিজলি সাহেবের কাজে সহায়তা করেছিলেন বাবু কুমুদ বিহারী। ড. ফজলে রাব্বি বলেন—

আমি তাঁর নিকট জানতে পারি যে, তিনি (রিজলি) ইচ্ছা করেই উচ্চ বংশজাত, সম্মানযোগ্য ও মর্যাদা সম্পন্ন মুসলমানদের মাপজোখ গ্রহণ করেননি; কেবল নিম্নতম শ্রেণির মুসলমানদের মাপজোখই গ্রহণ করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে

মহাশয় বলেন—পূর্ব বাংলার কেবল নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের পরিমাপ নেয়ার জন্য এবং তারা যে নিয়মিত মুখাবয়বের অধিকারী, তার দৈহিক পরিমাপ পরীক্ষা না করার জন্য কিংবা পরীক্ষা করলেও তিনি যাতে তা রেকর্ডভুক্ত না করেন, তার জন্য রিজলি সাহেব স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি পূর্ব বাংলার কয়েকটি কারাগার পরিদর্শন করেন এবং ওই সমস্ত কারাগারের কয়েকজন কয়েদির পরিমাপ নিয়ে সেগুলো রিজলি সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি পরিশেষে সেগুলো তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন।...

রিজলি সাহেবের মতানুযায়ী দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুন্দর নাক ও মোটামুটি সুশ্রী মুখমণ্ডল যদি একটি উৎকৃষ্টতর জাতির লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে একই শ্রেণির হিন্দুদের চাইতে উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যেই সেগুলোর সাক্ষাৎ অধিক পরিমাপে মিলবে। যে নাসিকা

---

[৫৭] আকবর আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪; খন্দকার ফজলে রাব্বি, *বাংলার মুসলমান*, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক (ঢাকা : বাংলা একাডেমী; বর্ধমান হাউস, ১৯৬৮), পৃ. ১১৯-১২৯

[৫৮] আকবর আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

https://nagorikpathagar.org

> পরিচিতিকে জাতি বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মূল্যবান পরিচায়ক বলে বিবেচনা করা হয়, সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা মনে করি—এ দেশের অনার্যদের নাক সরু, উন্নত ও খাড়া। মোটকথা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের নাক একই মর্যাদাসম্পন্ন হিন্দুদের নাকের চাইতে সাধারণত বেশি সুন্দর এবং একইরূপে মুসলমানদের নিম্নতর সম্প্রদায়ের নাক সমপর্যায়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের নাকের চাইতে উত্তম। এ দুটি জাতির কেবল নাকের পরীক্ষা থেকেই এ কথা প্রমাণিত হবে যে, এ দেশের অধিকাংশ মুসলমান বাংলার আদিম জাতি ও উপজাতির বংশধর নয়।[৫৯]

ড. রাব্বি বলেন—'বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কারণ, অধিকাংশ পরিবারই এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে যে, ওই সমস্ত পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত তাদের কুল এবং পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত বিবরণের কথা খুব সামান্যই জানে। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য তাদের এত বেশি নিম্নপর্যায়ে এনেছে যে, তারা এখন জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।' তিনি মনে করেন, সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান–এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে গঠনকারী প্রধান চারটি বংশ। সৈয়দদের মধ্যে রয়েছে হাসানি-উল-হোসেনি, রজভি, মুসবি, নকভি, তকভি, জায়েদি, ইসমাইলি, তবতবাই, উলভি, বুখারি, কিরমানি, শবজাওয়ারি ইত্যাদি। শেখদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দিকি, ফারুকি, উসমানি, আব্বাসি, খালেদি, হারেসি ইত্যাদি। আর মির্জা, বেগ ও খানেরা মোগল ও পাঠান বংশের লোক।

সৈয়দ ও শেখ বংশের আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ এবং উলামা শ্রেণির লোকেরা শাহ ও খন্দকার উপাধি দ্বারা বিশেষভাবে অভিহিত হয়েছেন গৌড়ের রাজদরবার কর্তৃক। মোগল ও পাঠানদের মধ্যে মালিক নামে একটি শ্রেণি আছে। তা ছাড়া হিন্দু ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরাও অনেক সময় আমিরগণ কর্তৃক 'মালিক' বলে অভিহিত হতেন। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত অন্য বহু জাতি এবং তাদের বংশধরগণ একইরূপে শেখ ও খান নামে অভিহিত। শেখ, খান ও মালিক নামে অভিহিত শ্রেণিগুলোর মধ্যে সদ্বংশজাত ও নীচ বংশজাত উভয়বিধ লোকই রয়েছে। কাজি ও চৌধুরি নামে অভিহিত শ্রেণিগুলো প্রধান চারটি বংশের যেকোনো একটির অন্তর্ভুক্ত। কিছু খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত মানুষ মর্যাদার জন্য 'ঠাকুর' নামে উপাধি গ্রহণ করেছে। আবার বিশ্বাস ও ঠাকুর উপাধিধারী ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত অনেক পূর্বতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরোনো কুল-নাম পরিত্যাগ করেনি।[৬০]

---

[৫৯] খন্দকার ফজলে রাব্বি, *বাংলার মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩৫

https://nagorikpathagar.org

রিজলির পর নৃতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করেন ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্বের জনক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবশী (১৯২৭ সালে), বি এস গুহ (১৯৪৪ সালে) এবং ডি এন মজুমদার ও সি আর রাও (১৯৭০ সালে প্রকাশিত)। উক্ত জরিপগুলোর বেশির ভাগ প্রমাণ করে, বাংলাদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই মোট মুসলিম জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ।[৬১] আকবর আলী খান বলেন—

> যদিও অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নরগোষ্ঠীর শ্রেণির বিচারে সমরূপ, তবু বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান অভিবাসী যে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে অবিসংবাদিত প্রমাণ রয়েছে। বাংলার কিছু মুসলমানের জন্ম হয়েছে স্থানীয় ও অভিবাসী মানুষের সংমিশ্রণে।...বিতর্কের মূল বিষয় তাই দাঁড়িয়েছে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার কত অংশ অভিবাসী তা নির্ধারণ করা। ১৯০১ সালে ই. এ. গেইট বাংলার আদমশুমারি পরিচালনা করার সময়ে মুসলমানদের শতকরা কত অভিবাসীদের বংশধর, তার একটি হিসাব করার চেষ্টা করেন। তার মতে সেই সংখ্যাটা ১৬.৬ শতাংশের অধিক হওয়া সম্ভব নয়। গেইটের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে ১৯০১ সালে এ. এ. গজনভি অনুমান ব্যক্ত করেছিলেন—'আমার ধারণা, মোটামুটিভাবে এখনকার শতকরা ২০ ভাগ মুসলমান বিদেশি অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ বংশধর; শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।'[৬২]

ড. মোহর আলিও গেইটের উপরিউক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তার অভিমত হচ্ছে, বাংলায় অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।[৬৩] তিনি আরও বলেন—সাহিত্যিক, নৃতাত্ত্বিক ও বাংলার মুসলমানদের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রায় ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে।[৬৪]

ড. অতুল সুর বলেন—

> বাংলার মুসলমানদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা : আগন্তুক মুসলমান, ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং সংমিশ্রিত মুসলমান। প্রথম শ্রেণির

---

[৬১] আকবর আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৬৩] আকবর আলী খান, *সমাজ রাষ্ট্র বিবর্তন*, জ্ঞান তাপস আবদুর রাজ্জাক গুণিজন বক্তৃতামালা (২০১৭-২০১৮), সম্পাদনা : আহমার আহমদ (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ০৯), পৃ. ৫৪-৫৫

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

https://nagorikpathagar.org

অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, বাংলার মুসলমান শাসক ও পাঠান সুলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আনীত বিদেশি মুসলমানদের বংশধর। দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, যাদেরকে স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণি মুসলমান হচ্ছে, উপরিউক্ত দুই শ্রেণির সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।[৬৫]

তার মতে, এই সকল মুসলমানদের উদ্ভব ঘটেছিল সার্ধ ৫০০ বছরের মধ্যে (১২০৩-১৭৬৫)। এরপরের মুসলমানদের তিনি দেশজ মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে গৃহীত আদমশুমারির সময় মুসলমানরা দাবি করেছিল—তারা দেশজ সম্প্রদায় নয়, তারা সকলেই বাংলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। সে দাবিটা যে সম্পূর্ণ অমূলক ও অলীক, তা প্রমাণে তৎকালীন প্রারম্ভে বাংলাদেশে মুসলমানদের জনবিন্যাস সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ড. অতুল সুর :

অঞ্চল	মুসলমান জনসংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা (প্রতি ১০,০০০)
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৪,৪২০	১,৩১৭
মধ্যবঙ্গ	৩,৭৭৩,৩২১	৪,৮৭৫
উত্তরবঙ্গ	৫,৮৭৬,৪০৮	৫,৮৭৩
পূর্ববঙ্গ	১১,২২০,৪২৭	৬,৬১৭

উত্তরবঙ্গে সংখ্যাধিক মুসলমান দেখে বুকানন হ্যামিলটন মন্তব্য করেছিলেন, উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা বাংলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর নয়; তারা ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা কোচ (রাজবংশী) জাতি থেকে উদ্ভূত বলে ড. সুরও মনে করেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত দেশজ হিন্দু জাতিসমূহ থেকে উদ্ভূত বলে তিনি ড. ওয়াইজের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন।[৬৬] তিনি বলেন—'বস্তুত চতুর্দশ শতাব্দীতে কিছুকালের জন্য মুসলমান সুলতানরা পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও-এ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা পীর, দরবেশ ও মোল্লা নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান জালালুদ্দিনের সময় (১৪১৪-১৪৩০ খ্রি.) এই ধর্মান্তরিত করার অভিযান তুঙ্গে উঠেছিল।' তিনি আরও বলেন—

---

[৬৫] অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৫৯

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

https://nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানগণ যে আগন্তুক মুসলমান নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মুসলমান ইতিহাসকারগণ কেউই লিখে যাননি—কোনো কালে উত্তর-ভারত থেকে দলবদ্ধভাবে মুসলমানরা এসে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বরং আমরা জানতে পারি যে—বাংলাদেশে যে সকল পাঠান ও আফগান মুসলমান ছিল, তারা সম্রাট আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে উড়িষ্যায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মোগল যুগেও পূর্ব বাংলাকে অস্বাস্থ্যকর জায়গা বলে মনে করা হতো এবং যে সকল রাজকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, তারা দুই পয়সা কামাবার পর আবার দিল্লি কিংবা আগ্রায় ফিরে যেতেন। একমাত্র যেখানে কিছুসংখ্যক বিদেশি মুসলমান ছিল, সে জায়গাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম।[৬৭]

ড. অতুল সুর বলেন—

জোর-জুলুম করেই যে মুসলমান করা হতো, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হতো। এরা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকা দ্বারা আকৃষ্ট হতো। খানকাগুলো ছিল মসজিদ ও দরগা সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া-দাওয়া দুই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল দেশে দাসদাসীর ব্যবসা। অসময়ে দুস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে-মেয়ে বেচে দিত। যখন মুসলমানরা তাদের কিনতো, তখন তারা তাদের ধর্মান্তরিত করত। উচ্চশ্রেণির বর্ণ হিন্দুরা কমই ধর্মান্তরিত হতো। মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোনো জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন, তাহলে তাঁকে সপরিবারে মুসলমান করা হতো।...এককথায়, বাঙালি মুসলমান বাঙালি, তারা আগন্তুক নয়।[৬৮]

ড. এবনে গোলাম সামাদ বলেন, পালদের পরে আসেন সেন রাজারা (১০৯৫-১২০০ খ্রি.)। সেন রাজারা ছিলেন গৌড়া হিন্দু এবং তারা বাংলার লোক ছিলেন না। এরাই বাংলায় বর্ণাশ্রম (Caste System) চালু করে এবং এদের হাতে বৌদ্ধরা চরমভাবে নিগৃহীত হয়। তিনি বলেন—হিন্দুরা নন, বৌদ্ধরাই সম্ভবত দলে দলে গ্রহণ করেন ইসলাম। এই প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সারা ভারতের শতকরা ৩৬ ভাগ মুসলমানের বাস বাংলায়। প্রধানত

---

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৩

https://nagorikpathagar.org

বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতেই তাদের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কখনোই পুরোপুরি হিন্দু ছিল না। এই অঞ্চলে মুসলমান আগমনের আগে প্রচলিত ছিল একধরনের বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করতেন অশুচি। এই অপমানিত বৌদ্ধরাই পাঠান আমলে বিশেষভাবে সাড়া দেয় ইসলামের ডাকে।[৬৯]

তবে বাংলায় সংখ্যাধিক্য মুসলমানের অন্যতম কারণ বহিরাগত মুসলমান বলে মানেন জগদীশ নারায়ণ সরকার।[৭০] ড. এবনে গোলাম সামাদ মনে করেন, বাংলায় যেসব মুসলমান আসেন, তাদের মধ্যে মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা (পাঠান) অধিকসংখ্যক এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের লোক বেশি। তিনি বলেন, মুসলমান নৃপতিরা জোর করে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল— এই মতে আর স্থির থাকা যাচ্ছে না। কেননা, ১৮৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে ক্রমশই মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে। মুসলমান নৃপতিদের আমলে নয়, ইংরেজ শাসনামলে এ দেশে ঘটেছে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি। আর ইংরেজ আমলে জোর করে হিন্দুকে মুসলমান করার সুযোগ ছিল না। তাই বলা চলে না, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ হিন্দুদের বলপ্রয়োগ করে মুসলমান করা।[৭১]

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব এসেছে দুটি ভিন্ন দিক থেকে। স্থলপথে মধ্য এশিয়া থেকে আসে তুর্কিরা; আফগানিস্তান হয়ে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আরব মুসলমান বণিকরা এসেছেন দক্ষিণের সমুদ্রপথ ধরে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান এখন তুর্কিদেরই মতো হানাফি মাজহাবভুক্ত। ইসলামি আইনের যে ব্যাখ্যা তারা মানেন, তা ইমাম আবু হানাফি (রহ.) প্রদত্ত। কিন্তু দক্ষিণ আরবের লোক শাফেয়ি মাজহাবভুক্ত এবং ইন্দোনেশিয়াতেও শাফেয়ি ফিকাহ্ প্রচলিত। কেননা, ইন্দোনেশিয়াতে আরব বণিকরাই ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।[৭২]

বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, বাইরে থেকে অনেক মুসলমান এখানে এসে বসতি করেছিলেন। অন্যদিকে বহু স্থানীয় বাসিন্দাও গ্রহণ

---

[৬৯] এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম* (রাজশাহী, পরিলেখ, ২০১৯), পৃ. ২০

[৭০] Jagadish Narayar Sarker, *Islam in Bengal,* Culcutta.

[৭১] এবনে গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

https://nagorikpathagar.org

করেছিলেন ইসলাম। এ দুয়ে মিলেই গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাদেশের মুসলিম জনসমাজ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের একটি বড়ো কারণ হলো, বাইরে থেকে এই অঞ্চলে অনেক মুসলমানের আগমন ও বসতি স্থাপন। বাংলার উর্বর ভূমি ও বাণিজ্য সম্পদ তাদের আকৃষ্ট করেছিল। আর বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে প্রধানত তাদের অধিক প্রজনন হারের কারণে। কেবল বাংলাদেশ নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের জন্মহার অধিক। কেননা, মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ এবং উন্নতমানের আমিষ খাদ্য গ্রহণ এই উচ্চ জন্মহারের সহায়ক।[৭৩]

ড. রহিম বলেন, ১২২০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যে ৩,৩৭,০০০ সৈন্য বাংলায় এসেছিল, তাদের বংশধরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,৭২,৫০০-তে দাঁড়িয়েছিল। এই বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মুসলমানদের সন্তান উৎপাদনের অধিক ক্ষমতা।[৭৪] তবে এ মত মানতে নারাজ ড. আকবর আলী খান। তিনি তার বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নোক্ত সারণি তুলে ধরেন :

সারণি-০১

বাংলা ও ভারতে সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা (১৮৯১-১৯৪১)

সম্প্রদায়	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
ভারতের হিন্দু সংখ্যা মিলিয়নে	১৮৭.৮৪	২০৭.৫৬	২০৬.৮৬	২১৭.১৯	২১৬.২৪	২৩৮.৬৪	২৭০.১৮	০.৬০
পুরো জনসংখ্যা %	৭৫.০৯	৭৪.২৪	৭২.৮৭	৭১.৬৮	৭০.৭৩	৭০.৬৭	৬৯.৪৬	
বাংলার হিন্দু সংখ্যা মিলিয়নে	১৭.২৫	১৮.০৬	১৯.৮১	২০.৫৭	২০.৪১	২১.৭৯	২৫.৩১	০.৬৩
পুরো জনসংখ্যা %	৮.৪০	৪৭.২০	৪৭.০০	৪৫.২৩	৪৩.৭২	৪৩.৪৮	৪১.৯৮	
ভারতের মুসলমান সংখ্যা মিলিয়নে	৪৯.৯৫	৫৭.০৬	৬২.১১	৬৭.৮৩	৭১.০০	৭৯.৩০	৯৪.৪৪	১.০৬
পুরো জনসংখ্যা %	১৯.৯৭	২০.৪১	২১.৮৮	২২.৩৯	২৩.২৩	২৩.৪৯	২৪.২৮	

[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

[৭৪] আকবর আলী খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ৮২

https://nagorikpathagar.org

১৭.৮৬ ৫০.১৬	১৯.৫৮ ৫০.১৫	২১.৫৭ ৫১.১৯	২৩.৮১ ৫২.৩৪	২৫.০০ ৫৩.৫৫	২৭.২৮ ৫৪.৪৪	৩২.৭৪ ৫৪.৩০	১.০১
১২.৩৪ ৪.৯৪	১৪.৯৪ ৫.৩৫	১৪.৮৮ ৫.২৫	১৭.৯৭ ৫.৯৩	১৮.৪৭ ৬.০৪	১৯.৭৪ ৫.৮৪	২৪.৩৬ ৬.২৬	০.৭৮
০.৪৯ ১.৪৪	০.৬২ ১.৫৫	০.৭৬ ১.৮১	১.১০ ২.৪৩	১.২৭ ২.৭৩	১.০৪ ২.০৮	২.২৪ ৩.৭২	০.৭৩
২৫০.১৫	২৭৯.৫৭	২৮৩.৮৬	৩০৩.০০	৩০৫.৭২	৩৩৭.৬৭	৩৮৮.৯৯	০.৭৩
৩৫.৬০	৩৮.২৭	৪২.১৪	৪৫.৪৯	৪৬.৭০	৫০.১১	৬০.৩০	০.৭৮

ris Kingsley, The Population of India and Pakistan (New York: Rassel el,1968), p.179.

দেখা যাচ্ছে, ১৮৮১-১৯৪১ সালের পরিসরে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান বৃদ্ধির হার ছিল বাৎসরিক শতকরা ১.০৬ আর বাংলার মুসলমানদের হার ছিল শতকরা ১.০১। এই উপাত্ত ইঙ্গিত করে যে, দক্ষিণ এশিয়ার অংশে অভিবাসী মুসলমানদের সংখ্যা বাংলার চাইতে দ্রুত হারে এতৎসত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতার লমানরা অনুল্লেখ্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্যমান ছিল।[৭৫]

https://nagorikpathagar.org

ড. রহিম বলেন—'প্রাক-মুসলমান যুগে যদিও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের বিচ্ছিন্ন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলাম ধর্মে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধর্মান্তর ঘটেনি। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে, বাংলায় মুসলমান শাসকগণ সক্রিয়ভাবে ধর্মান্তরকে উৎসাহিত করেছিলেন।'[৭৬] তবে এই ধর্মান্তর প্রক্রিয়াতে তেমন জোরাজুরি ছিল না। আকবর আলী খান বলেন, পর্তুগিজ বণিক বারবুসার বিবরণের মাধ্যমে এ অনুকল্প সমর্থিত হয়। বারবুসা উল্লেখ করেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা ও গভর্নরদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য বাংলার হিন্দুরা মুসলমান হয়েছে। আবার বেভারলি উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান জালাল উদ্দিনের শাসনামলে তার অত্যাচারে হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

ড. আকবর আলী খান বলেন—নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাংলায় মুসলমানগণ ইসলামের প্রসারকে সহজ করেছে। অনুকল্প গড়ে তোলা হয়েছে যে, ইসলামের প্রসারে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যার তুলনামূলক হার সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, এ অনুমান সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি বলেন, দিল্লি অঞ্চলে মুসলমানরা নগণ্য ও সংখ্যালঘু; অথচ মুসলমানরা ৬০০ বছরেরও অধিক কাল এ অঞ্চল শাসন করেছে। তাতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বাংলায়ও মুসলমান শক্তির অধিষ্ঠানস্থল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল অধিক। মুসলমান শাসকদের রাজধানী এলাকা মালদহ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান জনসংখ্যার চাইতে দূরবর্তী জেলা বগুড়া, নোয়াখালী জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারণি-০২

বাংলায় জেলাওয়ারি বিভিন্ন ধর্মানুসারী জনসংখ্যা-১৮৮১ (আংশিক)

অঞ্চল/জেলা	মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান (%)	মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু (%)	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (%)
হুগলি	১৯.৪	৮০.৫	৪.৭
চব্বিশ পরগনা	৩৭.৩	৬২.০	০.৭

[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

https://nagorikpathagar.org

মুর্শিদাবাদ	৪৮.১	৫১.৭	০.২
যশোহর	৬০.৩	৩৯.৬	০.১
রাজশাহী	৭৮.৪	২১.৫	০.১
দিনাজপুর	৫২.৫	৪৭.৩	০.২
রংপুর	৬০.৯	৩৮.৯	০.২
বগুড়া	৮০.৮	১৯.১	০
পাবনা	৭২.৪	২৭.৫	০.৪
মালদহ	৪৬.৩	৫৩.৩	০.৪
ঢাকা	৫৯.১	৪০.৪	০.৫
ময়মনসিংহ	৬৬.৮	৩২.৩	০.৯
ফরিদপুর	৫৯.৭	৪০.১	০.২
বাখেরগঞ্জ	৬৬.৬	৩২.৮	০.৬
ত্রিপুরা	৬৬.৩	৩৩.৬	০.১
নোয়াখালী	৭৪.১	২৫.৭	০.২
চট্টগ্রাম	৭০.৮	২৪.৩	৪.৯
খুলনা	৫১.৪	৪৮.৪	০.২

সূত্র : Census of India, 1931, Vol-V, Part-1, p. 411. উৎস : আকবর আলী খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, বাংলা একাডেমী।

বাংলায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান শাসকদের নিপীড়নমূলক ক্ষমতা দুই কারণে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত, বাংলার মুসলমান শাসকদের অনেকেই দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য তাদের স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন আদায় করতে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সুলতান ইলিয়াস শাহকে (১৩৩৯-১৩৫৮ খ্রি.) তার সেনাদলে হিন্দু সৈন্য নিযুক্ত করতে হয়েছিল। একজন হিন্দু সেনাপতিকেও তিনি সৈন্যদলে নিযুক্ত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় একজন হিন্দু সভাসদ গণেশ (কানস) মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে সফল অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

এ থেকে বোঝা যায়, হিন্দু বেসামরিক আমলা ও সামরিক নেতৃবৃন্দ মুসলমান বাংলায় অব্যাহতভাবে ক্ষমতাবান ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বাংলায় মুসলমান শাসনামলে হিন্দুরা স্থানীয় প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্ষমতা প্রয়োগ করত। মুসলমান শাসনের ৩০০ বছর পরেও যশোরের প্রতাপাদিত্য, বরিশালের কন্দর্প নারায়ণ, নোয়াখালীর লক্ষ্মণ মাণিক্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পাবনার মধু রায়, মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় এবং বরিশালের রামচন্দ্রের মতো শক্তিধর হিন্দু জমিদাররা গ্রামবাংলার ওপর কর্তৃত্ব করত।[৭৭]

রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দু মুসলমানদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বাংলার মুসলমান শাসকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। সে কারণে মুসলমান শাসকরা সচেতনভাবে হিন্দুদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করত এবং পৃষ্ঠপোষকতা করত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত গীতার অনুবাদ হয়েছে। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বৃহস্পতি প্রমুখ পণ্ডিতগণ মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। আর মোগল শাসনামলে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে প্রশাসকরা ছিলেন পুরোপুরি উদাসীন।

সত্যিকার অর্থে বাংলায় মুসলমান শাসনের ফলে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই লাভবান হয়েছে বেশি। মুসলমান শাসিত বাংলায় রাজনৈতিক ও সামরিক পদসমূহে পশ্চিম এশীয় অভিবাসীদের একাধিপত্য ছিল, অন্যদিকে রাজস্ব কাঠামোর পদসমূহ অধিকার করেছিল হিন্দুরা; বিশেষত কায়স্থরা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ছিল নিম্নবৃত্তিধারী। এরাই আবার হিন্দু রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী দ্বারা শোষিত হয়েছিল। তাই মধ্যযুগের বাংলায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর সাধারণ মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো অর্থনৈতিক লাভ বয়ে আনেনি। ড. আকবর আলী খান বলেন, বাংলার স্থানীয় ব্রাহ্মণরা প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা : শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ব্রাহ্মণ। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা বর্ণ ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য মনে করত এবং তাদের হাতের জল স্পর্শ করত না। বাংলায় অনেক ব্রাহ্মণ নিজেরাই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতো নিপীড়িত ছিল। ফলে এটি মেনে নেওয়া কঠিন যে, বাংলায় ব্রাহ্মণদের অত্যাচার নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম ধর্মের দিকে ঠেলে দেয়।[৭৮]

নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রসঙ্গে ড. আকবর আলী খান বলেন—'ব্রাহ্মণদের অত্যাচার কোনোক্রমেই বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য নয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রবাদে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণরা উপমহাদেশের সর্বত্রই সমভাবে ঘৃণিত।

---

[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৭

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৯

https://nagorikpathagar.org

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা দেখতে সাধু কিন্তু অন্তরে কসাই। ইস দুনিয়া মে তিন কসাই—পিশু, খাটমল, ব্রাহ্মণ ভাই (এই দুনিয়ায় আছে তিন কসাই—মশা, ছারপোকা আর ব্রাহ্মণ ভাই)! বাস্তবে বাংলাকে জঘন্যতম ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে এ অত্যাচার ছিল আরও তীব্র। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারের বিপরীতে ইসলামি সাম্যবাদ যদি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের প্রধান কারণ হতো, তাহলে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে ইসলামের প্রসার অধিকতর লক্ষণীয় হতো।[৭৯] আবার বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরেরও প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অবশ্য হিন্দুদের দ্বারা বৌদ্ধদের অত্যাচারের পরোক্ষ প্রমাণ মেলে।

তিনি বলেন, বাংলায় কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর ইসলাম গ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ধর্মান্তর যে কোনোক্রমেই বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ হতে পারে না, সে সম্পর্কে তিনটি যুক্তি তুলে ধরা যায়। প্রথমত, মুসলমান বিজয়ের সময় বৌদ্ধরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এটাও ঠিক না। পরিশেষে বলা যায়, হিন্দু-বৌদ্ধদের বিরোধকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে; বরং হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার বহু উদাহরণ রয়েছে। বাংলায় বৌদ্ধদের দলে দলে ধর্মান্তরের তত্ত্ব সত্য বলে মনে হয় না।

একটি অনুকল্পে প্রস্তাব করা হয় যে, সুফি-দরবেশদের ধর্ম প্রচারের ঐকান্তিক উদ্যোগ বাংলার মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ। তিনি বলেন, মুসলমান পীরদের ধর্ম প্রচারের কাজ নিবিড়ভাবে চলে প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী—ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। আবার তিনিই অন্যত্র বলেন, সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, পীরদের দ্বারা বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এ কথা প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, বাংলায় গণ ধর্মান্তরের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বাংলায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর ঘটেছে ক্রমাগতভাবে এবং অন্ততপক্ষে ৪০০ বছরের পরিসরে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের প্রসার বিষয়ে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণাও বাংলায় ধীরে ধীরে ইসলাম প্রসারের অনুকল্প সমর্থন করে। এক হিসাবমতে দেখা যায়, মুসলমান শাসনের প্রথম শতাব্দীতে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, তিউনিশিয়া ও স্পেনের শতকরা দশ ভাগেরও কম মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আরবের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অধিকাংশ স্থানীয় মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে ৪০০ বছরের মতো সময় লেগেছিল।[৮০]

---

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৯

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়ামক শক্তি

বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিহাসের একটি বড়ো প্রহেলিকা। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত এক বিরাট অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডজুড়ে মুসলিম দেশগুলো অবস্থিত। পাকিস্তানের বাইরে ভারতের যেসব অঞ্চল রয়েছে, তার সর্বত্রই হিন্দুদের প্রাধান্য। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, সে তথ্য ১৮৭২ সালের আদমশুমারির হিসেবে প্রথম জানা যায়। তখন থেকেই এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেই বিতর্কের সমাধান ইতিহাসে পাওয়া যায়নি।

তবে বেশির ভাগ দেশে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ইসলাম ধর্মের সাফল্যের জন্য মুসলমান শাসকদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। তাঁদের বর্ণনা অনুসারে, সকল মুসলমান শাসকই ইসলামি ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার, প্রসার, স্থায়িত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য অবশ্যই রাজশক্তি অনুঘটকের ভূমিকায় ছিল। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি, হজরত শাহ মখদুম (রহ.) রামপুর বোয়ালিয়া ছেড়ে যাওয়ার পরপরই দেওবংশীয় রাজারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়েছে। এভাবে প্রতিটি জায়গায় স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তি বড়ো নিয়ামক হয়ে থাকে। কখনো কোনো জায়গায় শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন না। তিনি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র তৈরি এবং প্রচারকদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

কোনো ভূখণ্ডে কখনোই রাষ্ট্রীয় শক্তি ছাড়া সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব নয়। এটাও পরোক্ষভাবে ধর্ম প্রচারে সহায়তা দানেরই অংশমাত্র। কোনো রাজ্যে জ্ঞান বিতরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে। এর পূর্ণ তত্ত্বাবধানে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা নগণ্য, তবুও পূর্ণ কৃতিত্ব পরিশেষে রাজপ্রধানই পেয়ে থাকেন। কেননা, রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই রাজ্যে ইসলাম প্রচারে মুবাল্লিগগণ নিয়োজিত থাকলেও কৃতিত্বটা রাজ প্রশাসকের ওপর গিয়ে

https://nagorikpathagar.org

বর্তায়; একইভাবে উলটো ফলাফলের দায়ভারও গিয়ে বর্তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ওপর। তাই বাংলায় ইসলাম প্রচারের কৃতিত্বও অনেকাংশে বাংলার মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর।

আফগানিস্তানের গরমশির গ্রামের খলজি গোত্রের মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি। ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি হিসেবে পরিচিত। তিনিই বঙ্গ বিজেতা মুসলিম বীর। ভাগ্যান্বেষী এই তুর্কি বীর গজনির শাসক মুহাম্মাদ ঘুরির দরবারে চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে চলে আসেন তৎকালীন দিল্লির প্রশাসক কুতুব উদ্দিন আইবেকের দরবারে। এখানেও প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি চলে আসেন বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিনের কাছে। এখানে তিনি মাসিক বেতনে সৈনিকের চাকরি লাভ করেন।

এর কিছুকাল পর বদাউন ত্যাগ করে চলে যান অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসাম উদ্দিনের দরবারে। মালিক হুসাম উদ্দিন তাকে ভাগাওয়াত ও ভিউলি নামে দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করেন। এই দুটি জায়গিরকে বখতিয়ার খলজি স্বীয় শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করেন এবং এখানেই একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তার বাহিনীতে চারিদিক থেকে ভাগ্যান্বেষণকারী মুসলমান, বিশেষ করে তার গোত্রের লোকেরা এসে যোগদান করে। তিনি তাদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন এবং সেখান থেকেই স্বীয় এলাকার সীমানা বর্ধিত করেন। প্রথমেই দখল করেন বিহার। বিহার দখলের পর তিনি কুতুব উদ্দিন আইবেকের সাথে সাক্ষাৎ করতে দিল্লি গমন করেন। দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তন করে বখতিয়ার খলজি আরও সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পরের বছর নদীয়া আক্রমণ করেন। আবদুল করিম বলেন—'তিনি এতই ক্ষিপ্রতার সহিত নদীয়া আসিয়া পৌছান যে, তাঁহার সঙ্গে মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী ছিল এবং তাঁহার মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল।'[৮১]

তিনি সোজা গিয়ে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা করেন। ইতোমধ্যে শহরের অভ্যন্তরে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। মধ্যাহ্নভোজে লিপ্ত রাজা লক্ষ্মণ সেন নগ্নপদে পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। প্রায় বিনা যুদ্ধে নদীয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ বাহিনী বখতিয়ার খলজির সাথে মিলিত হয়; তিনি তিন দিন ধরে নদীয়ার ধনসম্পত্তি হস্তগত করেন। অতঃপর বখতিয়ার খলজি নদীয়া ত্যাগ করে লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন।[৮২]

ড. গোলাম মুর্শিদ বলেন—'এই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ লক্ষ্মণাবতীতে এসে লোকদের কাছ থেকে মৌখিক তথ্য

[৮১] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), ৮০-৮২

[৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

https://nagorikpathagar.org

সংগ্রহ করে যে ইতিহাস লেখেন, তা থেকে জানা যায় বখতিয়ার প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গৌড় আক্রমণ করেছিলেন।'

লক্ষণাবতী বা লখনৌতি বিজয়ের প্রায় দুই বছর পর বখতিয়ার খলজি তিব্বত অভিযানে বের হন। লখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে কোচ, মেচ ও থারু নামে তিনটি জাতির লোক বাস করত। মেচ উপজাতির এক সর্দার বখতিয়ার খলজির সংস্পর্শে আসেন এবং আলি মেচ নাম ধারণ করেন। আলি মেচ তিব্বত অভিযানের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। তিব্বত অভিযানের পূর্বে বখতিয়ার খলজি তার অন্যতম সেনাপতি মুহাম্মাদ শিরান খলজি ও তার ভ্রাতা আহমদ শিরান খলজিকে লখনৌর অভিযানে প্রেরণ করেন।[৮৩]

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বখতিয়ার খলজি দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন।[৮৪] বখতিয়ার খলজির তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হয় এবং তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযানে বখতিয়ার খলজিকে বহুসংখ্যক সৈন্য হারাতে হয়েছিল। বখতিয়ারের সঙ্গে ছিল ১০ হাজার সৈন্য, উপরন্তু মুহাম্মাদ শিরান খলজি এবং আহমদ শিরান খলজির অধীনে আরও অনেক সৈন্য ছিল। কোনো ঐতিহাসিক সূত্র না থাকলেও এটা সহজেই অনুমেয় যে, নতুন বিজিত অঞ্চলে কত দ্রুততার সাথে এবং কত ব্যাপকভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

তিব্বত বিজয়ের মাত্র কয়েক দিন পূর্বেও বখতিয়ার খলজির ছিল মাত্র কয়েক শ সৈন্য। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দশ সহস্রাধিক সৈন্যের মালিক হয়ে যান। এ সবকিছুই ঘটেছে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। একেবারে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই এ রকমটা হয়ে আসছে। কোনো অঞ্চল বিজিত হওয়ার সাথে সাথে সৈনিকের চাকরি, প্রশাসনের চাকরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য অতি দ্রুততার সাথে অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হতো। আবার নতুন প্রশাসন চালানোর জন্য পূর্বতনদের মধ্য থেকেই প্রশাসনে নিয়োগ করা হতো; তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করত।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন—'মেচ জাতির একজন সর্দার একবার বখতিয়ারের হাতে পড়িয়াছিল। বখতিয়ার তাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আলি নাম রাখিয়াছিল।'[৮৫] তা ছাড়া তার মতে, বহু হিন্দুকে জোর করে মুসলমানও করা

---

[৮৩] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৭

[৮৪] শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ) (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ২১

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

https://nagorikpathagar.org

হয়েছিল—আমরা পূর্বে তা উল্লেখ করেছি। আবার অপরাপর ঐতিহাসিকদের মতে, আলি মেচ বখতিয়ারের সংস্পর্শে এসে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিল। জোর করেই হোক আর সংস্পর্শে এসেই হোক, এখানে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া ঘটেছিল এটা ঠিক। ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ না থাকলেও এটা বলা যাবে না যে, শুধুই আলি মেচ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সংখ্যাটা আরও ব্যাপক ছিল। একটা বর্ণনা এমন—'বখতিয়ার অশ্বারোহীদের লইয়া কোনো ক্রমে নদীর ওপারে পৌঁছিয়া আলি মেচের আত্মীয়স্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি অতি কষ্টে দেবকোটে পৌঁছলেন।'[৮৬] নিশ্চয়ই আলি মেচের আত্মীয়স্বজন স্বধর্মত্যাগী আলি মেচ এবং তাদের ধর্মশত্রু বখতিয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন না।

বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলায় মুসলমান রাজ্যের সঠিক সীমা সামসময়িক সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বখতিয়ারের রাজ পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৮৭] তিনি তাঁর বিজিত অঞ্চলে অনেক মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা তৈরি করেছিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রাও জারি করেছিলেন।[৮৮]

নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপনের পর অভিবাসী স্রোত আরও বেগবান হয়েছিল। এসব অভিবাসীদের প্রায় সকলেই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী যুবক, যারা সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণের আশায় ঘর ছেড়েছিলেন। বখতিয়ার অতি অল্প সময়ের মধ্যে দশ সহস্র সৈন্যের সেনাপতি হয়েছিলেন। এ ঘটনা দ্রুত অভিবাসনকেই স্বীকৃতি প্রদান করে। এ সকল যুবক সেনা জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য যে মধ্য এশিয়ায় বারবার যেত এমন নয়; তারা এ অঞ্চলের মেয়েদের বিবাহ করেছিল এবং অবশ্যই তা ধর্মান্তরিত করেই করেছিল। এভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ে অভিবাসন, ধর্মান্তরকরণ ও বিয়েশাদির মাধ্যমে সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং তা ৫০০ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। ডক্টর এম. এ. রহিম বলেন—'বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত এই উভয় প্রকার মুসলমানদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। বহিরাগত মুসলমানগণ প্রধানত তুর্কি, আফগান, মোগল, ইরানি ও আরব ছিল। অবশ্য কিছুসংখ্যক উসমানীয় তুর্কি, হাবশি এবং অন্যান্য বিদেশি মুসলমানও ছিল।'[৮৯]

---

[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৮৭] ড. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[৮৯] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৩১

https://nagorikpathagar.org

তিনি বলেন, বখতিয়ার খলজির বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় আগমনের পথ বহিরাগত মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে ওঠায় বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ এ দেশে শাসনকর্তা, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষণকারীরূপে আগমন করেন। এই মুসলিম বহিরাগতদের সঙ্গে আরব মুসলমানগণও আগমন করেন। এই আরব বহিরাগতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সুফি ধর্মপ্রচারক ও বণিক সম্প্রদায়। নতুন অধিকৃত প্রদেশে ধর্ম প্রচারকারী ও ইসলাম শিক্ষাদাতা কয়েক শ সাধু পুরুষের প্রত্যেকেই শিষ্য ও অনুচরসহ এ দেশে আগমন করেন। শাহজালাল ৩৬০ জন শিষ্যসহ আগমন করেন এবং তারা সকলেই বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। ড. রহিম আরও বলেন—

> জানা যায় যে, বাংলা জয়ের পর তিনি তাঁর (বখতিয়ার) তিব্বত অভিযানে ১০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন এবং একই সময়ে নতুন অধিকৃত প্রদেশের নিরাপত্তা এবং তার সেনাপতিদের দ্বারা জাজনগর প্রভৃতি স্থান বিজয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই খলজি তুর্কিদের অনেকেই স্ত্রী-পরিজনসহ বাংলায় এসেছিলেন। এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা যুক্তিযুক্ত যে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ২৫ বছরে অন্ততপক্ষে ৪০ হাজার খলজি তাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তানসহ বাংলাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৯০]

বারথেমা ও বারবোসা, সিজার ফ্রেডারিক, র‍্যালফ ফিচ ও পর্তুগিজদের বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, বাংলার উপকূলীয় সমুদ্রবন্দরসমূহে এবং সোনারগাঁও ও গুহলিতে বসবাসকারী একটি প্রতিপত্তিশালী মুসলমান বণিক সম্প্রদায় ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল আরব দেশীয়। পর্তুগিজ পরিব্রাজক করবোসা বলেন—'ধনী মুসলমানদের প্রত্যেকের তিন বা চারজন স্ত্রী ছিল।' কবি বিপ্রদাস বলেন—'হাসান হাটিতে প্রত্যেক মুসলমান ঘনঘন বিয়ে করে এবং সুখে বসবাস করে।' মুসলমান বিজয়ের শুরু থেকেই বহু ইরানি রাজকর্মচারী বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। মিনহাজের মতে, বখতিয়ার খলজির সময়ে ইস্পাহানের বাবা কোতোয়ান ছিলেন লখনৌতির নগর কোতোয়ান। ড. রহিম বলেন—'মোঙ্গলদের পারস্য আক্রমণের ফলে বহু পারস্যবাসী হিন্দুস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের কিছুসংখ্যক বাংলাদেশে আগমন করে।' মিনহাজ লিখেছেন—'আলা উদ্দিন আলি মর্দান খলজির সময়ে লক্ষ্মণাবতীর একজন ইস্পাহানি ব্যবসায়ী তার সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেন। বিপন্ন অবস্থায় এই ব্যবসায়ী বাংলার খলজি শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।'

---

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

https://nagorikpathagar.org

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তার অন্যতম সেনাপতি মুহাম্মাদ শিরান খলজি দেবকোট ফিরে আসেন এবং লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ শাসন শুরু করেন এবং আমিরদের স্বপদে বহাল রেখে খলজি মালিকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত আলি মর্দান খলজিকে তিনি বন্দি করেন। তবে আলি মর্দান দিল্লি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দিনকে বাংলা আক্রমণে প্ররোচিত করেন।

কুতুব উদ্দিন অযোধ্যার গভর্নর কায়েমাজ রুমিকে লখনৌতি আক্রমণ করে খলজি আমিরদের বিরোধ মীমাংসা করতে এবং প্রত্যেক আমিরকে স্ব-স্ব ইফতায় বহাল করতে আদেশ দেন। কায়েমাজ রুমি দেবকোট উপস্থিত হলে মুহাম্মাদ শিরান খলজি (১২০৭-১২০৮) দেবকোট ছেড়ে পালিয়ে যান এবং হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক আলি মর্দান খলজিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলি মর্দান খলজি লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করার লক্ষ্যে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ লখনৌতির দিকে যাত্রা করেন। বখতিয়ার খলজির পরে এই সময়েই বাংলাদেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিকসংখ্যক বহিরাগত মুসলমান আগমন করেন।[৯১] আলি মর্দান খলজির অনুকূলে ইওজ খলজি ক্ষমতা ছেড়ে দেন। মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনামতে, আলি মর্দান খলজির হয়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দু রায়েরা রীতিমতো খাজনা পাঠাতে লাগে। এটা প্রমাণ করে, এ সময় আলি মর্দান খলজি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন; আর এ শক্তির উৎস যে অধিক সৈন্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ড. রহিম যথার্থই বলেছেন, খলজি শাসনামলে অন্ততপক্ষে ৪০ হাজার খলজি তাদের স্ত্রী-পুত্রসহ বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম সুলতান ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি 'সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ-খলজি' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগানিস্তানের গরমশিরের এই অভিবাসী মুসলিম তার স্ত্রীকে সঙ্গে করেই বাংলা মুলুকে এসেছিলেন এবং স্বগোত্রীয় মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া আমাদের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদেরই অভিবাসন প্রক্রিয়ার অনুরূপ। সিরিয়াসহ অপরাপর অঞ্চল বিজিত হলে মুসলমানগণ এমনিভাবেই বিজিত অঞ্চলে ছুটে যেতেন। ইওজ খলজি দিল্লির আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং নৌবাহিনীও গঠন করেন।

---

[৯১] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

https://nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, এসব যুদ্ধ নৌযান পরিচালনার জন্য তিনি বাঙালিদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। বাঁধ নির্মাণ করে প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন। মিনহাজের মতে, পার্শ্ববর্তী কামরূপ, উড়িষ্যা, পূর্ব বাংলা ও ত্রিহুতের রাজারা তাঁর নিকট কর পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকেই স্বীয় রাজ বিস্তার করেন। প্রজাবৎসল নৃপতি ইওজ খলজি আলিম, সৈয়দ ও সুফিদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তাদের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তি ও জায়গিরের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৯২] মোঙ্গলদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখে টিকতে না পেরে মধ্য এশিয়ার অনেক মুসলিম পণ্ডিত ও সুফি বাংলাদেশে আগমন করেন। ইওজ খলজি তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। বীরভূম জেলার বোলপুরে প্রাপ্ত শিলালিপি (বাংলার মুসলমান শাসকদের প্রথম শিলালিপি) প্রমাণ করে, মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগে মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে অনেক মুসলমান বাংলাদেশে আগমন করেন।[৯৩]

১২২৭ খ্রি. দিল্লির সুলতান শামস্ উদ্দিন ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ ইওজ খলজিকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলাদেশকে দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করেন। এরপর ১২২৭ থেকে ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মোট ১৫ জন শাসনকর্তা বাংলার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই সময়কালের অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বরণী বলেন— 'বাংলাদেশ স্বভাবতই বিদ্রোহী প্রদেশরূপে গণ্য করা হতো এবং দিল্লির লোকেরা বাংলাকে বলগাকপুর (বিদ্রোহের নগরী) নাম দিয়েছিল। দূরবর্তী প্রদেশ হওয়ার কারণে বাংলা দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন আমিন খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তার সহকারী হিসেবে তুঘরল খানকে প্রেরণ করেন। লখনৌতিতে এসে তুঘরল খানই সর্বেসর্বা হয়ে যান। তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং প্রচুর পরিমাণ ধনসম্পদ হস্তগত করেন। তিনি আমিন খানকে পরাজিত করে সুলতান মুগিস উদ্দিন নাম ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুতবা পাঠ করান। তার দরবারের জাঁকজমক দিল্লির দরবারকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করেছিলেন। এই তুঘরলের বিরুদ্ধে বলবন দুবার অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হন। কেননা, তুঘরল দিল্লির বাহিনীকে পরাজিত করার শক্তি অর্জন করেছিলেন।[৯৪]

---

[৯২] মিনহাজ-ই-সিরাজ : *তবকাত-ই-নাসিরি*, অনু. আ. কাম, যাকারিয়া (ঢাকা : ১৯৮৩), পৃ. ৭৩

[৯৩] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

[৯৪] শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

https://nagorikpathagar.org

ড. কানুনগোর অভিমত এই যে, গিয়াস উদ্দিন বলবন শুধু একজন বিদ্রোহী তুঘরলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেনি; সারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক ড. রহিম এই মতকে যথার্থ বলে মন্তব্য করেছেন।[৯৫] শেষ পর্যন্ত সুলতান বলবন প্রচুর সৈন্য এবং বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। বলবনের এই যুদ্ধাভিযান প্রমাণ করে, বাংলার মুসলিম সালতানাত এ সময় কতটা শক্তিশালী হয়েছিল। ড. রহিম বলেন—'বলবনের বিজয়োত্তরকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার মুসলিম রাজ দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করেছিল। এ সময় বাংলার ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ বাংলাদেশব্যাপী বিরাট মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়।'[৯৬] শেষ পর্যন্ত বলবনই তুঘরলকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ১২৮২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮২৮ সাল থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এখানকার শাসকেরা দিল্লির সাথে লখনৌতির বন্ধন ছিন্ন করে এবং দিল্লির প্রবল পরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো 'সিকান্দার সানি' উপাধি নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে দিল্লির বলবনি শাসকদের হটিয়ে খলজিগণ শাসনক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু বাংলার বলবনি শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল এবং দিল্লির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। উল্লেখ্য যে, আলাউদ্দিন খলজি দক্ষিণাত্যসহ সারা ভারত উপমহাদেশ দখল করলেও বাংলাদেশ জয় করতে সক্ষম হননি। সুলতান রুকনদ্দিন কায়কাউসের পরে সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২) সময় একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসে।[৯৭]

বলবন-পুত্র বুঘরা খানের নিজেরই বেশ কিছু সৈন্য ছিল এবং তার পিতা তাকে বাংলায় আধিপত্য বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যদল প্রদান করেছিলেন। তা ছাড়া দিল্লিতে বলবনি শাসনের পতন ঘটলে বাংলার বলবনি রাজ্যে আশ্রয় ও চাকরির জন্য তুর্কিদের আগমন ঘটেছিল। তাদের সহায়তায় মূলত বাংলাতে তারা স্বাধীনভাবে রাজশাসন করেছিল। দিল্লির তুঘলক শাসকদের সময়েও একদল করোনা তুর্কি তাদের শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের সঙ্গে বাংলায় আগমন করে। ড. রহিম বলেন, সুলতান বলবনের পুত্র নাসির উদ্দিন বুঘরা খানের সময়ে নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিসহ ১৫,০০০ ইলবারি

---

[৯৫] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

https://nagorikpathagar.org

তুর্কি বাংলাকে তাদের স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে। অন্তত ৫০০০ করোনা তুর্কি একইভাবে দিল্লির তুঘলক সুলতানদের সময়ে বাংলায় আগমন করেন।

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা পুরোপুরি ২০০ বছর অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। এই সময়কালে বাংলার শাসকেরা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হয়ে ওঠেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁওকে তার রাজধানী করেন এবং গোলাম মুখলিসকে লখনৌতির প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি সোনারগাঁও, সাতগাঁও, লখনৌতি ও চট্টগ্রাম দখল করেন। বলা হয়ে থাকে, তিনিই প্রথম চট্টগ্রামে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ফকির-দরবেশকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং কায়দা নামক একজন ফকিরকে সোদকাওয়ান (সম্ভবত সাতগাঁও)-এর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।[৯৮] এ সময় বাংলায় আগমনকারী বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা লেখেন—

> বাংলাদেশে সুফি-সাধক ও ফকিরদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ফকির-দরবেশকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। নৌকায় যাতায়াত করলে ফকিরদের পয়সা খরচ হতো না। যাদের খাবার ও বাসস্থানের সংস্থান থাকত না, তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। ফকিরেরা কোনো শহরে প্রবেশ করলে তাদের অর্থ প্রদান করা হতো।[৯৯]

ইবনে বতুতা থেকে জানা যায়, তিনি মুহাম্মাদ আল মাশহাদি নামক এক মরক্কোবাসীর নিকট জানতে পেরেছেন যে, তিনি স্ত্রী এবং একজন ভৃত্যসহ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় এক বছরের খাদ্যদ্রব্য মাত্র সাত টাকায় ক্রয় করতেন।[১০০] এ ঘটনা যেমন বাংলার সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করে, তেমনই প্রমাণ করে বাংলায় কী বিপুল পরিমাণ অভিবাসন ঘটেছিল। সুদূর মরক্কো থেকেও এখানে এসে মুসলমানগণ বসতি স্থাপন করেছিল। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের পর ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ (১৩৪৯-১৩৫২) বাংলার শাসনকর্তা হন। এ সময় আলাউদ্দিন আলি শাহ লখনৌতিতে (১৩৪১-৪২) আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং তিনি গৌড় বা লখনৌতি থেকে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় (ফিরোজবাদ) স্থানান্তরিত করেছিলেন। এখানে তিনি 'শাহ জালালের দরগা' নির্মাণ করেছিলেন।

---

[৯৮] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[১০০] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

https://nagorikpathagar.org

আলি শাহকে অপসারিত করে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস ফিরোজবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁওয়ে স্বাধীন সুলতানির সূচনা করলেও ইলিয়াস শাহই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশকে একত্রিত করে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেন।[১০১] 'শাহ-ই-বাঙালা' বা 'সুলতান-ই-বাঙালা' উপাধিতে ভূষিত এই সুলতান সমগ্র বাংলায় তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নেপালেও অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। তিনি কামরূপের কিছু অংশ দখল করেছিলেন এবং ত্রিহুত ও উড়িষ্যাতেও সফল অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় শাইখ আখি সিরাজ উদ্দিন, তার শিষ্য আলাউল হক ও শাইখ রাজা বিয়াবানি নামক তিনজন বিশিষ্ট সুফি তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। শাইখ আলাউল হকের সম্মানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দিল্লির সুলতান কর্তৃক একডালা দুর্গে অবরুদ্ধকালীনও তিনি ছদ্মবেশে শাইখ বিয়াবানির জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১০২]

বাংলার এই শ্রেষ্ঠ নৃপতির মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯১) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেও তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তার শাসনকালের তিনটি শিলালিপি এবং কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি মুসলমান সুফি সাধকদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ১৩৬৩ সালে তিনি দিনাজপুর জেলার দেবকোটে মোল্লা আতার দরগায় মসজিদ নির্মাণ করেন। বিহারের মনের অঞ্চলে বসবাসকারী সুফি শাইখ শরফ উদ্দিন ইয়াহিয়া মনেরির সাথে তার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ও পত্রালাপ ছিল। বাংলায় সবচেয়ে বেশি দিন (৩৫ বছর) রাজত্ব পরিচালনাকারী এই সুলতান পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার সময়ে পুরো বাংলায় মুসলিম আধিপত্য কায়েম ছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার *রিয়াজ উস-সালাতিন*-এর বিবরণ দিয়ে লেখেন, সিকন্দার শাহের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ১৭টি পুত্র এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে মাত্র একটি পুত্রসন্তান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১০৩] সিকান্দর শাহ-পরবর্তী শাসক গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ সম্পর্কে ড. রহিম বলেন, তার মতো আকর্ষণীয় চরিত্র আর কারও ছিল না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্যা ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা, সুফি সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে

---

[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[১০২] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

[১০৩] শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

https://nagorikpathagar.org

মাদরাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার সময়ের সুফি শাইখ আলাউল হকের পুত্র নুর কুতুব-ই-আলমের সাথে তার হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। কুতুব-ই-আলমের ভাই আজম খান সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন। বিহারে অবস্থানকারী সুফি মুজাফফর শামস বলখিকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন।[১০৪]

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ কামতা ও কামরূপ রাজ্যের কিয়দাংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। বুকাননের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তিনি সাহেব খাঁ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘকাল লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। দরবেশ নুর কুতুব-ই-আলম গিয়াস উদ্দিন ও সাহেব খাঁর মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।[১০৫] ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতানেরা যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনকার্যের ব্যাপারে হিন্দুদের সাহায্য নিতেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের একডালা রণক্ষেত্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু সহদেব। অনুমান করতে পারি, সিকান্দার শাহের রাজত্বকালেও হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাস পায়নি। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে হিন্দুরা বহু উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিল। শাইখ মুজাফফর বলখি কর্তৃক সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সূত্র ধরে সুখময় মুখোপাধ্যায় লেখেন—

> এ চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরগতপ্রাণ, সর্বত্যাগী, পণ্ডিতাগ্র গণ্য দরবেশ মুজাফফর শামস্ বলখি বিধর্মীদের ওপর একেবারে সদয় ছিলেন। কেননা, মুসলমান সুলতানেরা যে হিন্দুপ্রেমের বশবর্তী হয়ে হিন্দুদের উচ্চরাজপদে নিয়োগ করতেন, তা নয়; সমস্ত পদের জন্য যোগ্য মুসলমান পাওয়া যেত না বলেই তাঁরা হিন্দুদের অনেক পদে নিয়োগ করতে বাধ্য হতেন। এই সব পদ থেকে হিন্দুদের অপসারণ করার অর্থ দেশের শক্তি ও শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করা। উপরন্তু হিন্দুদের এই সব পদ থেকে বরখাস্ত করলে তাদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হতো। তাদের রাখলে যে গোলযোগ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে বলে বলখি বলছেন, তাদের সরালে তারচেয়ে বেশি গোলযোগ ও বিদ্রোহের সম্ভবনা দেখা দিত।[১০৬]

আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শ্রদ্ধেয় শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। তিনি উল্লেখ করেছেন, একডালা রণক্ষেত্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু সহদেব। তার মনে হচ্ছে, এ পদের জন্য যোগ্য কোনো প্রার্থী ছিল না। এ কথা কোনোক্রমেই সত্য হতে পারে না। তবে ঐতিহাসিক শ্রী সুখময়

---

[১০৪] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[১০৫] শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

https://nagorikpathagar.org

মুখোপাধ্যায়ের পরের কথাগুলো যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, মুসলিম বিজয়ের দুই শতাধিক বছর পরেও বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিক্য ছিল। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ও তাঁর পুত্র সাইফ উদ্দিন হামজা শাহের দরবারে আগমনকারী চৈনিক দূত দলের দোভাষী মা-হুয়ান লেখেন, বাংলার রাজার প্রাসাদ এবং ছোটো-বড়ো সমস্ত অমাত্যের প্রাসাদ শহরের মধ্যেই। তারা সবাই মুসলমান।

শ্রী সুখময় লেখেন—'এরপর থেকে আমাদের মনে হয়, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ তার রাজত্বের শেষ দিকে অতিমাত্রায় ধর্মান্ধ হয়ে ওঠেন এবং বলখি প্রভৃতি দরবেশের উপদেশগুণে অমাত্যের পদ ও অন্যান্য রাজপদ থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করেন। অন্যতম হিন্দু অমাত্য রাজা গণেশও সম্ভবত এই সময় পদচ্যুত হন। (তিনি আরও বলেন) মা-হুয়ান প্রমুখ চীনা রাজ-প্রতিনিধিবর্গকে কেবল বাংলার মুসলমানদের জীবনযাত্রাই দেখানো হয়েছিল। হিন্দুদের বিষয় জানবার সুযোগই তারা পাননি বাংলার তৎকালীন রাজশক্তির হিন্দুবিরোধী নীতির দরুন। আমাদের মনে হয় গিয়াসুদ্দিনের এই ধর্মান্ধতা ও অদূরদর্শী নীতির ফলেই রাজা গণেশ, যার অপরিমিত সামরিক শক্তি ছিল এবং যিনি ইলিয়াস শাহি বংশের সেবক ও মিত্র ছিলেন, তিনিই সেই বংশকে উৎখাত করে নিজে ক্ষমতা অধিকার করলেন। রাজা গনেশের অভ্যুত্থান কেবল তার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুন ঘটেনি। হিন্দুদের সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দিন যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতিই এজন্য দায়ী।'[১০৭]

উল্লেখ্য যে, রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহি বংশকে উৎখাত করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফ উদ্দিন হামজা শাহ (১৪১০/১১-১৪১১/১২ খ্রি.) রাজত্ব করেন। মুদ্রার সাক্ষ্যে দেখা যায়, তিনি 'সুলতান-উস-সালাতিন' উপাধি ধারণ করেছিলেন। রাজা গনেশের চক্রান্তে ক্রীতদাস শিহাব উদ্দিন তাঁকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবত তিনিও রাজা গণেশের চক্রান্তে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। শিহাব উদ্দিন বায়েজিদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সুলতান হন। এই ফিরোজ শাহকে অপসারণ করেই ক্ষমতা দখল করেছিল রাজা গণেশ। ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে দরবেশদের সঙ্গে রাজা গণেশের বিরোধ বাধে। বিরোধিতার কারণ—গণেশ কর্তৃক মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন।

---

[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ.

https://nagorikpathagar.org

এ সময় দরবেশ নুর কুতুব-ই-আলম এগিয়ে আসেন। তিনি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ জৈনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কিকে চিঠি লিখে বাংলাদেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। এ সংবাদ পেয়ে ইবরাহিম শর্কি বাংলাদেশ আক্রমণ করলে রাজা গণেশ স্বীয় পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার হাতে রাজভার অর্পণ করে। ইবরাহিম শর্কি দরবেশ নুর কুতুব-ই-আলমের অনুরোধে স্বদেশে ফিরে যান। ইবরাহিম শর্কি ফিরে গেলে রাজা গণেশ আবারও স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন। তিনি পুত্রকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসনে বসেন।[১০৮] রাজা গণেশ যদুকে বন্দি করে রাখেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তার আরেক ছেলে মহেন্দ্রদেব সিংহাসনে বসেন। কিন্তু জালাল উদ্দিন (যদু) মহেন্দ্রদেবকে সরিয়ে নিজে পুনরায় সিংহাসন দখল করেন এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ নামধারণ করেন। তিনি একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি ইসলামের কল্যাণে কাজ করেন। তার পিতা যে মসজিদগুলো ধ্বংস করেছিল, সেগুলো সংস্কার করেন এবং হানাফি মতবাদ গ্রহণ করেন।[১০৯] তিনি মুদ্রাতে কালিমাও উৎকীর্ণ করেন। অথচ তার আগে বাংলার মুসলমান সুলতানরা মুদ্রায় কালিমা খোদাই করতেন না।[১১০]

শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন—'তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্ম-মুসলমানের চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[১১১] *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর মতে, তিনি বহু হিন্দুকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তার শুদ্ধি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ নির্মিত গাভীর অংশ নিয়েছিল, তাদের যন্ত্রণা দিয়ে শেষ পর্যন্ত গো-মাংস খেতে বাধ্য করেন। বুকাননের বিবরণীতেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

সুলতান জালালুদ্দিনের সেনাপতি ছিলেন রায় রাজধর, তাঁর সভাকবি ছিলেন বৃহস্পতি মিশ্র। জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। সম্ভবত তিনি তিন বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের গণেশের বংশের রাজত্ব চিরদিনের মতো শেষ হয়।[১১২]

এরপর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ। মহানুভব ও সুশাসক নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ প্রায় ২৪ বছর রাজত্ব করে

---

[১০৮] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

[১১০] শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

https://nagorikpathagar.org

১৪৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১১৩] পিতা মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পরে পুত্র রুকন উদ্দিন বারবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বাররক শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন দরবেশ হিসেবে খ্যাত শাহ ইসমাইল গাজি। শাহ ইসমাইল গাজির হাতে কামরূপের রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বারবক শাহের শাসনামলে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলেন যে, বারবক শাহ অনেক হাবশি আমদানি করেন এবং তাদের সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, তিনি আট হাজার হাবশিকে উচ্চপদ দান করেন। তিনি শাহ ইসমাইল গাজিকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করেছিলেন। শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন—অনেক ধর্মপ্রাণ সুলতানের রাজত্বকালে দরবেশরা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, এমনকি তারা দেশের শাসনের ব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বারবক শাহ তাদের কর্তৃত্ব করতে দেননি, উপরন্তু তারা দণ্ডিত হলে দণ্ড দিতে ইতস্তত করেননি।[১১৪]

পরবর্তী শাসক বারবক শাহের পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। প্রজাহিতৈষী ও ধার্মিক এ নৃপতিকে ঐতিহাসিকগণ বুকানন বা A very learned prince হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মস্তিষ্কের বিকৃতির জন্য অল্পদিন পরেই তাকে অপসারিত করে ইউসুফ শাহের অপর পুত্র জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৬)-কে সিংহাসনে বসানো হয়।

জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের রাজত্ব বেশ বড়ো ছিল। তবে তার সময়ে হাবশিদের প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে গিয়েছিল এবং রাজধানী, রাজপ্রাসাদ সর্বত্রই তারা মারাত্মক রকমের প্রভাপশালী হয়ে উঠেছিল। তারা অনেক সময় রাজার আদেশও মানত না। সুলতানের আদেশ অমান্য করলে ফতেহ শাহ অবশ্য তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। যাদের তিনি শাস্তি দিতেন, তারা প্রাসাদের প্রধান খোজা ও প্রাসাদরক্ষী পাইকদের সরর্দার সুলতান শাহজাদার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই সুলতান শাহজাদাই একদিন সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহকে হত্যা করে সুলতান হয়ে যান। এ সময় থেকে চারজন হাবশি সুলতান মোট ছয় বছর বাংলাদেশে রাজত্ব করেন।

ধারণা করা হয়, বণিকদের সাথেই হাবশিদের বাংলায় আগমন ঘটেছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ মক্কা ও মদিনায় মাদরাসা, সরাইখানা ও খাল

[১১৩] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

[১১৪] শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

https://nagorikpathagar.org

খনন করেছিলেন। এই কাজের সমন্বয় করেছিলেন সুলতানের ভৃত্য ইয়াকুত। এই ইয়াকুত ছিলেন একজন হাবশি।[১১৫] ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতীক হাবশিরা ক্রীতদাসরূপেই এ দেশে এসেছিল। তবে কিছুসংখ্যক স্বাধীন আবিসিনিয়ানও ব্যাবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। পর্তুগিজ বণিক বারবোসা লেখেন—'বাঙ্গালা শহরের আরব, ইরানি, হাবশি ও ভারতীয় বণিকেরা বিরাট ব্যবসায়ী এবং একই ধরনের বড়ো বড়ো জাহাজের মালিক।'[১১৬]

আমরা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সুলতান বারবক শাহ ৮০০০ আবিসিনীয় হাবশিকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। ডক্টর এম. এ. রহিমের মতে, এভাবে পরবর্তী প্রায় তিন শতক যাবৎ ৩২,০০০ হাবশির আগমন ঘটেছিল বাংলায়।[১১৭] অশ্বারোহী, প্রহরী, দেহরক্ষী, যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ামক শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার করা হয়েছিল। সুলতান ইউসুফ শাহ ও সুলতান ফতেহ শাহের অন্যতম সেনাপতি মালিক কাফুর ছিলেন একজন হাবশি। যিনিই সৈয়দ হবেন, তিনিই আরব বা আশেপাশের কোনো অঞ্চল থেকে আসবেন—পরবর্তীকালের লোকের মনে এ ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সৈয়দ বংশের লোকেরা অন্ততপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় আসা শুরু করেছিলেন। তারা এ দেশের নারীকে বিয়ে করতেন এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের এ দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। তাদের বংশধররা দুই শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এ দেশেরই লোক হয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া পাঁচ শতাধিক বছর চলার পর এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ এমন হলো না কেন? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণের সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলেই এর জবাব মিলবে। প্রত্যেক পর্যায়েই মুসলমানরা স্থানীয় শাসকদের শক্তিশালী প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল।

ছোটো ছোটো আকারে হলেও স্বদেশিকতার চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে আধিপত্য কায়েম করে রেখেছিল। তারা সকলে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও প্রত্যেক জাতিরই স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তারা স্বীয় সীমানায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। উত্তর ভারতে কাশ্মীর, কনৌজ, কামরূপ, কলিঙ্গ, গুজরাট, সিন্ধু, মানব, দিল্লি, আজমির, বুন্দেল খণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল পৃথক পৃথক শাসকগোষ্ঠীর অধীনে ছিল। দক্ষিণ ভারতে ছিল পল্লবগণের রাজ, চালুক্যগণের রাজ এবং

---

[১১৫] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১১

[১১৬] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

https://nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রকূটগণের রাজ। তা ছাড়াও দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য, চোল ও চেরা নামে তিনটি শক্তিশালী রাজ গড়ে উঠেছিল। যদিও তারা সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলতে পারেনি, তবে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বদেশীয় শাসকেরা আধিপত্য কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তা ছাড়া এসব রাষ্ট্রের মধ্যকার প্রাত্যহিক সংঘর্ষ প্রতিটি রাষ্ট্রের সংহতি দৃঢ় করেছিল নিঃসন্দেহে। অপরদিকে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় ছিল দক্ষিণ ভারত থেকে আগত বর্ণবাদী শাসক সেন বংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক চরম অবহেলিত ও নিগৃহীত।

এবার হোসেন শাহি রাজবংশের দিকে ফেরা যাক। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর রাজসীমা সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর শাসনকালের প্রথম বছর থেকেই মুদ্রায় নিজেকে 'কামরূপ-কামতা-জাজনগর উড়িষ্যা' বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। তিনি ত্রিপুরার রাজার সাথে অনেক দিন ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন এবং চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। তিনি উচ্চপদে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার উজির ছিলেন পুরন্দর খানা, ত্রিপুরা অভিযানে সেনাপতি ছিল গৌড় মল্লিক। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভাই তার প্রিয় কর্মচারী ছিলেন। সাকর মল্লিক (মন্ত্রী বিশেষ) ও সনাতন ছিলেন 'দবির খাস' (ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ)। মুকুন্দ দাস ছিলেন তার প্রধান চিকিৎসক, দেহরক্ষী ছিলেন কেশব ছাত্রী। অনুপ ছিলেন মুদ্রাকলার অধ্যক্ষ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় ভূস্বামী ছিলেন রামচন্দ্র খান। হিরন্দ্র দাস এবং গোবর্ধনও জমিদার ছিলেন। জগাই ও মাধাই নবদ্বীপের কোতওয়াল ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়াতে নুর কুতুব-ই-আলমের দরগা হতে বহু সম্পত্তি ও অর্থ দান করে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কথিত আছে, তিনি প্রতি বছর পায়ে হেঁটে রাজধানী একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় এসে এই সুফির দরগাহে সম্মান প্রদর্শন করতেন।[১১৮]

আলা উদ্দিন হোসেন শাহের পর তার পুত্র নসরত শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। উল্লেখ্য, সুলতান হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে নসরত শাহ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। নসরত শাহের রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিহুত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দাংশ নসরত শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। শ্রী রমেশচন্দ্র তার গ্রন্থে লেখেন—

> নসরত শাহর রাজত্বকালে পর্তুগিজরা আর একবার বাংলাদেশে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে রুই-ভাজ-পেরেবার অধিনায়কত্বে এরূপ একটি পর্তুগিজ জাহাজ চট্টগ্রামে আসে। পেরেরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খাজা শিহাবুদ্দিন নামে একজন ইরানি বণিকের জাহাজ কেড়ে

[১১৮] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২৫

https://nagorikpathagar.org

নিয়ে চলে যায়। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে মাতিম-আফন্সো-দে-মেলোর পরিচালনাধীন একটি জাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চট্টগ্রামে নীত হলে কয়েকজন ধীবর কৌশলে সেটাকে চকোরিয়ার শাসনকর্তা খোদা বখশ খানের কাছে নিয়ে যায়। খোদা বখশ এদের বন্দি করে রেখেছিলেন। আর একদল পর্তুগিজ এসে এদের মুক্তির চেষ্টা করে, কিন্তু মুক্তিপণে বনিবনা হচ্ছিল না। দে-মেলো সদলে পালিয়ে যেতে চাইলে তাঁর রূপবান তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্রাহ্মণেরা ধরে দেবতার নিকট বলি দিল। অবশেষে খাজা শিহাবুদ্দিনের মধ্যস্থতায় বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে।

বর্ণিত ঘটনাটিতে সামসময়িক বাংলার অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছুই শেখার আছে। নাসির উদ্দিন নসরত শাহের পর তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে চাচা গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার তাকে 'যৎপরোনাস্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ' বলে আখ্যায়িত করেন।

মোগল আধিপত্যের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার অধ্যায় অনেক বেশি বর্ণাঢ্য। এ অধ্যায়ে বাংলায় মুসলমানগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলিম বিজয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম অভিবাসীদের বাংলায় অভিবাসনে উৎসাহিত করেছিল। সৈনিক হিসেবে, প্রশাসক হিসেবে, ভাগ্যান্বেষী দাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক বহিরাগত মুসলমানদের এ অঞ্চলে প্রবেশ ঘটেছিল। এ অঞ্চলে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল এবং বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের সাথে মিশ্রবর্ণ এবং উচ্চশ্রেণির হিন্দুদেরও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ একজন সুন্দরী ব্রাহ্মণ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর তার নাম রাখেন ফুলমতী। তার গর্ভে কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল।

কবি মুহাম্মাদ খান থেকে জানা যায়, তার প্রপিতামহ মাহিসাওয়ার এক ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেছিলেন। এ পরিবারের সন্তানেরা পরবর্তী সময়ে ইলিয়াস শাহি ও হোসেন শাহি শাসনামলে কয়েকজন বিখ্যাত শাসনকর্তা ও সেনাপতির জন্ম দিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তের মাধ্যমে জানা যায় জনৈক কাজির সাথে একজন উচ্চশ্রেণির হিন্দু রমণীর বিয়ের কথা এবং তাদের কয়েকটি পুত্রসন্তানের কথা।[১১৯] আবার নিম্নবর্ণের হিন্দু আর বৌদ্ধরাও ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

ড. রহিমের মতে, বাঙালি মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগ উচ্চশ্রেণির অমুসলিম থেকে এবং ৪০ ভাগ হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে

[১১৯] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

https://nagorikpathagar.org

ধর্মান্তরিত হয়েছিল।[১২০] তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নির্যাতিত বৌদ্ধরা মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ে সাহায্য করেছিল। কবি রামাইপণ্ডিতের মতে, এমনকি দেবতারাও ব্রাহ্মণদের এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুসলমান পরগম্বর, সাধু পুরুষ, উলামা ও ধর্মযোদ্ধা ইত্যাদিরূপে আগমন করতেন এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ধূলিসাৎ করতেন।[১২১] ড. রহিম বলেন—

> মুসলমান শাসনামলে বাংলা ছিল সুফি অধ্যুষিত দেশ। এই সুফিরা প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরক্কীর জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। কী ইসলাম বিস্তার, কী মুসলমান শাসন সম্প্রসারণ ও সংহতি বিধান, কী শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধারণভাবে বাঙালি অভিবাসীদের বিশেষ করে মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি উৎকর্ষ বিধান— সুফিদের কৃতিত্ব ছিল মুসলিম সেনাপতি বিজেতা ও শাসকবর্গ অপেক্ষা অনেক বেশি স্থায়ী ও কার্যকর।[১২২]

আবদুর রহিমের সাথে আমাদের অল্পবিস্তর মতপার্থক্য আছে। গোলাম মুরশিদ বলেন—

> বখতিয়ার খলজি ছিলেন তুর্কি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পরে যে মুসলমান আমির-উমরাহ এবং সৈন্যরা বঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই তুর্কি ছিলেন না। তাঁদের কেউ এসেছিলেন আরব থেকে, কেউ তুর্কিস্তান, কেউ উজবেকিস্তান, কেউ ইরান, কেউ আফগানিস্তান থেকে। এককথায় কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে। উত্তর এবং পূর্ব-আফ্রিকার হাবশিরাও এসেছিলেন পনেরো শতকে। চেঙ্গিস খান এবং তাঁর অনুসারী অমুসলমান বিজেতাদের হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে যারা কেন্দ্রীয় এশিয়া থেকে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ প্রথমে উত্তর ভারতেই বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু পরে তাঁদের অনেকে আবার বঙ্গদেশে আগমন করেন। বিদেশ থেকে আসা এই লোকেরা সবাই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী, নিজেদের অবস্থা ফেরানোর জন্যেই সুদূর বঙ্গদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন; ধর্ম প্রচার করে পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁরা কেউ এ দেশে আসেনি।[১২৩]

তিনি আরও লেখেন, বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের প্রথম শতাব্দীতে শাসকেরা স্থানীয় লোকদের ওপর কঠোর হাতে নিজেদের কর্তৃত্ব কীভাবে বহাল

---

[১২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[১২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[১২৩] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

https://nagorikpathagar.org

রেখেছিলেন, সে প্রশ্ন সংগতভাবেই তোলা যেতে পারে। সারাক্ষণ তরবারি উঁচিয়ে বছরের পর বছর শাসন করা কি সম্ভব? মনে হয় তা সম্ভব নয়। তাই দেশ পরিচালনার জন্য গোড়া থেকেই তাদের নির্ভর করতে হয়েছে স্থানীয় লোকদের ওপর। এভাবে স্থানীয় লোকদের ভেতর থেকে অনতিবিলম্বে একটা মধ্যস্থ শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। এই মধ্যস্থ শ্রেণি এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শাসকদের আদান-প্রদানের ফলে প্রথম দু-তিন শতাব্দীর মধ্যেই দেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমানদের নিয়ে আসা ভাষা-সংস্কৃতির অনেক মিশ্রণ হয়েছিল, এমনটা অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত।[১২৪] গোলাম মুরশিদ লেখেন, বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু দেবতারা সবাই একমত হয়ে রাতারাতি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে এখানে যে বর্ণনা আছে, তা ঠিক নয়। বরং ধারণা করা সংগত হবে—ইসলাম ধর্ম তুড়ির গতিতে নয়, পূর্ববঙ্গসহ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল ধীরে ধীরে।[১২৫] ধর্ম প্রচার সুলতানদের লক্ষ না হলেও তারা আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। তারা নিজেদের ধর্মের প্রতি মোটেও উদাসীন ছিলেন না; বরং তারা যেভাবে রাজধানীর আশেপাশে, এমনকি রাজধানী থেকে দূরে মসজিদ, খানকা, দরগা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন, তা থেকে ধর্মে তাদের কমবেশি উৎসাহেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২৬]

প্রথম কয়েক শতাব্দীতে যেসব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, সেগুলোর অবস্থান বিশ্লেষণ করলেও ধর্ম প্রচারে সুলতানদের সীমিত পৃষ্ঠপোষকতার আভাস পাওয়া যায়। ১৫০০ সাল পর্যন্ত যেসব মসজিদ তৈরি হয়েছিল, সেগুলো বেশির ভাগই ছিল রাজধানী অথবা তার কাছাকাছি। এর ব্যতিক্রম হলো যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে নির্মিত খানজাহান আলির মসজিদগুলো। কারণ, খানজাহান কেবল শাসক ছিলেন না, তিনি পীরও ছিলেন। তাঁর তুলনা চলে জাফর খানের সাথে। সুতরাং তাঁকে দিয়ে তাবৎ সুলতানদের বিচার করা সংগত হবে না। মুসলমান শাসকরা ইসলাম প্রচারে সরাসরি সহায়তা না দিলেও তারা পীরদের জমি দান করতেন এবং বসতি স্থাপনে সাহায্য করতেন—এ তথ্য ইতিহাস থেকে জানা যায়। সুলতানি আমলে পীর-দরবেশরা গ্রামের দিকেও ছড়িয়ে পড়েন। এরা যোদ্ধা ছিলেন না। জনপ্রিয় বহু পীর সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ধারণা করা সংগত যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে এই পীরদের কাছে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রসারের একটা মস্ত বড়ো অন্তরায় ছিল ভাষার বাধা। তাই পীরদের কাছ থেকে খাঁটি ইসলামের শিক্ষা

---

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

https://nagorikpathagar.org

পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তারা পীরদের কাছ থেকে যে ধর্মীয় শিক্ষা পেতেন, তাকে নামেমাত্র ইসলামের শিক্ষা ছাড়া আর কিছু বলা সংগত হবে না। পীরদের অলৌকিক ক্ষমতা অথবা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, জাতিভেদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়ে সামাজিক সাম্য লাভ, কারও অনুগ্রহ লাভ অথবা অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া—যে কারণেই এই অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন না কেন, সেটা থাকত নিতান্তই প্রতীকী ঘটনা। বাকি জীবনে চলতে থাকত পুরোনো বিশ্বাসেরই অনুবর্তন অথবা ধীরে ধীরে পুরোনো বিশ্বাসের মধ্যে ইসলামের কিঞ্চিৎ অনুপ্রবেশ।[১২৭]

বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পায়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কবি কৃত্তিবাসের মতে, মুসলিম প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সংমিশ্রণের ভয়ে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণ তাদের পৈতৃক ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করেন। কবি লিখেছেন, তার পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা, যিনি সোনারগাঁওয়ের দনুজমর্দনদেব-এর একজন সভাসদ ছিলেন, তিনিও ওই সময়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন।

ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে মুসলমানদের দ্বারা সোনারগাঁও বিজিত হয়নি। তাহলে কীভাবে সে সময়ে ওই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায়? এতে ইঙ্গিত মেলে যে, সোনারগাঁও অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসার পূর্বেই সে অঞ্চলে বহু মুসলমান ছিল। ত্রয়োদশ শতকের সপ্ত দশকে শেখ শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁওয়ে খানকা ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই এলাকায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য একটি ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, শেখ আবু তাওয়ামার সোনারগাঁও পৌঁছানোর পূর্বে সেখানে মুসলমান অধিবাসী ছিল। মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হওয়ার পূর্বে সোনারগাঁওয়ে মুসলিম জনসংখ্যার অস্তিত্ব সুফি দরবেশদের প্রচারমূলক কার্যাবলিরই ফলশ্রুতি।[১২৮]

ঐতিহাসিকদের বর্ণনাসূত্রে, ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর সোনারগাঁও বিজিত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আরও লক্ষ করুন, ত্রয়োদশ শতকের সপ্ত দশকে শেখ আবু তাওয়ামা খানকা ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ মুসলিম রাজশক্তি কর্তৃক এ অঞ্চল বিজয় লাভের পর নতুন বিজিত অঞ্চলে অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে কারণেই শেখ আবু তাওয়ামাকে খানকা ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

---

[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭৪

[১২৮] ডক্টর এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

https://nagorikpathagar.org

ড. রহিম বলেন—কখনো নিজেরা, কখনো মুসলমান সেনাপতিদের সহযোগিতায় তারা প্রদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত মুসলিম অধিকার কায়েম করেন। দরবেশদের কেউ কেউ বঙ্গদেশে ধর্মের শাসনসীমা বিস্তৃত করতে এবং ছোটো ছোটো হিন্দু রাজা ও জমিদারদের এলাকায় বসবাসকারী মুসলমান প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে মুসলমান শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের সঙ্গে যোগদান করতেন। মুজাহিদ দরবেশ জাফর খান গাজি ও শাহ সফি উদ্দিন সাতগাঁওয়ের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ওই অঞ্চল বাংলাদেশের মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শাহজালাল ও তাঁর শিষ্যরা সিলেটের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিকান্দার গাজির মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং সেখানে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান বারবক শাহের রাজ সম্প্রসারণে ইসলাম গাজির অবদান সুপরিজ্ঞাত। তিনি সফলতার সঙ্গে উড়িষ্যার হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং মান্দারণ এলাকা জয় করেন। এসব সাধু পুরুষগণ সংকটের সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষা করেছেন।

জনশ্রুতিতে এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগের দিনে সুফি দরবেশগণ তাদের অভিভাবকরূপে তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। নুর কুতুব আলম ছিলেন মুসলিম বাংলার ত্রাণকর্তা। তাঁর কর্মশক্তির ফলেই মুসলিম সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজে এক নবীন শক্তির সঞ্চার হয়। সুফি দরবেশগণ বাংলাদেশে মুসলিম শাসনব্যবস্থায় ইসলামি নীতির সমর্থক ছিলেন। সাধারণত তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তারা কখনো নির্বিকার থাকেননি।[১২৯]

অসীম রায় মনে করেন, বাংলা অঞ্চলে ধর্মান্তর আধ্যাত্মিক প্রণোদনায় ঘটেনি এবং এই ধর্মান্তর ঘটেছে গণভাবে। এ প্রসঙ্গে ড. আকবর আলী বলেন, রায় বাংলায় পীরদের অনন্যতাকে অতিরঞ্জিত করেছেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে পীরবাদের চল দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষণীয়ভাবে সমধর্মী। উত্তর ভারতের সর্বত্র মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পাঁচ পীরের পূজা সমভাবে জনপ্রিয়। সমভাবে খাজা খিজিরকে বাংলায় পীর বদর বলে পূজা করা হয়। গাজি মিঞাকে বাংলায় বিয়েশাদি আর গর্ভধারণের দরবেশ বলে পূজা করা হয়; উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবেও তাকে সমভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করা হয়। বাংলার কিছু পীর স্থানীয়ভাবেও প্রতিষ্ঠিত পীর বলে আকবর আলী খান উল্লেখ করেন। যেমন : প্রেমের দরবেশ হচ্ছেন মনাই পীর, গরুর বাছুরের রক্ষক হচ্ছেন তিন নাখ, গ্রাম

[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২৪

https://nagorikpathagar.org

রক্ষাকারী দরবেশ হচ্ছেন মানিক পীর, বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী হচ্ছেন গাজি সাহেব এবং জানমালের হেফাজতকারী হচ্ছেন সত্যপীর। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও একই ধরনের পীর প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাঙালি মানিক পীরের পাঞ্জাবি প্রতিশব্দ হচ্ছে শাখি সাওয়ার সুলতান।

ড. আকবর আলী খান আরও বলেন, মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার জন্য অনেক হিন্দু কুলীন পরিবারকে জাতিভ্রষ্ট হতে হয়েছে; কিন্তু জাতিভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা ধর্মান্তরিত হতে রাজি হয়নি। সুতরাং আধ্যাত্মিক প্রণোদনা ছাড়া হিন্দুদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ সম্ভব ছিল না। আর বাংলায় গণ ধর্মান্তরের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে গণ ধর্মান্তরের উদাহরণ আছে। যখন পুরো জনগোষ্ঠী বা অধিকাংশ মানুষ নতুন ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করে, তখনই গণ ধর্মান্তর ঘটে। বাংলায় কোনো উপজাতি বা পুরো গ্রাম ধর্মান্তরিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত নেই। চতুর্দশ শতকে শাহজালাল (রহ.) ৭০০ জন ধর্মপ্রচারক নিয়ে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ৫০০ বছর ধরে মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের এমন অব্যাহত চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৩১ সালে সিলেট জেলায় জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি ছিল হিন্দু। এ কথা স্পষ্ট যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারে ৭০০ বছর সময় লেগেছে।

সারণি-০৩

বাংলায় পীর-দরবেশের প্রধান প্রধান মাজার

অঞ্চল	আনুমানিক সময়	ধরন	পীর-দরবেশের নাম	মাজারের অবস্থান
চট্টগ্রাম	৯ম শতাব্দী	কিংবদন্তি	বায়েজিদ বোস্তামি	চট্টগ্রাম
	১৩শ শতাব্দী	কিংবদন্তি	শেখ ফরিদ	চট্টগ্রাম
	১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ বখতিয়ার	সন্দ্বীপ
	১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মহীশূর	
			শেখ জালাল	হাটহাজারী
			হালভি	
নোয়াখালী	১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সৈয়দ মিরণ শাহ	কাঞ্চনপুর
কুমিল্লা	১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	হজরত শাহরাস্তি	চাঁদপুরের
	১৪শ-১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সৈয়দ আহমদ	মেহের
		ঐতিহাসিক	কেল্লা	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার
	১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শহিদ	খড়মপুর

https://nagorikpathagar.org

		শাহ মুহম্মদ বাগদাদি	চাঁদপুরের শাহতলী
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শাহ জালাল	সিলেট
১১শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শাহ মুহাম্মাদ	নেত্রকোনা
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সুলতান রুম	(মদনপুর)
১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শাহ কামাল	
শেষ ভাগ/১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ		শাহ আদম	গারো পাহাড় আটিয়া
১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ শরফ আল দ্বীন আবু তাওয়ামা	সোনারগাঁও
সময় অজ্ঞাত	ঐতিহাসিক		
১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ	ঐতিহাসিক	শাহ নিয়ামত উল্লাহ শেখ আনোয়ার	ঢাকার পুরানা পল্টন সোনারগাঁও
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	বাবা আদম শহিদ	মুন্সিগঞ্জের
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সৈয়দ আলি	বিক্রমপুর
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	তাবরিজি	
১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ মালেক	ধামরাই ঢাকা
১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ	ঐতিহাসিক	ইয়েমেনি	শহর
	ঐতিহাসিক	শাহ লঙ্গর	
	ঐতিহাসিক	শাহ মান্নান	ঢাকার ১০ মাইল উত্তরে
১৬শ শতাব্দী প্রথম ভাগ		হাজি বাবা সালেহ	সোনাগাঁও-এর উত্তরে
১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/১৬শ শতাব্দীর		খাজা চিশতি বেহস্তি	সোনাগাঁও-এর মোগরা পাড়া নারায়ণগঞ্জের

https://nagorikpathagar.org

প্রথম ভাগ		
১৬শ শতাব্দী		শাহ আলি বাগদাদি
১৪শ/১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সাইয়িদুল আরেফিন
১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	খানজাহান আলি
১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	খালাশ খান
১৫শ/১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মাখদুম জালাল উদ্দিন
১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	রুপুস মৌলানা শাহদৌল্লা (শাহ মোয়াজ্জেম দানিশমন্দ)
১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মাখদুম শাহ
১৬শ শতাব্দীর পূর্বে	ঐতিহাসিক	শাহ শরিফ জিন্দানি
১১শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মির সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মহীশুর
তারিখ অজ্ঞাত	কিংবদন্তি	শাহ তুরকান
তারিখ অজ্ঞাত	কিংবদন্তি	শহিদ বাবা আদম

https://nagorikpathagar.org

শেষ ভাগ/		জামাল
১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ	ঐতিহাসিক	শেখ আখি সিরাজ, আল দ্বীন ওসমান
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ আল হক
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ রাজা
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	বিয়াবানি
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	হজরত নুর কুতুব
১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	আলম
১৭শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মৌলানা বদখুর্দ্দার কাহ নিয়ামত উল্লাহ
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সৈয়দ আব্বাস আলি মির (পীর
১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	গোরা চান্দ)
১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	রওশন আরা
কিংবদন্তি	ঐতিহাসিক	একদিন শাহ মোবারক গাজি
কাল অজ্ঞাত	কিংবদন্তি	শরীফ শাহ
১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শাহ সুফি শহিদ
১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/	ঐতিহাসিক	শাহ সাফিয়াল দ্বীন

https://nagorikpathagar.org

	১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মাখদুম শাহ	মঙ্গলকোট
	১৫শ/১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শাহ সুলতান আনসারি	মঙ্গলকোট
	১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক		বর্ধমান
বর্ধমান	১৬শ শতাব্দী		বাহরাম সাক্কা	মঙ্গলকোট
	১৭/শ/১৮শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মাখদুম শাহ আবদুল্লাহ গুজরাটি	বর্ধমান
			খাজা আনওয়ার শাহ	
	১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ আবদুল্লাহ কিরমানি	খুন্তিগিরি
বীরভূম	১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	মাখদুম শাহ জহির আল দ্বীন	মাখদুম
	১৩শ/১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ আল দ্বীন	বিহার
		ঐতিহাসিক	মানেরি	
	১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শেখ হোসেন	বিহার
	১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	দুকারপোষ	
বিহারের সংলগ্ন জেলা	শেষ ভাগ/১৫শ শতাব্দী		শাহ বদরুল ইসলাম	বিহার
	প্রথম ভাগ		শাহ মজলিস	বিহার
	১৪শ শতাব্দী			
	শেষ ভাগ/১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ			

সূত্র :

১. Rahim, Muhammad Abdur, 1963. *Social and Cultural History of Bengal*, vol. 1 (Karachi: Pakistan Historical Soceity), p. 72-150.

২. চৌধুরী শামসুর রহমান; ১৯৬৫, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো*, ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, পৃ. ৩৩-৯৬

https://nagorikpathagar.org

এটা স্বীকার্য যে, বাংলার মুসলমানদের মানস গঠনে এ সকল সুফিদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। তারাও ধর্মান্তরকরণে কিছুটা ভূমিকা রেখে ছিল সত্য, তবে সেটা কোনো 'ভূমিধস' ঘটনা নয়। অবাক বিষয় হচ্ছে, যখনই প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে ইতিহাস রচিত হচ্ছে, তখন কিন্তু আর ওইসব সুফির তেমন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের কেরামতির কথাও বর্ণিত হচ্ছে না। প্রকৃত সত্য হলো, আপনি কখনো এরূপ কেরামতি দেখবেন না এবং এমন কেরামতি দেখেছেন, এমন প্রত্যক্ষদর্শীরও সাক্ষাৎ পাবেন না। তবে এ সংক্রান্ত প্রচুর কাহিনি শুনে থাকবেন। বাংলার ইতিহাসেও যাদের এভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তারা আদতে তেমন নন। তাদের অনেকেই মাঠের লড়াকু সৈনিক; মাদরাসা-খানকা থেকে ইসলামের আলো বিতরণকারী আলিম-উলামা ও খাদেম শ্রেণি। আবার আমরা এ কথাও বলছি, বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তারে শাসকগোষ্ঠীও তেমন উদ্যোগী ছিলেন না।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, কীভাবে বাংলায় ইসলামের বিস্তার সম্ভব হলো? অপরাপর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলমানগণ যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, এখানেও সেই প্রক্রিয়াতেই ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে—এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না; উচ্চশ্রেণির নিপীড়নমূলক আচরণ নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল এবং এই ধর্মের ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। অর্থাৎ ধর্ম তাদের জীবনে খুব বড়ো কোনো ব্যাপার হিসেবে পরিগণিত হতো না। উপরিউক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিকটও ধর্ম তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল না। এমতাবস্থায় ইসলামের আগমন ঘটে বাংলায়। বাংলার স্থানীয় জনগণ এই নতুন ধর্মকে নিপীড়নমূলক হিসেবে বিবেচনা করেনি।

বহিরাগত মুসলমানদের বাংলাদেশে আগমন, স্থায়ী বসতি স্থাপন, তাদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং প্রচেষ্টা ধর্মান্তরকরণের গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে পরিলক্ষিত হয়। সবকিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, তা হলো—এ অঞ্চলে রাজশক্তি হিসেবে ইসলামের আগমন। রাজন্যবর্গ সরাসরি ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ না করলেও ইসলাম প্রচারে তাদের কারও কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব আমরা কখনোই দেখিনি। উপরিউক্ত তারা সাম্রাজ্যব্যাপী মসজিদ, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রসারে সহায়তা করেছেন। তারা আলিম-উলামা-সুফিদের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং লাখেরাজ সম্পত্তি, নগদ অর্থ, এমনকি সৈন্য দিয়েও সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি তারা ধর্মপ্রচারকদের নির্বিঘ্নে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। অন্তত ধর্মপ্রচারকদের রাজশক্তির পক্ষ থেকে কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

https://nagorikpathagar.org

কেননা, রাজশক্তির বিরোধিতা যুগে যুগে ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ রাজশক্তি কর্তৃক বিজিত হয়েছে; ফলে এখানে দ্রুত অভিবাসন ঘটেছে। আলিম-উলামা, সুফি এবং প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তরিত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক জোর করে ধর্মান্তরের কথাও বলেছেন—এটা সীমিত পরিসরে হলেও হয়েছে। আমরা আলোচনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দু-একজন শাসকের সন্তানাদি ও উপপত্নীর সংখ্যাও উল্লেখ করেছি এটা বোঝানোর জন্য যে, মুসলিম পরিবারে সন্তানাদি নেওয়ার প্রবণতা ছিল অত্যধিক। প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর এভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য যে, এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরও বাংলা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভূখণ্ডে পরিণত হতে সক্ষম হয়নি। বিশ্বাস করা হতো, বাংলা প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একটি হিন্দু প্রদেশ দেশ। ১৮৭২ সালে বাংলায় প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আদমশুমারিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বাংলায় প্রায় ৫০ শতাংশ লোক মুসলমান। ১৮৭০ সালের বাংলা প্রদেশে মুসলমান ছিল ১ কোটি ৭৬ লাখ, কিন্তু ১৯০১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ১৫ লাখে।[১৩০] এই যে ৩০ বছরে প্রায় ৪০ লাখ মুসলমান বৃদ্ধি পেল, এতে কিন্তু কোনো ধর্মান্তর, জোরজবরদস্তি কিংবা পীর-সুফিদের কেরামতি লাগেনি; এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ডক্টর এম. এ. রহিম বলেন—

> ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পূর্বে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে মোট বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬ লক্ষ এবং তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার ছিল বহিরাগত মুসলমান, ৭০ লক্ষ ৩৩ হাজার ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। জন্মহারের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধির ভিত্তিতে হিসেব করে আমরা দেখতে পাই যে, ২০০ শতাব্দী পূর্বে বহিরাগত এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় যথাক্রমে ৮ লক্ষে এবং ১৯ লক্ষ্যে। এভাবে ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ এবং হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৪১ লক্ষ। তখন বাংলাতে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮ লক্ষ এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য নিয়ে ধরা যেতে পারে ৭০ লক্ষ। তখন মুসলমানরা ছিল প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯.৬ ভাগ মাত্র।[১৩১]

১৮৭২ সালের সেন্সর রিপোর্টে সর্বপ্রথম বাংলার হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা, গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায়। এতে

---

[১৩০] আকবর আলী খান, *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

[১৩১] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

https://nagorikpathagar.org

প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যায় সামান্য তারতম্য ছিল। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় সেন্সাস রিপোর্টে ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ জনসমষ্টির মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বেশি হয়। মধ্যযুগে সেন্সাস ছিল না। ফলে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের উদ্ভব, গঠন, প্রকৃতি, বিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা সম্ভব নয়। তেরো শতকের গোড়ায় তুর্কি বিজয়ের ফলে বাংলায় মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, তা ঐতিহাসিক সত্য। বিভিন্ন দেশের বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমান দ্বারা এ সমাজ গঠিত হয়, তাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মানুষের সংখ্যা ও অনুপাত কী, বৃদ্ধি কীরূপ হয়, সমাজের শক্তি হিসেবে কখন তা আত্মপ্রকাশ করে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। উপসংহারে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বহিরাগত ধর্মান্তরিত ও বৈবাহিকসূত্রে মুসলিম—উভয়ের মিশ্রণজাত মানুষের দ্বারা বাংলার মুসলিম সমাজ গঠিত হয়; এদের মধ্যে ধর্মান্তরিত শ্রেণি মূলস্রোত হিসেবে কাজ করেছে।[১৩২] বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিকসূত্রে জাত মিশ্র রক্ত ধারার মানুষ—এ বিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন এবং বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও মুসলমান সমাজের পত্তন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালি মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।[১৩৩]

সারণি-০৪

১৮৭২ থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আদমশুমারি

মূলবাংলা	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	মন্তব্য
১৮৭২	৩৬৭৯৭৩৫	১৮,১০২৩৪৮ (১৬,৮০০,০০০)	১৬৩৭০৯৬৭	হিন্দুদের সাথে বহু আদিবাসীও যোগ করা হয়েছে। এদের সংখ্যা ১০ লাখ
১৮৮১	৩৮৬০৭৬২৮	১৭২৫৪১২০	১৭৮৬৩৪১১	শ্রীহট্টকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করে। এর জনসংখ্যা ১১ লক্ষ।

[১৩২] ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ: প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ হান্নান, (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৯), পৃ. ৪৫২-৪৬৩

[১৩৩] ওয়াকিল আহমদ, *বাঙালি মুসলমান প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

https://nagorikpathagar.org

১৮৯১	৩৮২৭৭৩৩৮	১৮০৬৮৬৫৫	১৯৫৮২৪৮১	
১৯০১	৪২৮৭৪৮৪৩	৪২০১৫০৫১	২১৯৪৭৯৮০	
১৯১১	৪৬৩০৩৪২১	২০৯৪৫৩৭৯	২৪২৩৭২২৮	
১৯৪১	৭ কোটি প্রায়	৩.১০ কোটি	৩.৭০ কোটি	

উৎস : ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০।

১৮৭২ থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আদমশুমারি বিবরণ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, ৪০ বছর সময়ের মধ্যে বাঙালি মুসলমান প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে (১৬৩ লক্ষ থেকে ২৪২ লক্ষ) এবং হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ২৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে (১৬৮ লক্ষ থেকে ২০৯ লক্ষ)। এর অর্থ ১০০ বছরে বাঙালি মুসলমান শতকরা ১২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৭ বা ৬০ ভাগ প্রায়। এই যে ১২৫ ভাগ মুসলমান বৃদ্ধি পেল, এই সময়ে তেমন ধর্মান্তরই ঘটেনি। তাহলে প্রশ্ন আসে—কীভাবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল? এর কারণ তাদের বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ ও উচ্চ জন্মহার।[১৩৪]

মোগল-পূর্ব যুগে বহুসংখ্যক আরব, তুর্কি, ইরানি ও আফগান বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন। সে সময়ে বহু আলিম ও সুফি-দরবেশ ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। এর ফলে বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মোগল আমলে সুফি ও ধর্মপ্রচারকদের ধর্ম প্রচারের উৎসাহ অনেকখানি হ্রাস পায়। এ সময় শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজি, শাহজালাল ও অন্য সুফিদের ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিসম্পন্ন সাধক বাংলায় খুব কম দেখা যায়। দু-একজন ধর্মপ্রচারক প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এ সময়ে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মোগল আমলে অধিকাংশ ধর্মান্তর ঘটেছে উচ্চশ্রেণি ও শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্য থেকে। তারা মুসলমান শাসকদের অতি নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং ইসলামের সহজ ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[১৩৫]

মোগলদের নিকট আফগানদের পরাজয়ের পর দলে দলে আফগানরা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে। মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিপুলসংখ্যক মোগল ও ইরানি পরিবার বাংলাকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করে। আরবরা বাংলাদেশে

[১৩৪] ডক্টর এম. এ. রহিম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

https://nagorikpathagar.org

বসতি স্থাপন করে সওদাগর ও ধর্মপ্রচারকরূপে। কয়েক সহস্র হাবশিকে দাসরূপে আনা হয়েছিল। বহিরাগত তুর্কিরাও কালক্রমে অন্যান্য মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বহু আফগান, যারা বাংলার তুর্কি শাসকদের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে কাজ করেছিল, তারা প্রায় সকলেই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। বহুসংখ্যক আফগান এ দেশকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মোগলদের হস্তগত হলে রাজচ্যুত বহুসংখ্যক আফগান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে বাংলায় বারোভুঁইয়াদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে। আফগানরা শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বাংলার অন্যান্য স্থানে বসতি স্থাপন করে। বাংলাদেশের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বহিরাগত ইরানিরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোগল-পূর্ব যুগে তারা বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন সুফি, দরবেশ ও ধর্মীয় শিক্ষকরূপে। মোগল বিজয়ের পর বহুসংখ্যক বহিরাগত ইরানি বাংলায় বসতি স্থাপন করে। শাহজাদা সুজার সময়ে বাংলার রাজধানী একটি শিয়া নগরে পরিণত হয়। সুজা উদ্দিন ও আলিবর্দির রাজত্বকালে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও গুণী ইরানি পরিবার বাংলাকে নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করে।[১৩৬]

হুসেন শাহি শাসনামলে গৌড় নগরীর সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারণ সাধিত হয়। এ সময় গৌড় উত্তরে ফুলবাড়ি তোরণ থেকে দক্ষিণে টাঁকশাল পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পূর্ব-পশ্চিমে এর বিস্তৃতি ছিল প্রায় তিন কিলোমিটার। পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ফারিয়া ওয়াই সোওজা ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে তার লেখায় এ নগরীর সবচেয়ে উন্নতির সময়ে জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য একজন পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ডি বারোজের মতানুসারে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সড়কগুলো ছিল প্রশস্ত ও সোজা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নগরীর জনসংখ্যা এত বিপুল ছিল এবং রাজদরবারে হাজিরা দিতে আসা মানুষের জমায়েত ও যাতায়াতের রাস্তাগুলোতে এত ভিড় হতো যে, তারা একে অন্যকে পেছনে ফেলে সম্মুখে এগোতে পারত না। গৌড় এমনই নগরী—যেখানে একদা আরব, আবিসিনিয়ান, আফগান, মোগল, পর্তুগিজ ও চীনারা স্থল ও জলপথে যাতায়াত করে থাকত।[১৩৭]

সুলতানি আমলে শুধু সুলতানদেরই বাহিনী ছিল এমন নয়; মুসলমান বণিক ও জমিদারদেরও পাইক-পেয়াদার বাহিনী ছিল। কবি ষষ্ঠীধরের লেখা থেকে ধারণা করা যায় যে, স্থানীয় কর্মচারীদের প্রত্যেকের একটি করে অনুচর বাহিনী ছিল।

---

[১৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২০

[১৩৭] স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

https://nagorikpathagar.org

কবি লেখেন, হাসান কাজির একটি যুদ্ধাভিযানে ১৮ হাজার পাইকের একটি দল অংশগ্রহণ করে। অশ্বপৃষ্ঠে ধনুকধারী সৈন্যও ছিল। উৎপাতকারী কিছুসংখ্যক রাখাল বালকের শাস্তিদান করার উদ্দেশ্যে একজন মুসলিম কাজির একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি দ্বিজ বংশীবদন আরও লেখেন—কাজি এই অভিযানে তিন লক্ষ খোজা, এক হাজার পাঠান এবং বহু লাঠিয়াল সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১৩৮] কবি বিজয় গুপ্ত বলেন, অপরাধী রাখাল বালকদেরকে ধরে আনার জন্য কাজি শত শত পেয়াদা প্রেরণ করেন। মুসলমান শাসনকর্তারা নিয়মিত বিরাট সৈন্যদল রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অনুচর রাখতেন, জেলাসমূহের সরকারি কর্মচারীদের অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল রাখার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান বণিক ও জমিদারদেরও পাইক-পেয়াদার বাহিনী ছিল। নিঃসন্দেহে এসব চাকরিতে মুসলমানদের অগ্রাধিকার ছিল। ডক্টর এম. এ. রহিম বলেন, মুসলমান শাসনামলে মুসলমানদের চাকরিবাকরির অসংখ্য পথ খোলা ছিল।[১৩৯] কবি দ্বিজ বংশীবদন বলেন—হাসানের সাত পুত্র পায়জামা, লিমা (সার্ট), টুপি ও কটিবন্ধে সজ্জিত হয়।[১৪০]

বাল্যবিবাহ প্রথা সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত ছিল। মুসলমান বালক-বালিকাদের শিশুকালেই বিয়ে দেওয়া হতো। ফলে তাদের আলাদা পারিবারিক জীবন আরম্ভ হতো। উচ্চশ্রেণির পরিবারগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তার ভ্রাতা আকরাম উদ্দৌলাকে অল্প বয়সেই বিয়ে দেওয়া হয়। সিরাজউদ্দৌলার কন্যাকে এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয় যে, ১৭৭৪ সালে মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২০ বছর এবং এই বয়সেই তিনি শরফুন্নিসা, আসমাতুন্নিসা, সখিনা ও আমাতুল মাহদি—এই চার কন্যাসন্তান রেখে যান। এদের সকলেরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়।[১৪১] আমরা যদি হালের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করি তাহলে দেখব যে, একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। ধর্মগুরুগণ এই নবধর্মে দীক্ষিতদের যতই শিক্ষা দেন না কেন, তাদের নামকরণ কিংবা আচার-আচরণ প্যাগানিজমের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। বাংলার সমাজ গঠন ও ধর্ম বিশ্বাসেও অনুরূপ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারের গতি মন্থর আর বর্ণপ্রথায় নিগৃহীত তথাকথিত হরিজন ভূখণ্ডে ছিল দ্রুত।

---

[১৩৮] উদ্ধৃতি, ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৭

[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

https://nagorikpathagar.org

মুসলিম বিজয়ের পর বাংলা রাজ্যের ক্রমপ্রসার ঘটতে থাকে। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা গোরকপুর থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কররানি শাসনামলে বিহার ও উড়িষ্যা বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনাকার্য নির্বাহের জন্য বহু আঞ্চলিক সরকারি কার্যালয় গড়ে উঠেছিল এবং বিপুলসংখ্যক রাজকর্মচারী এ সমস্ত কার্যালয়ে সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইকলিস, আরসা, থানা, মহল ইত্যাদি শাসনকেন্দ্রেও সরকারি কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪২]

সেনদের রাজত্বকালে কনোজিয়া ঠাকুরেরা এ দেশে আগমন করেন। তাদের প্রভাবে বঙ্গের এই বৃহৎ জনসাধারণের সঙ্গে উচ্চ হিন্দু সমাজের নাড়িচ্ছেদ হয়ে যায়। সেন রাজাদের কোপানলে দগ্ধ হয়ে পূর্ববঙ্গে নাথপন্থিরা ইসলামের আশ্রয় নেয়। ইসলাম সেখানে উগ্রভাবে ধর্ম প্রচার করেনি। পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ জনসাধারণ সমধিক পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। গোঁড়া হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে এরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করে। এজন্যই পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা প্রায় একশত পঁচিশ বছর পূর্বে মুসলমান শাসনাধীনে থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। অথচ পূর্ববঙ্গ এত পরে বিজিত হলেও ধর্মাবলম্বীদের এত অধিক পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণ কী? মুসলমানেরা যে এখানে খগড়হস্তে ধর্ম প্রচার করেছেন, এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কালপাড়ার ও মুরশিদ কুলি খাঁ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারাই হিন্দু সমাজের ওপর অধিক বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং হিন্দুদের উৎপীড়ন করতেন।[১৪৩]

আবার আরেক দল মনে করেন, তেরো শতক থেকে চৌদ্দ শ পঞ্চাশের মধ্যে কোনো বাংলা রচনার নিশ্চিত নিদর্শন মেলে না। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন, এ সময়ে কিছুই রচিত হয়নি এবং তারা তুর্কি বিজয়কেই এজন্য দায়ী করেন। তারা বলেন, তুর্কি বিজয়ের ফলে ১৫০-২০০ কিংবা ২৫০ বছর ধরে বাংলাদেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলে। মানুষের জীবন-জীবিকা ও ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর বেপরোয়া ও নির্মম হামলা চলে। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল; আর যারা এর মধ্যে মাটি কামড়ে পড়ে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিন-রজনি গুনে গুনে রইল।

---

[১৪২] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার শাসনাতান্ত্রিক ইতিহাস* (চট্টগ্রাম : ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২), পৃ. ৪৯-৫১

[১৪৩] দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা : বাতিঘর, ২০১৯), ৩০-৩৫

https://nagorikpathagar.org

কাজেই নতুন করে তো কিছু তো হলোই না, সাহিত্য-সংস্কৃতির যা ছিল, তাও লোপ পেল।[১৪৪] এর জবাবে ড. আহমদ শরীফ বলেন—

> এই হলো তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত। এসব উক্তির মূলে যে কোনো তথ্য নেই, তা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করা যায়।... অত্যাচার যতই তীব্র হোক, তা দেড়শ ২০০ বছর অবধি চলতে পারে না। সাত পুরুষ ধরে পীড়ন চালানোর পরেও দেশে হিন্দু প্রজা রইল; তাদের খাওয়া-পরার, বিয়ে করা আর ধর্ম রক্ষার অধিকারও রইল; আনুষঙ্গিক উৎসব পাঠনও চলছিল নিশ্চয়ই; প্রাকৃত জোঙ্গল, সুদুক্তি কর্ণামৃত সংকলিত হলো এ সময়ে।...বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে হিন্দু সমাজে যে ভাঙন ধরে, তা রোধ করার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তাঁরা শাস্ত্রের উদার ও শিথিল ব্যাখ্যায় জনচিত্ত আকর্ষণে প্রয়াসী হলেন। সমাজে নতুন মেল-পটী বন্ধনের সাড়াও পড়ে গেল।[১৪৫]

সুফি-দরবেশদের খানকাগুলো বিরাট জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগণিত হতো। এখানেই স্রষ্টা-সন্ধানী মানুষেরা তাদের মনের শান্তি খুঁজে পেত এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হতো। খানকাগুলো ছিল একাধারে চিকিৎসালয় ও আশ্রয়স্থল। শেখ জালাল উদ্দিন তাবরেজি এবং পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সুফি-দরবেশদের প্রতিষ্ঠিত খানকাসমূহের বিরাট আয়ের উৎস ছিল লাখেরাজ জমি। মুসলিম আমলে বাংলাদেশ ছিল শত শত সুফি-দরবেশের কার্যাবলির দৃশ্যস্থল। ফলে বাঙালি মুসলমানগণ তাদের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্য ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের আওতায় আসে। তারা ধর্মের উদার ব্যাখ্যা দান করেন। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে স্থানীয় লোকসংগীতে তাদের মরমি অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকল মতের লোকের মিলনকেন্দ্র ছিল খানকাগুলো। ফলত উভয় শ্রেণির জনগণ একে অন্যের নিকটতর হয় এবং একে অন্যের মতামত বুঝতে পারে। এই উদার পরিবেশে একটি সাংস্কৃতিক মতবাদ 'সত্য পীর' পূজার উদ্ভব হয় এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। সুফি সিদ্ধ পুরুষগণ দেশে যে উদার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, তার ফলে বাংলার হিন্দু সমাজে একটা উদার সংস্কার আন্দোলনের জন্ম সম্ভব হয় এবং এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে নবদ্বীপের শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মে।

---

[১৪৪] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ১৩

[১৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

https://nagorikpathagar.org

সাধু-দরবেশদের সততা ও ব্যক্তিত্ব, মানবতা ও সেবা, প্রীতি ও উদারতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির হিন্দু রাজগণকে আকৃষ্ট করে। তাদের অনেকেই দরবেশদের হাতে ইসলাম কবুল করে। অন্যরা যদিও নিজেদের ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাসকেই রক্ষা করে আসছিল, তথাপি তারা সুফি-দরবেশদের একান্ত ভক্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানায়। তারা পীরপূজা শুরু করে এবং তাদের অন্তরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার মানসে পীরের আশীর্বাদ কামনা করে। এমনকি বহু শতাব্দীব্যাপী হিন্দুরা ভক্তির সঙ্গে সুফি-পীর-দরবেশদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে এবং তাদের আশীর্বাদ লাভের আশায় মাজার শরিফ পরিদর্শন করছে। সংস্কৃত গ্রন্থ শেখ শুভোদয়ার লেখক হলায়ুধ মিশ্র শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজির প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেন। কবি লিখেছেন—লোকেরা রোগমুক্তি, সন্তান কামনা ও সৌভাগ্য লাভের আশায় তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে প্রার্থনা করত।[১৪৬] ড. রহিম বলেন, সুলতানগণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারে নিজেদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করেননি সত্য, কিন্তু তারা পীর-দরবেশদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে উলামা ও ধর্মপ্রচারকদেরকে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় প্রচারমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলিতে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। ধর্মের প্রতি শাসনকর্তাগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় এর উন্নতি বিধানে আগ্রহী ছিলেন। তারা উলামা ও পীর-দরবেশদের যথেষ্ট সম্মান দিতেন এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে তাদের সমর্থন দান করতেন। মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইউয়াজ খলজি সুফি-দরবেশদেরকে বৃত্তি ও ভাতা প্রদানের ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন। সুলতান বলবনের সময়, বাংলার শাসনকর্তা মুগিসুদ্দিন তুঘরিল পীর-দরবেশদের প্রতি এত বেশি অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশদেরকে তিন মণ স্বর্ণ দান করেন।[১৪৭]

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরখান গৌড় জয় করলে বাংলাদেশ আফগানদের অধিকারে চলে যায় এবং মহামতি আকবরের বাংলা বিজয় পর্যন্ত (১৫৩৮-১৫৭৬) আটত্রিশ বছর বাংলা আফগান কর্তৃত্বাধীনে থাকে। বাংলা দখল করে শেরশাহ বিশেষ স্বস্তি পাননি। কেননা, ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দেই শেরশাহের নিযুক্ত গভর্নর খিজির খান বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। ফলে শেরশাহ বাংলায় আগমন করে খিজির খানকে হটিয়ে কাজি ফজিলতকে বাংলার আমির নিযুক্ত করেন।

---

[১৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮

[১৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪২

https://nagorikpathagar.org

শেরশাহ বাংলার শাসনভার একজন শক্তিশালী গভর্নরের হাতে এককভাবে না রেখে বাংলাকে কয়েকটি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করেন। প্রায় ১৯টি সরকারে বাংলাকে বিভক্ত করেছিলেন শেরশাহ। এভাবে শেরশাহ দিল্লি সাম্রাজ্যের এক অতি পুরাতন সমস্যার সমাধান করেন। কাজি ফজিলতকে মূলত প্রশাসনিক ঐক্যের খতিরে আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১৪৮]

শেরখানের মৃত্যুর পর (১৫৪৫) তার পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় বাংলা দিল্লির একটা প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইসলাম শাহ তার পিতার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করে শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ সুরকে বাংলার এবং সুলাইমান কররানিকে বিহারের শাসনকর্তা/গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইসলাম শাহের সময় বাংলায় এক বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহী ছিলেন ঈসা খাঁর পিতা। তার নাম ছিল কালিদাস গজদানি। তিনি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মেয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সুলাইমান নাম গ্রহণ করেন। তবে নলিনীতান্দ ভট্টশালী মতে, কালিদাস গজদানি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলাইমান নাম ধারণ করেন এবং সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের মেয়েকে বিবাহ করেন।

ভট্টশালীর মতে, ১৫৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলাইমান বিদ্রোহ করেন। ইসলাম শাহ সূর ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করলে দিল্লির সূর সাম্রাজ্যেরও পতন শুরু হয়। এ সময় বাংলায় গভর্নর শামস উদ্দিন মুহাম্মাদ গাজি বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর শুরু হয় বাংলার উত্থান-পতনের রাজনীতি। অবশেষে ১৫৬৪ সালে কররানি গোত্রীয় তাজ খান কররানি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে কনৌজের যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার উপহারস্বরূপ তাজ খান ও তার ভাই সুলাইমান খানকে শেরশাহ বাংলা ও বিহারে জায়গির প্রদান করেছিলেন। তাজ খান সুলতান ইসলাম শাহের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন এবং এ সময় সুলাইমান খান বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলার সিংহাসন দখল করার কয়েক মাস পর তাজ খান ইন্তেকাল করলে তার ভাই সুলাইমান কররানি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে বাংলা ও বিহারে কররানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার এবং হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর কর্তৃক উত্তরোত্তর রাজ্য বিস্তারে মূলত বাংলা-বিহারই আফগান শক্তির আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। উত্তর ভারতের সকল আফগান বাংলা-বিহারের দিকে ছুটে আসেন

[১৪৮] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

https://nagorikpathagar.org

এবং সুলাইমানের চাকরি গ্রহণ করেন। ফলে সুলাইমানের অধীনে ৩৬ শত হাতি, ৪০ হাজার অশ্বারোহী, ১৪ হাজার পদাতিক এবং ২০ হাজার কামান ছিল।[১৪৯]

সুলাইমান কররানি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আকবর বাংলা-বিহার বিজয়ের চেষ্টা করেননি। সুলাইমান তার পুত্র বায়েজিদ ও কালাপাহাড় নামক এক ধর্মান্তরিত সেনাপতির নেতৃত্বে উড়িষ্যা দখল করেন। এরপর একটি শক্তিশালী বাহিনী কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে পুরীর জগন্নাথ মন্দির দখলের জন্য প্রেরিত হয়। কালাপাহাড় পুরী দখল করে জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মন্দিরও তিনি ধ্বংস করেন। বহু সোনার মূর্তিসহ অনেক মণ সোনা তারা হস্তগত করে। প্রথমবারের মতো উড়িষ্যা মুসলমানদের অধীনে আসে।[১৫০] উড়িষ্যা বিজয়ের পর সুলাইমান কররানি লোদী খান এবং কতলু খান লোহানিকে উড়িষ্যা ও পুরীতে গভর্নর নিযুক্ত করেন। এরপর সুলাইমান কররানি তার সেনাপতি কালাপাহাড়কে কোচবিহার অধিকার করতে পাঠান। কালাপাহাড়ের বাহিনী তেজপুর পর্যন্ত অধিকার করে এবং কামাখ্যা, হাজো এবং অন্যান্য স্থানের মন্দির ধ্বংস করে ফিরে আসে।[১৫১]

সুলাইমান কররানি দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ সারা বাংলা এবং বিহারের অধীশ্বর ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম গৌড় ও পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে তান্ডায় রাজধানী স্থাপন করেন। সুলাইমান কররানির মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে দলাদলি ও হত্যাকাণ্ড শুরু হলে মোগল সম্রাট আকবর সেনাপতি মুনিম খানকে আফগান রাজ আক্রমণ করার আদেশ দেন। অথচ এ সময়ও কররানি বংশের শেষ শাসক দাউদ খান কররানির অধীনে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৩৩০০ হাতি, ১,৪০,০০০ গোলন্দাজ, বিপুলসংখ্যক তিরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্য, ২০,০০০ কামান-বন্দুক এবং অনেক সুসজ্জিত রণপোত ছিল।[১৫২] তুকারায়ের প্রান্তরে পরাজিত হয়ে দাউদ খান মোগলদের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং মোগল সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসন করার ভারপ্রাপ্ত হন। তবে অনেক আফগানই এই চুক্তি গ্রহণ না করে মোগলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুনীম খান ইন্তেকাল করলে আফগানরা দ্বিগুণ উৎসাহে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। দাউদ খানও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রি.) দাউদ খান পরাজিত হলে তার ছিন্ন মস্তিষ্ক আকবরের নিকট প্রেরণ করা হয়।[১৫৩]

---

[১৪৯] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

[১৫০] শ্রী রমেশচন্দ্র মুজমদার, পৃ. ১২৫

[১৫১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

[১৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

[১৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯-৪০০

https://nagorikpathagar.org

বাংলায় মোগল শাসনের সূত্রপাত হয় এবং খানজাহান মোগল প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। খানজাহান তান্ডায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সপ্তগ্রাম (পশ্চিম বাংলা) ও ঘোড়াঘাট (উত্তর বাংলা) অঞ্চল দখল করেন। এ সময় মোগল শাসন বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে খানজাহান মারা গেলে তার ভাই ইসমাইল কুলি অস্থায়ীভাবে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মুজাফফর খান তুরবাতি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তুরবাতির শাসনামলে বাংলা ও বিহারে মোগল কর্মচারী, জায়গিরদার ও সৈন্যদের মধ্যে এক মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা মুজাফফর খানকে হত্যা করে তান্ডা দখল করে। তারা বিদ্রোহী নেতা মির্জা হাকিমকে সম্রাট, মাসুদ খানকে প্রধানমন্ত্রী এবং বাবা খান কাকশালকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। বাংলা ও বিহার মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং আফগান ও পাঠানরা আবার উড়িষ্যা দখল করেন। তবে দুই বছরের মধ্যে মোগলরা এই বিদ্রোহ দমন করে এবং আকবরের দুধভাই খান আজম মির্জা আজিজ কোকা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এসব ঘটনায় প্রমাণিত হয়, পুরো বাংলা এ সময় আফগান, পাঠান ও মোগলদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খান নতুন গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি উৎকোচ প্রদান করে বহু পাঠান বিদ্রোহীকে নিরস্ত্র করেন।

১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫৪] এ সময় 'বারোভুঁইয়া' হিসেবে বিখ্যাত বাংলার জমিদাররা মোগল আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। বারোভুঁইয়াদের অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন[১৫৫] এবং এদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের জমিদার ঈসা খান ও তার পুত্র মুসা খান।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় আফগান শাসনের অবসানের পর অনেক পাঠান সর্দার বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং কোনো কোনো অঞ্চল দখল করে স্বাধীন জমিদারির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৫৬] ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন। মানসিংহ তান্ডা থেকে অল্প দূরে

---

[১৫৪] শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[১৫৫] শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[১৫৬] *আকবর নামা*'য় বর্ণিত ভাটির ভুঁইয়াগণ : ইব্রাহিম নারান, করিম দাদ মুসাজাই, ঈসা খান, মজলিশ দিলাস্তর, মজলিশ প্রতাপ, কেদার রায়, শের খান, বাহাদুর গাজী, মির্জা মুমিন, চাঁদ গাজী, সুলতান গাজী, সেলিম গাজী, কাসিম গাজী। মির্জা নাথানের *বাহরিস্তান-ই-গায়বি*'তে বারোভুঁইয়া : মুসা খান মসনদ-ই-আলা, আলাউল খান, আবদুল্লাহ খান, মাহমুদ খান, বাহাদুর গাজী, সোনা গাজী, আনওয়ার গাজী, শাইখ পীর, মির্জা মুমিন, মাধব রায়, বিনোদ রায়, পাহলোয়ান, হাজী শামস উদ্দিন বাগদাদি।

https://nagorikpathagar.org

রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। ঈসা খান মানসিংহের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। পুত্র হিম্মত সিংহ ও দুর্জন সিংহ মারা গেলে মানসিংহ ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আজমির গমন করেন। অতিরিক্ত মদপানের ফলে মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহ ইন্তেকাল করলে তার বালক পুত্র মহাসিংহ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এ সুযোগে পাঠানরা আবার বিদ্রোহী হয় এবং একাধিকবার মোগল সৈন্যদের পরাজিত করে।

এই সমুদয় বিপর্যয়ের পর মানসিংহ ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে আবার বাংলায় ফিরে আসেন। তার নিকট পূর্ববঙ্গের জমিদাররা পরাজিত হয়। মানসিংহ আরাকানের মগ জলদস্যুদেরও পরাস্ত করেন। ১৬০৬ সালে কুতুব উদ্দিন কোকা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। কিন্তু এক বছর পর তিনিও ইন্তেকাল করলে ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। বাংলার বারোভুঁইয়াদের দমন করে এ প্রদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্বপূর্ণ কার্য। সুবেদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) এই কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করেন। তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর।

বারোভুঁইয়াদের দলপতি মুসা খান ইসলাম খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তাকে তার জমিদারি জায়গিরস্বরূপ দান করেন। মুসা খান সম্রাটের আনুগত্য মেনে নেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে মোগলদের সাহায্য করেন। এরপর অন্যান্য জমিদাররাও মোগল বশ্যতা স্বীকার করেন। ইসলাম খানের মৃত্যুর পর কাশিম খান (১৬১৪-১৭ খ্রি.) বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তার সময়ে বাংলার মোগল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলা থেকে কাশিম খানকে প্রত্যাহার করে নেন এবং সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভ্রাতা ইবরাহিম খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে। এর পূর্বে ইবরাহিম খান বিহারের গভর্নর ছিলেন। ইবরাহিম খানের সময় অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল বিদ্রোহ দমনের জন্য।[১৫৭] এই ইবরাহিম খান বিদ্রোহী রাজপুত্র শাহজাহানের সাথে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং শাহজাহান রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন (এপ্রিল, ১৬২৪ খ্রি.)। কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে শাহজাহান (অক্টোবর, ১৬২৪ খ্রি.) দাক্ষিণাত্যের দিকে চলে যান। এর চার বছর পর তিনি মোগল সম্রাট হয়েছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণ (১৬২৮ খ্রি.) থেকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রি.) বাংলায়

[১৫৭] ডক্টর মুহাম্মাদ মোহর আলী, *মুঘল আমলে বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (১৬১৪-১৭৫৭), অনু. মুহাম্মাদ সিরাজ মান্নান (ঢাকা : মেধা বিকাশ, ২০১৭), পৃ. ২৩

https://nagorikpathagar.org

মোগল শাসন মোটামুটি শান্তিতেই পরিচালিত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন সুবেদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শাহজাহানের পুত্র সুজা (১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রি.), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রি.) এবং আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শান (১৬৯৮-১৭০৭ খ্রি.)।

এ যুগে বাংলার কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ১৭০৩ সালের ২১ জানুয়ারি শাহজাদা আজিম-উশ-শানকে বিহারেরও সুবেদারি প্রদান করা হয়। ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষে অথবা ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে যান। আরেক শাহজাদা ফাররুখ সিয়ার ঢাকায় সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলি খানের কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় তার জামাতা সুজা উদ্দিন মুহাম্মাদ খান মুর্শিদকুলির দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানকে না মেনে নিজেই বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদারের পদে অধিষ্ঠিত হন (১৭২৭ খ্রি.)। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলাকে দুই ভাগ করে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শাসনভার নিজের হাতে রাখেন; পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলায় অবশিষ্ট অংশের জন্য ঢাকায় একজন এবং বিহার ও উড়িষ্যা শাসনের জন্য আরও দুজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। আলিবর্দি খান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হন। ১৭৩৯ সালে সুজা উদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন। এই অযোগ্য নবাবকে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল গিরিয়াতে পরাজিত ও হত্যা করে আলিবর্দি মুর্শিদাবাদ দখল করেন। ১৭৫৬ সালের ৬ এপ্রিল তার মৃত্যু হলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব নিযুক্ত হন।

https://nagorikpathagar.org

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ

সাধারণভাবে মনে করা হয় বাংলার মাটি নবীন; তাই এখানকার মানববসতি খুব প্রাচীন নয়। তবে লালমাই, মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমি গঠনের ঐতিহ্য হাজার-লক্ষ বছরের। বিশ্ব ইতিহাসে মানবসভ্যতার প্রাচীনত্ব অনধিক ৭-৮ হাজার বছর। কিন্তু প্রাচীনতম মানব-জীবাশ্মের বয়স প্রায় ১৮ লক্ষ বছর। বাংলাদেশের লালমাই চাকলাপুঞ্জি অঞ্চলে উচ্চ পুরোপলীয় (১৮০০০-২২০০০ বছর) যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এ দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে নবোপলীয় যুগেরও হাতিয়ার। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতার পর (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পূর্ব) উপমহাদেশের আর কোথাও নগর সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। আনুমানিক সাত-ছয় খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে আরেকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে, যা দ্বিতীয় নগর সভ্যতা হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বর ও মহাস্থানগড় দ্বিতীয় নগর সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। অপ্রতুল গবেষণা দ্বিতীয় নগর সভ্যতার অনেক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে অজ্ঞাত করে রেখেছে। তবে মৌর্য যুগ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস মোটামুটিভাবে গোচরীভূত। গুপ্ত যুগ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের রাজনৈতিক দিকও অনেকটা স্পষ্ট। এই সময়কালে বাংলাদেশ কখনো স্বাধীনভাবে অথবা উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রাক-মধ্যযুগের অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, মন্দির বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাসে বাংলাদেশকে জায়গা করে দিয়েছে। পাল আমলের যেসব স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলোই ধর্মীয়। ধর্মনিরপেক্ষ অবকাঠামো প্রায় অনুপস্থিত। পাহাড়পুড়, মহাস্থানগড়, নালন্দা, পাটালিপুত্রের স্থাপত্য নিদর্শনগুলো থেকে এসব অঞ্চলে পাল সামসময়িক সময়ে মানববসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। পাল বংশীয় রাজা ধর্মপাল কর্তৃক নওগাঁর 'সোমপুর বিহার' এ অঞ্চলে পাল নিদর্শনের অন্যতম চিহ্ন। ধর্মপালের আরেকটি কীর্তি বিহারের ভাগলপুর জেলার বিক্রমশিলা মহাবিহার। বিহারের নালন্দা বিহারও পাল সময়ের বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি নিদর্শন। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার সীতাকোটে বৌদ্ধ বিহার আরেকটি ধর্মীয় নিদর্শন।

বারো শতকের শেষ দিকে বিজয় সেনের (১০৯৭-১১৬০/১০৯৫-১১৬৮ খ্রি.) মাধ্যমে সূচনা ঘটে সেন শাসনের। দাক্ষিণাত্যের কর্নাটক থেকে আসা এ বংশটি

https://nagorikpathagar.org

এক শতকেরও বেশি সময় ধরে (১০৯৭-১২২৩ খ্রি.) পাঁচ প্রজন্ম ধরে সমগ্র বাংলা অঞ্চলে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। এ সময়ের তেমন কোনো স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে সেন আমলে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। অথবা পুরুষানুক্রমিকভাবে স্থপতিরা নির্মাণ এবং অলংকরণের যেসব দক্ষতা ও প্রযুক্তি অর্জন করেছিলেন; সেসবও রাতারাতি লোপ পেয়েছিল, তাও নয়। অন্তত একটি বড়ো নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ এখনও গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মাঝামাঝি বর্তমান মালদা রেলস্টেশনের মাইল দুয়েক পশ্চিমে টিকে আছে।

আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে, এটি বল্লালসেনের প্রাসাদ বলে পরিচিত। তা ছাড়া এ সময়ে যে অনেক মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল, তারও কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে।[১৫৮] স্তূপ এবং বিহারের মতো প্রাক-মুসলিম যুগের কোনো মন্দিরই তার ঊর্ধ্বাংশসহ বাংলাদেশে আজ বিদ্যমান নেই। সুতরাং মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা পাই, তার অধিকাংশই পশ্চিম বাংলার কতিপয় বিদ্যমান উদাহরণ থেকে। এই বিদ্যমান উদাহরণসমূহ একাদশ শতক এবং তার পরবর্তী সময়ের।[১৫৯]

বাংলা বিজয়ের পর প্রথম শতাব্দীতেই ২৫ জন সুলতান বাংলার ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন। এ শাসকদের প্রত্যেকেই মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, মাজার, দরগা নির্মাণ করেছিলেন; যদিও-বা উপকরণ ও পরিবেশের কারণে এগুলো দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। সেকালের সবচেয়ে পুরোনো স্থাপত্যের যে নমুনা ৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে ছিল, তা হলো হুগলির ত্রিবেণীতে নির্মিত (১২৯৮ খ্রি.) জাফর খানের মসজিদ এবং ছোট্ট পাণ্ডুয়ার একটি মিনার।[১৬০] গোলাম মুরশিদ বলেন, স্থাপত্যের দিক দিয়ে এতে কোনো অভিনবত্ব ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের স্টাইলের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় স্টাইলের মিলন ঘটিয়ে দিল্লিতে যেসব মসজিদ তৈরি হয়েছিল, এ ছিল তারই আদলে নির্মিত। কিন্তু বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনব ছিল গম্বুজ ও আর্চওয়ালা এই বিশেষ ধরনের স্থাপত্য। এ মসজিদের নির্মাণকর্মীরা ছিল এ দেশীয় এবং এর অলংকরণে যথেষ্ট দেশীয় প্রভাব বিদ্যমান। কেবল মিহরাব বা গম্বুজ নয়, এই মসজিদের সঙ্গে বঙ্গের স্থাপত্যে আরও যা নতুন এলো, তা হলো খিলান। তারা গম্বুজ ও আর্চের সঙ্গে এনেছিল মিনার ও ভল্ট। তখনকার মুসলিম স্থাপত্যের অন্য যে দুটি নমুনা রক্ষা

---

[১৫৮] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

[১৫৯] *স্থাপত্য*, সম্পাদক : এ. বি. এম. হোসেন (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৩১

[১৬০] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

https://nagorikpathagar.org

পেয়েছে, তা হলো ছোটো পাণ্ডুয়ার মিনার এবং মিনারের অদূরের বড়ি মসজিদ। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এই মিনার আদৌ অভিনব ছিল না। আফগানিস্তান ও দিল্লিতে এ রকমের মিনার আগেই নির্মিত হয়েছিল। বস্তুত বিশালত্বের দিক দিয়ে কুতুব মিনারের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু তখনকার বঙ্গদেশে এ রকমের উঁচু এবং চোখে পড়ার মতো কোনো নির্মাণ ছিল না। এর উচ্চতা প্রায় ১২৫ ফুট। পাঁচটি ধাপে বিভক্ত হয়ে এটি ক্রমশ সরু হয়েছে। গোড়ার ব্যাস ৬০ ফুট আর ওপরের সোপানের ব্যাস ১২ ফুট। এর ভেতর দিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে। এই মিনার নির্মিত হওয়ার ২০০ বছর পর গৌড়ে ফিরোজ মিনার নির্মিত হয়। ফিরোজ মিনার উচ্চতায় ছোটো হলেও (৮৪ ফুট) কারুকার্যের দিক থেকে এটি ছিল অনেক উন্নতমানের।[১৬১]

বাংলা বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজি মসজি, মাদরাসা ও দরবেশগণের জন্য সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং লখনৌতিকে তার প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।[১৬২] তিনি দেবকোটে 'দমদমা' দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন।[১৬৩] গৌড়কে কেন্দ্র করে মুসলমানদের প্রাথমিক জনবসতি বরেন্দ্র অঞ্চলে গড়ে ওঠে। ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিবেণীসহ সাতগাঁও ও পাণ্ডুয়া জনবসতির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজির সমাধি ও মসজিদ (১২৯৮ খ্রি.), সাতগাঁও-এ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, ছোটো পাণ্ডুয়ার দরগা, শাহ সুফির সমাধি, বারী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, মিনারসহ বিভিন্ন স্থাপত্য ধ্বংসাবশেষ, হুগলির মোল্লা সিমলার মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.) মানববসতির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে।[১৬৪]

এম. আবিদ আলী খান বলেন, গৌড় নগরী একটি সুউচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ছিল। দেওয়াল বা বাঁধের শীর্ষদেশ অট্টালিকায় আবৃত ছিল। শহরের অভ্যন্তরে অগণিত অট্টালিকা ছিল।[১৬৫] তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য নিদর্শনের খুব সামান্যই আজ বিদ্যমান।

বাংলার সুলতানি আমলের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন ইমারত খুব কমই দৃষ্ট হয়—যেখানে স্তম্ভ, তির, সর্দল, দরজা-জানালার চৌকাঠ, অলংকরণ প্যানেল,

---

[১৬১] প্রাগুক্ত, গোলাম মুরশিদ, পৃ. ৪

[১৬২] এম. আবিদ আলী খান মালদহী, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি কথা*, অনু. অধ্যাপক কাজী মো: শহীদুল হক ও অন্যান্য (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩

[১৬৩] স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[১৬৪] *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, সম্পাদক : সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৪৮

[১৬৫] এম. আবিদ আলী খান মালদহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

https://nagorikpathagar.org

এমনকি মিহরাত অবশিষ্ট নেই। তাই দিল্লির সালতানাতের ওপর নির্ভরশীল শাসকদের (১২০৪-১৩৩৯ খ্রি.) তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন নেই। গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজি (১২১২-১২২৭) বসনকোর্ট দুর্গ, দুর্গাভ্যন্তরে একটি জামে মসজিদ, লখনৌতিতে একটি সুন্দর মসজিদ, একটি মাদরাসা ও একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। সোনারগাঁওয়ের অদূরে সুলতান গিয়াস উদ্দিনের (১২৬৬ খ্রি.) উপ-প্রাদেশিক নায়েব তুঘরিল তুগান খান 'কিলাই তুঘরিল' নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুর্গটি 'নারকিলা' নামেও উল্লিখিত হয়ে থাকে। দুর্গ নির্মাণ করে তুঘরিল নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দেন। পরবর্তী সময়ে দুর্গটি প্রতিরক্ষা সীমান্তচৌকি হিসেবে কার্যকর ছিল। কিলাই তুঘরিলকে বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম যুগের উল্লেখযোগ্য 'মাহি দুর্গ' বলে উল্লেখ করা যায়।[১৬৬] ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২) পাণ্ডুয়ানগরসহ বেশ কিছু স্থাপনা নির্মাণ করেন। প্রাথমিক যুগের খানকা, মসজিদ ও মাদরাসাসমূহ ক্ষণস্থায়ী নির্মাণ উপাদান ও পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল বলে এগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এজন্যই এ যুগের স্থাপত্যের দেখা মেলেনি।[১৬৭]

ইলিয়াস শাহি বংশের শাসনামলে (১৩৪২-১৪২২ খ্রি.) বাংলায় বেশ কিছু স্থাপত্য নির্মিত হয়। আদিনা জামে মসজিদ এ যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রাজধানী শহর পাণ্ডুয়ায় নির্মিত আদিনা জামে মসজিদ সুলতান সিকান্দার শাহের গৌরবময় এক অনন্য কীর্তি। তিনি পাণ্ডুয়া ও লখনৌতিতে আরও ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। শুক্রবারের জুম্মা মসজিদ হিসেবে পরিচিত আদিনা মসজিদ শুধু বাংলা নয়, মধ্যযুগের ভারতের সর্ববৃহৎ মসজিদ।

১৩৭৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত মসজিদটি বাংলাদেশে আরব নকশা মসজিদের অনুকরণে নির্মিত একমাত্র উদাহরণ। কিবলা প্রান্তে নামাজ ঘর (জুল্লাহ), নামাজ গৃহের সম্মুখে উন্মুক্ত চত্বর (সাহন) এবং তিন দিকে বেষ্টিত বারান্দা (রিওয়াক)-সংবলিত মসজিদটি আয়তাকার পরিসরে নির্মিত। মসজিদটিতে পারসিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। এটি আকৃতিগতভাবে দামেশক জামে মসজিদ ও ইস্পাহান জামে মসজিদের সঙ্গে তুলনীয়। মসজিদটি ইট নির্মিত, তবে দেওয়ালের নিম্নার্ধ পাথরের ব্লক দ্বারা আবৃত। পরিষদবর্গসহ সুলতানের নিরাপত্তার জন্য মাকসুরা (রাজকীয় গ্যালারি) নির্মিত হয়েছে মসজিদটির অভ্যন্তরে। এই বিশাল স্থাপত্যকর্মটির সমকক্ষ কোনো উদাহরণ আগে অথবা পরে কখনো সুলতানি বাংলায় পরিলক্ষিত হয়নি।[১৬৮] গোলাম মুরশিদ বলেন—

---

[১৬৬] স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[১৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

[১৬৮] স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৯

https://nagorikpathagar.org

> বিশালত্বের দিক দিয়ে বৌদ্ধ বিহারগুলোর পরে বঙ্গদেশের স্থাপত্যে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ভবন হলো আদিনা মসজিদ। আদিনা মসজিদের স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, তাও ছিল নতুন। সিকান্দার শাহ এই স্টাইল এনেছিলেন পারস্য থেকে। তিনি এর সাথে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এর দেওয়ালের গায়ে যেসব কুলঙ্গি এবং অলংকরণের জন্যে যেসব পোড়ামাটির কাজ আছে, তা পাল আমলের ঐতিহ্য। এই পোড়ামাটির অলংকরণে পদ্ম ফুল ছাড়াও ঝোলানো বাতিদান ও ঝোলানো পদ্মা পাপড়ি ছিল।[১৬৯]

কেবল আকার-আয়তনে নয়, নকশা ও অলংকরণের দিক দিয়েও আদিনা জামে মসজিদ বিশ্বমানের। সম্মুখভাগের মিহরাবগুলো সুলসরীতির ক্যালিওগ্রাফিতে অলংকৃত। উদ্ভিজ্জ নকশা, গোলাপাকৃতির ফুলের নকশা, বিমূর্ত অ্যারাবিক নকশা, জ্যামিতিক নকশা, খাঁটি ইসলামিক নকশা মসজিদটিকে অনন্য অবস্থানে উত্তীর্ণ করেছে। পলকাটা স্তম্ভ, সামনের দিকের খোদাইকৃত কারুকাজ, অলংকৃত টালি ও হস্তরেখা সমৃদ্ধ শিলালেখ মসজিদটিকে সমৃদ্ধ করেছে। মহাস্থানগড়ের মানকালির ভিটা মসজিদ, পাবনার শাহজাদপুরের জামে মসজিদ, সোনারগাঁওয়ের মুয়াজ্জেমপুর শাহি মসজিদ আদিনা মসজিদ নির্মাণকালের সামসময়িক মসজিদ স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রাজা গণেশের বংশধর হিসেবে পরিচিত সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি এখানে একটি মসজিদ, দুটি পুকুর এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। সেগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে ঢাকার মোয়াজ্জেমপুরের বিদ্যমান মাঝারি আকৃতির জামে মসজিদটি তারই কীর্তি বলে অনুমিত। তিনি নিজের সমাধি নির্মাণ করেছিলেন, যা একলাখী সমাধি নামে পরিচিত। এটি বাংলার প্রারম্ভিক সমাধিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত। এই স্থাপত্যে বক্রাকার ছাদ, কার্নিশসহ বাঁশের খুঁটির অনুকরণে বুরুজ বাংলার পরবর্তী মুসলিম স্থাপত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলার খড়ের ঘরের বক্রাকার কার্নিশ ও কোনার বাঁশের খুঁটি ইট স্থাপত্যে রূপান্তরিত হয়ে স্থাপত্যকর্মে মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন আঙ্গিকে বাংলায় সাংস্কৃতিক সত্তা বিকাশে স্বদেশি উপকরণ আত্মীকরণ প্রক্রিয়ায় এটি বেশ বড়ো ধরনের অবদান রাখে।[১৭০] এর গায়ে ছিল কুলুঙ্গি, পোড়ামাটির ফলক এবং মিনা করা টাইল।

---

[১৬৯] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪-৪০৫

[১৭০] *স্থাপত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

https://nagorikpathagar.org

বঙ্গীয় স্থাপত্যে জালাল উদ্দিনের একলাখী একটি অসাধারণ মাইলফলক। পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও এই স্টাইলে দু-চারটি মন্দির তৈরি হয়েছিল। খানজাহান আলির সমাধিতেও এর প্রভাব দেখা যায়।[১৭১] একলাখীর সাথে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, এমন মসজিদগুলো হলো—শাহ সফিউল্লাহ মসজিদ (১৪৭৭ খ্রি.), গৌড়ের চিকা মসজিদ, বর্ধমানের রহমান সাক্কার মাজার (১৫৬২ খ্রি.), বাগেরহাটের সিংরা মসজিদ, বিবি বেগমি মসজিদ, রণবিজয় মসজিদ, জিন্দাপীর মসজিদ, চুনখোলার মসজিদ, সোনারগাঁওয়ের গোয়ালদি মসজিদ, গারসিন্দুরের সাদী মসজিদ, যশোরের গোরাই ও টেঙ্গা মসজিদ, ঢাকার তারা বেগমের মসজিদ। এগুলো এই মসজিদের মতোই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান অথবা প্রায় সমান। চার কোনায় চারটি মিনার, ছাদে একটি বড়ো গম্বুজ এবং কার্নিশ বাঁকানো। একলাখী স্টাইলের প্রথম মসজিদ হলো ১৪৭৫ সালে নির্মিত গৌড়ের চামকাটি মসজিদ। চামকাটি মসজিদটিতে একলাখীর মতো একটি বিরাট গম্বুজ এবং বারান্দার ওপরে ছিল আরও তিনটি গম্বুজ। লত্তন (লট্টন) মসজিদেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। পরে চামকাটি ও লত্তন মসজিদের আদলে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো মসজিদ তৈরি হয়েছিল। গৌড়ের গুণমন্ত ও খানিয়াদিঘি মসজিদ, দিনাজপুর সুরা মসজিদ এবং টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ তার মধ্যে অন্যতম।

পুনঃস্থাপিত ইলিয়াস শাহি বংশের পঞ্চাশ বছরের (১৪৩৬-১৪৮৭) শাসনামল বাংলার ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধশালী যুগ। এই বংশের পুনরুদ্ধারকারী শাসক মাহমুদ শাহ গৌড়ে রাজধানী পুনঃস্থাপন করেন। তিনি রাজধানী সুসজ্জিত করেছিলেন বেশ কিছু ইমারত দিয়ে। পঞ্চ খিলানবিশিষ্ট সেতু, কোতোয়ালি দরজা এবং বৃহদাকৃতির দুর্গ প্রাচীরের অংশবিশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ইলিয়াস শাহ নির্মাণ করেছিলেন বিশালাকার একডালা দুর্গ। রাজপরিবার, সভাসদ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের পরিবার ছাড়াও বিশাল সৈন্যবাহিনী স্থায়ীভাবে বসবাস করত এই দুর্গে। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৯২-১৪১০) বুড়িগঙ্গার তীরে অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য করে নির্মাণ করেছিলেন কেল্লা মোবারকবাদ দুর্গ। মোগল আমলের টিকে থাকা লৌকিক ভবনের সংখ্যা সুলতানি আমলের লৌকিক ভবনের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। বাংলার মোগল আমলের স্থাপত্য, দুর্গ ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুলতানি স্থাপত্য থেকে ভিন্ন রীতির।

সুলতানি বাংলা ছিল স্বাধীন আর মোগল বাংলা ছিল উত্তর-ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ। তাই সুলতানি দুর্গ ছিল শক্তিশালী ও শৌর্য-বীর্যপূর্ণ। সেই তুলনায়

---

[১৭১] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

https://nagorikpathagar.org

মোগল দুর্গগুলো ছিল দুর্বল, বিলাসবহুল, শৈল্পিক ও আকর্ষণীয়। এগুলো ইট দিয়ে নির্মিত ছিল বিধায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তা ছাড়া অনেক দুর্গ নদী ভাঙনের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মোগল দুর্গের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এর সমান্তরাল বেষ্টনী দেওয়ালের শীর্ষদেশে প্রতিরক্ষা ফোকরযুক্ত শীর্ষ প্যারাপিট। প্রবেশপথ কোণের বুরুজ এবং সংযুক্ত স্তম্ভের শীর্ষচূড়া ছত্রী দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রবেশ ফটকের অভ্যন্তরে ভল্ট লজেন্স নকশায় অলংকৃত এবং এ বৈশিষ্ট্যও পারসিক 'মুকারনাস' (মৌচাক) নকশা দ্বারা প্রভাবিত। এই মৌচাক নকশা মোগল স্থাপত্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অলংকরণ হিসেবে ইসলামি স্থাপত্যশিল্পে পরিগণিত।

মোগল আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ দুর্গ হলো ঢাকাস্থ লালবাগ দুর্গ। তবে সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মোগল দুর্গ রাজমহল নির্মিত হয় ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। গৌড় ও তান্ডার মোগলদের জন্য সুবিধাজনক স্থান বিবেচিত না হওয়ায় তারা রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করে এর নামকরণ করে আকবরনগর। এই নতুন রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্য দুর্গটি নির্মাণ করা হয়। রাজমহল দুর্গটির সাথে ফতেপুর সিক্রির প্রবেশ তোরণ ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা স্থাপনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শাহজাদা সুজা গৌড় প্রাসাদ দুর্গের প্রবেশ ফটক হিসেবে লুকোচুরি দরজা নির্মাণ করেন। এই দরজা একমাত্র মোগল প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিদ্যমান তোরণ নিদর্শন বলে পরিগণিত। স্থাপত্য রীতির দিক দিয়ে এটি মোগল রীতির অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে সুলতানি আমলে নির্মিত প্রবেশ ফটকের সাথেও এর কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। দরজাটি ইট নির্মিত এবং আয়তাকৃতির। সম্পূর্ণ তোরণ ভবনটি পলেস্তারায় আবৃত এবং খোপ ও মৌচাক নকশায় অলংকৃত।

লালবাগ দুর্গে মোগল দুর্গের প্রকৃতি ও প্রতিরক্ষা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দুর্গটি নির্মাণ করেন গভর্নর যুবরাজ মুহাম্মাদ আজম ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু পরের বছর পিতা আওরঙ্গজেবের ডাকে তিনি দিল্লি গমন করেন। পরবর্তী গভর্নর শায়েস্তা খান ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বাস করেন এবং কন্যা বিবি পরির মৃত্যুর পর দুর্গ ছেড়ে চলে যান। লালবাগ দুর্গের বিপরীত দিকে সুবেদার নওয়াব ইবরাহিম খান (১৬৮৯-৯৭ খ্রি.) নির্মাণ করেন জিনজিরা দুর্গ। প্রতিরক্ষা-সংবলিত প্রাসাদ, বিস্তৃত হাম্মাম কমপ্লেক্স, প্রহরীকক্ষ যুক্ত প্রবেশপথ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে একে প্রাসাদ দুর্গ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অনেকেই। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদ দুর্গ (১৭১৬ খ্রি.), হাজিগঞ্জ দুর্গ (ঢাকা, ১৬০৮ খ্রি.), সোনাকান্দা, দুর্গ (নারায়ণগঞ্জ, সতেরো শতকের মধ্যভাগ), ইদ্রাকপুর (মুন্সিগঞ্জ) সেলিমগড় দুর্গ (বগুড়া, ১৫৯৫ খ্রি.), ঘোড়াঘাট দুর্গ (দিনাজপুর, ১৭৪০-৪১ খ্রি.) প্রভৃতি মোগল আমলে নির্মিত উল্লেখযোগ্য দুর্গ।

https://nagorikpathagar.org

সুলতানি স্থাপত্য

দাখিল দরজা : গৌড়-লখনৌতি নগরের উত্তর দিকের দরজা দাখিল দরজা নামে অভিহিত। 'চান্দ দরজা' ও 'নিম দরজা' নামে আরও দুটি দরজা ছিল, যা দিয়ে মূল ভবনে প্রবেশ করা যেত। তবে দাখিল দরজাটাই তুলনামূলক বৃহৎ এবং শক্তিশালী। এটি সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত বলে অনুমিত। তবে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নির্মিত প্রবেশপথের ওপর নির্মিত হয়েছিল দাখিল দরজা। দরজাটি নির্মাণ উপকরণ ইট এবং নিচ থেকে খিলান পর্যন্ত পাথরে আবৃত। দাখিল দরজার খিলাল 'ইওয়ান' রীতিতে নির্মিত এবং উভয় প্রান্তে রয়েছে বিশাল দ্বাদশ ভুজাকৃতির বুরুজ। সুলতান রুকুন উদ্দিন বাবরক শাহ (১৪৫৯-৭৪) নির্মাণ করেছিলেন চান্দ দরজা ও নিম দরজা। আকৃতি ও নকশা দাখিল দরজার অনুরূপ হলেও এগুলো অতটা মজবুত ছিল না।

গুমতি দরজা : গৌড়ের প্রাসাদ নির্মাতা সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলে নির্মিত হয় গুমতি দরজা। এই দরজাতে টেরাকোটার ব্যবহার হয়েছে। এটি আলাই দরজার অনুকরণে নির্মিত বলে অনেকে মনে করেন।

কোতওয়ালি দরজা : কোতওয়ালি দরজার উচ্চতা ৯.১৫ মিটার এবং প্রশস্ত ৫.১০ মিটার।

গুণমানত মসজিদ : লখনৌতি শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ গুণমানত মসজিদ। মসজিদটি আদিনা জামে মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। গৌড়-লখনৌতি শহরের দুর্গ নির্মাতা নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির বাহ্যিক আয়তন ৪২.৫ মিটার × ১৮ মিটার। ইটে নির্মিত মসজিদটির গাত্র শুরুতে খিলান পর্যন্ত পাথরের ব্লক দ্বারা আবৃত ছিল। মসজিদটির সম্মুখভাগে একটি বারান্দা, তিনটি মিহরাব এবং ওপরে ২৪টি গম্বুজ ছিল। মসজিদটি পোড়ামাটির ফলক এবং পাথরে খোদাই করা নকশায় সজ্জিত ছিল। সম্ভবত সুলতান এখানেই নামাজ আদায় করতেন।

ষাট গম্বুজ মসজিদ : দক্ষিণবঙ্গের অত্যন্ত প্রভাবশালী পীর-যোদ্ধা খানজাহান আলি ১৪৫৯ সালে নিজের মৃত্যুর পূর্বেই নির্মাণ করেছিলেন বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। হজরত পাণ্ডুয়াস্থ আদিনা মসজিদের পরই এটি হলো বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। এগারোটি বে এবং সাতটি গলিপথে বিভক্ত মসজিদটির উত্তর-দক্ষিণে সাতটি করে দরজা এবং পূর্ব দিকে ১১টি দরজা রয়েছে। নামে ষাট গম্বুজ মসজিদ হলেও এগারো সারিতে ৭টি করে মোট ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদটিতে মিহরাবের সংখ্যা ১০টি। মসজিদ অভ্যন্তরে উত্তর পশ্চিম কোণে কোনো মাকসুরা (নিরাপত্তা বেষ্টনী) নেই। সুলতানি বাংলার

https://nagorikpathagar.org

মসজিদ স্থাপত্যে এটি একটি বিশেষ পরিবর্তন, যা প্রাথমিক খিলাফত যুগের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এ মসজিদের গোলায়িত কর্নার বুরুজও নতুন বিশেষত্ব। কয়েক দশক ধরে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও বরিশালে যেসব মসজিদ তৈরি হয়েছিল, তার অনেকগুলো মসজিদে এই ষাট গম্বুজ মসজিদের প্রভাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে বাগেরহাটের নয় গম্বুজ ও দশ গম্বুজ মসজিদ, খুলনার কুড়ের মসজিদ, শৈলকূপার মসজিদ, মসজিদ বাড়ির মসজিদ এবং হাম্মাদ মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

দরসবাড়ি মসজিদ : পুনঃস্থাপিত ইলিয়াস শাহি বংশের শাসক সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন দরসবাড়ি মসজিদ। এটি গৌড়-লখনৌতির তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটি ইটের তৈরি। মসজিদটিতে ছয়টি অষ্টভুজাকৃতি পাথরের কর্নার বুরুজ রয়েছে। মসজিদটিতে চারটি চৌচালা ভোল্ট এবং চব্বিশটি ছোটো গম্বুজ রয়েছে। এটির পূর্ব দিকে সাতটি কৌণিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে এবং প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেওয়ালে ৭টি মিহরাব এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবের দু-পাশে দুটি মিহরাবসহ মোট ৯টি মিহরাব রয়েছে। মসজিদটিতে ইটের তৈরি আয়তাকৃতির স্তম্ভ এবং পাথরের তৈরি গোলায়িত স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের ভেতরে গ্যালারি রয়েছে। গ্যালারিটি সম্ভবত একসময় রেলিং বা যুক্ত পাথরের পর্দা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোনায় বাইরে স্থাপিত একটি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে গ্যালারিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা ছিল। পোড়ামাটির নকশায় মসজিদটি অলংকৃত ছিল। পর্যায়ক্রমে কোনাকুনি ও চ্যাপ্টাভাবে ইটের সারি ধাপে ধাপে বসিয়ে এক অভিনব নকশা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা ছিল একান্তভাবেই দেশি রীতি। এই মসজিদটি ছিল গৌড়-লখনৌতির সবচেয়ে সুন্দর মসজিদগুলোর অন্যতম, যা বর্তমানে লয়প্রাপ্ত।

তাঁতিপাড়া মসজিদ : সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে খান-ই-আজম, খান-ই-মুয়াজ্জাম, মিরশাদ আলি, খান আতা বেগ ও রায়াত আলা উপাধিধারী একজন উচ্চপদস্থ আমলা ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁতিপড়া মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি গৌড়ে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটা উমর কাজির মসজিদ হিসেবেও পরিচিত। ইট নির্মিত মসজিদটি দশটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। এটিতে চারটি অষ্টভুজাকৃতির কর্নার বুরুজ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে একটি রাজকীয় গ্যালারি ছিল। উত্তর দেওয়ালের বহির্গাত্রে সংযুক্ত সিঁড়িবিশিষ্ট উঁচু মঞ্চ থেকে গ্যালারিতে প্রবেশ করা যেত। মসজিদটিতে ইট বিন্যস্ত নকশা ছাড়াও পোড়ামাটির অলংকরণের প্রাচুর্য দেখা যায়। গোলাপ ফুলসংবলিত লতাপাতা নকশা, শিকল ঘণ্টা নকশা প্রভৃতি দিয়ে মসজিদটি সজ্জিত।

https://nagorikpathagar.org

বাবা আদম মসজিদ : ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মালিক কাফুর রামপালে (মুন্সিগঞ্জ) নির্মাণ করেছিলেন বাবা আদম মসজিদ। মসজিদটিতে ছয়টি অনুচ্চ গম্বুজ দুই সারিতে বিন্যস্ত আছে। মসজিদের পূর্ব দিকের ভবনের সম্মুখভাগে তিনটি আকর্ষণীয় খিলান এবং পশ্চিমের দেওয়ালে তিনটি মিহরাব আছে। মসজিদের প্রতি কোণে অষ্টভুজাকৃতির টারেট আছে।

চামকাট্টি মসজিদ : সুলতান বারক শাহের পুত্র সুলতান ইউসুফ শাহের শাসনামলে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দে চামকাট্টি মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটিতে তিনটি দরজার মাধ্যমে প্রবেশ করা যায়। মসজিদটি পোড়ামাটির নকশা ও টালির সমন্বয়ে অলংকৃত ছিল। তবে বর্তমানে এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রক্ষিত আছে। মসজিদটি গৌড়স্থ লুকোচুরি তোরণের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

খানিয়াদিঘি মসজিদ : সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৪৮০ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। রাজবিবি মসজিদ নামেও মসজিদটি পরিচিত। মসজিদটি ইটের তৈরি এবং এটিতে ছোটো ছোটো তিনটি গম্বুজ রয়েছে। পূর্ব তিন দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে মোট পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে। নামাজ ঘরের চার কোনায় এবং বারান্দার দুই কোনায় অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ রয়েছে। কেবলা দেওয়ালে সম্পূর্ণ পাথরের ব্লকে তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব রয়েছে। সমগ্র ইমারতের বাইরের দেওয়াল প্রচুর পরিমাণ স্ফীত নকশা ও পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ এবং খিলান অভ্যন্তর শিকল ঘণ্টা নকশায় সজ্জিত। এটি দেশের অন্যতম সুন্দর ইমারত হিসেবে পরগণিত।

ধুনিচক মসজিদ : খানিয়াদিঘি মসজদের এক কিলোমিটার দক্ষিণে ধুনিচক মসজিদটির অবস্থান। সম্ভবত মসজিদটি পুনঃস্থাপিত ইলিয়াস শাহি বংশের সর্বশেষ শাসক জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) নির্মিত। ইট নির্মিত আয়কাতারের মসজিদটিতে ছয়টি গম্বুজ ছিল। পূর্ব দেওয়ালে তিনটি এবং উত্তর দক্ষিণ দেওয়ালে দুটি করে মোট চারটি প্রবেশপথ ছিল। ইমারতটির সজ্জায় পোড়ামাটির ব্যবহার করা হয়েছিল।

বড়ো সোনা মসজিদ : আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) শেষ দিকে নির্মিত বড়ো সোনা মসজিদ গৌড়-লখনৌতি শহরের সবচাইতে বৃহদাকৃতির মসজিদ। সাদামাটা এবং প্রায় অলংকরণহীন হলেও এটাতে রাজোচিত মর্যাদা ও মহিমার প্রকাশ ঘটেছে। ইটের তৈরি এই ইমারতটির ভেতর ও বাইর পাথরের ব্লকে আবৃত। এটাতে আষ্টাভুজাকৃতি বুরুজ

https://nagorikpathagar.org

এবং পূর্ব দিকে ১১টি এবং উত্তর দক্ষিণ দিকে একটি করে কৌণিক খিলানযুক্ত প্রবেশ দরজা রয়েছে। মসজিদটিকে ৪৪টি গম্বুজ ছিল এবং অভ্যন্তরে একটি রাজকীয় গ্যালারি ছিল। এই গ্যালারির প্রবেশপথও বাইরে ছিল। পূর্ব দেওয়ালের ১১টি প্রবেশপথ বরাবর কেবলা দেওয়ালের সকল মিহরাবই বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। মসজিদ-সংলগ্ন পূর্ব দিকে উন্মুক্ত চত্বরের উত্তর ও পূর্ব দিকের দুটি প্রবেশ তোরণ আছে।

ছোটো সোনা মসজিদ : ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ সালের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে মজলিস-ই-মাজালিস মনসুর ওয়ালি মুহাম্মাদ বিন আলি মসজিদটি নির্মাণ করেন। বড়ো সোনা মসজিদ থেকে আকারে ছোটো হওয়ায় এটাকে ছোটো সোনা মসজিদ বলা হয়। অলংকরণে ব্যবহৃত স্বর্ণমণ্ডিতকরণ উপকরণের জন্য এটিকে সোনা মসজিদ বলা হয়। তবে সেটা আর এখন পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদটি শুরুতে বহির্দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইট ও পাথর নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাইরের দেওয়ালসমূহ সম্পূর্ণরূপে পাথরে মোড়া এবং ভেতরে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত গ্রানাইট পাথরের ব্লকে আবৃত। মসজিদটির বহিঃকোণ বহুভুজবিশিষ্ট কর্নার বুরুজ রয়েছে। দ্রুত পানি অপসারণের নিমিত্তে ছাদ কার্নিশ বক্রাকারে নির্মিত।

পূর্ব দেওয়ালে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে তিনটি করে খিলান দরজা রয়েছে। পূর্ব দেওয়ালের পাঁচটি খিলান দরজা বরাবর পশ্চিম দেওয়ালে পাঁচটি অর্ধ-বৃত্তাকার মিহরাব রয়েছে। আয়তাকার মসজিদটি ওপরে তিনটি চৌচালা ভোল্ট এবং ১২টি গম্বুজ দৃশ্যমান। অভ্যন্তরের উত্তর পশ্চিম কোণে রাজকীয় গ্যালারি ছিল। যাতে উত্তর পশ্চিম কোনায় অবস্থিত একটি সিঁড়িবিশিষ্ট উঁচু মঞ্চ দিয়ে প্রবেশ করা যেত। এই গ্যালারির সম্মুখ দেওয়ালে একটি মিহরাব আছে। পাথর খোদাই, ইট বিন্যাস পোড়ামাটির নকশা, স্বর্ণমণ্ডিতকরণ এবং চকচকে টালি নির্মাণ, উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো মসজিদটিই ছিল অপূর্ব কারুকার্যময়। মসজিদের পুরো অলংকারের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এটি গৌড়-লখনৌতি শহরের সবচাইতে আকর্ষণীয় ইমারত ছিল।

বাঘা মসজিদ : সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহ (১৫২৩-২৪) বাঘা মসজিদ নির্মাণ করেন। পাথরে নির্মিত অনুচ্চ ভিতের ওপর অবস্থিত মসজিদটি ইটের তৈরি। পুরো ইমারতটিতে দেওয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতায় পাথরের সার্দল দেখা যায়। মসজিদটিতে দশটি গম্বুজ রয়েছে। পূর্ব দিকের দেওয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে দুটি করে ঝাঁঝরি পর্দাসংবলিত খিলানপথ রয়েছে। কিবলা দেওয়ালে তিনটি মিহরাব এবং প্রধান মিহরাবের ডান দিকে রাজকীয়

https://nagorikpathagar.org

গ্যালারি রয়েছে। মসজিদের বহিস্থ কোণসমূহ অষ্টভুজাকৃতির বুরুজে মজবুতকৃত। দুই বুরুজের মধ্যবর্তী ছাদের কিনারা ধনুক সদৃশ বক্রাকারে নির্মিত। ইমারতটি পর্যাপ্ত পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। গাছগাছড়া, পুষ্প প্রভৃতি নকশায় সমৃদ্ধ মসজিদটি হোসেন শাহি রীতির প্রতিনিধিত্বকারী উৎকৃষ্ট স্থাপত্য।

কুসুম্বা মসজিদ : শুরি বংশীয় নরপতি গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে (১৫৫৬-৬০) সুলাইমান নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি কুসুম্বা মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি শুরি আমলের স্থাপত্য হলেও মসজিদটি হোসেন শাহি আমলের স্থাপত্যরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মসজিদটি ইটের তৈরি, তবে ছোটো সোনা মসজিদের ন্যায় পুরো মসজিদটি পাথরের ব্লকে আবৃত। অভ্যন্তর খিলান পর্যন্ত গাত্র পাথর দ্বারা পোড়ানো। মসজিদটিতে ছয়টি গম্বুজ এবং তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে দুটি করে খিলানপথ রয়েছে, যা বর্তমানে ঝাঁঝরি পর্দায় বদ্ধ। কিঞ্চিৎ বক্রাকারে নির্মিত ছাদ কিনারসহ মসজিদটির বহিঃকোণসমূহ অষ্টাভুজাকৃতির বুরুজ দ্বারা সুদৃঢ়কৃত। মসজিদের ভেতর-বাইর পাথরের স্ফীত ও খোদাইকৃত নকশায় সজ্জিত। মেহরাবটি উন্নত খোদাই নকশা দ্বারা সমৃদ্ধভাবে অলংকৃত। লতাপাতা, গোলাপ ফুল এবং ঝুলন্ত নকশাবলি ইমারতটিতে পরিলক্ষিত হয়।

এ ছাড়াও বরী মসজিদ (১৩০০ খ্রি.), মানকালির ভিটা মসজিদ (মহাস্থানগড়, ১৩০০ খ্রি.), লট্টন মসজিদ, জাহালিয়ান মসজিদ (১৫৩৫ খ্রি.), বিন সুহাইলের মসজিদ (ধামুইরহাট, ১৫০৭ খ্রি.), গোপালগঞ্জ মসজিদ, শুরা, নবগ্রাম, শংকরপাশা মসজিদ (১৫২৬ খ্রি.), মোয়াজ্জমপুর (সোনারগাঁও, ১৪৩২-৩৬ খ্রি.), ইউসুফগঞ্জ মসজিদ, গোয়ালদি মসজিদ (সোনারগাঁও), রামপাল মসজিদ (১৪৮৩ খ্রি.), মিরপুর মসজিদ, (ঢাকা, ১৪৮০ খ্রি.), বিনত বিবি মসজিদ (ঢাকা, ১৪৮১-৮৬ খ্রি.), খোন্দকার তলা মসজিদ (নারায়ণগঞ্জ, ১৪৮২ খ্রি.), নয় গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট), ছয় গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট, ১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.), খান জাহানের ছত্রী মসজিদ (বাগেরহাট), রণবিজয়পুর মসজিদ (বাগেরহাট), চুনাখোলা মসজিদ (বাগেরহাট), সিংড়া মসজিদ (বাগেরহাট/খনিকাতাবাদ), জিন্দাপীর মসজিদ (বাগেরহাট), সাবেকডাঙ্গা মসজিদ (বাগেরহাট), মসজিদকুর মসজিদ (পাইকগাছা, খুলনা), কসবা মসজিদ (কসবা, বরিশাল), ফকির মসজিদ (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৪৫৯-৭৪ খ্রি.), হামাদ মসজিদ (কুমিরা, চট্টগ্রাম, ১৫৩২-৩৮ খ্রি.) মসজিদবাড়ি মসজিদ (মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী, ১৪৫৬ খ্রি.), বারো বাজারস্থিত মসজিদ (ঝিনাইদহ), মনোহর দিঘি মসজিদ (ঝিনাইদহ), সাতগাছিয়া আদিনা জামে মসজিদ (ঝিনাইদহ), পীরপুকুর মসজিদ (ঝিনাইদহ), গলাকাটা মসজিদ (ঝিনাইদহ), গোড়ার মসজিদ (ঝিনাইদহ), সিংদহ মসজিদ (ঝিনাইদহ), মজলিস

https://nagorikpathagar.org

আউলিয়া মসজিদ (ভাঙ্গা, ফরিদপুর, ১৫১৯-৩১ খ্রি.), সাতৈর মসজিদ (ফরিদপুর), শৈলকূপা মসজিদ (ঝিনাইদহ), শুভড়ারা মসজিদ (যশোর) এবং পশ্চিম বাংলার হোমতাবাদ মসজিদ (১৫০১), জামাল উদ্দিনের মসজিদ (১৫১৯ খ্রি.), মোল্লা সিমলা মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.) ইত্যাদি মসজিদসমূহ সুলতানি আমলের সমৃদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের সাক্ষ্য বহন করে।

মোগল মসজিদ

বাংলাদেশে বিদ্যমান মোগল ইমারতসমূহের মধ্যে এক বিরাট অংশই হচ্ছে মসজিদ। মোগল আমলের মসজিদ স্থাপত্যে ভূমি পরিকল্পনা ও অলংকরণে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময়ের মসজিদ স্থাপত্যগুলো ছিল সাদামাটা ও অনাড়ম্বরপূর্ণ।

পাবনার চাটমোহর ও শেরপুরে খেরুয়া মসজিদ : ১৫৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহী মোগল সামরিক আফসার মাসুম খান কাবুলি চাটমোহর মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। বগুড়ার শেরপুরের খেরুয়া মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন মাসুম খান কাবুলির মিত্র মির্জা মুরাদ খান কাকশাল ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে। দুটি মসজিদই একই ভূমি নকশা ও অবকাঠামোয় নির্মিত। উভয় মসজিদেরই অষ্টভুজাকৃতি কর্নার বুরুজ ছাদের বক্রাকার কার্নিশ পর্যন্ত উত্থিত। উভয়েরই পূর্ব দেওয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে একটি করে মোট পাঁচটি দুই কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানপথ রয়েছে। পূর্ব দেওয়ালের দরজা বরাবর পশ্চিম দেওয়ালে তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকার মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কিছুটা বড়ো। মসজিদের ছাদ তিনটি সম আয়তন গম্বুজ সমন্বয়ে গঠিত। মিহরাব ও খিলানপথসমূহ গোলাপ ফুলসহ বিভিন্ন পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। মোগল বাংলার এই দুটি প্রাচীন মসজিদ বাংলাদেশে তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ নির্মাণের সূচনাকারী মসজিদ স্থাপত্য।

কুতুবশাহি মসজিদ : মালদহ জেলার হজরত পাণ্ডুয়াস্থ একলাখী সমাধি ও নুর কুতুব-উল-আলমের সমাধির মধ্যবর্তী স্থানে কুতুব শাহি মসজিদটি নির্মিত হয় ১৫৮২-৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। বিখ্যাত সুফি নুর কুতুবল আলমের একজন উত্তরাধিকারী কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটিতে বড়ো সোনা মসজিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মসজিদটিতে মোট দশটি গম্বুজ রয়েছে। পূর্ব দেওয়ালে রয়েছে পাঁচটি দরজা এবং এই দরজা বরাবর পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর দিকে আদিনা মসজিদের মিম্বরের অনুরূপ একটি উঁচু মিম্বর রয়েছে। প্রবেশপথ ও মিহরাব খিলানের ত্রিকোণাকার ভূমিসমূহ গোলাপ ফুল নকশায় সজ্জিত।

https://nagorikpathagar.org

আতিয়া জামে মসজিদ : টাঙ্গাইলের করোটিয়ার জমিদার সাঈদ খান পন্নী ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন আতিয়া জামে মসজিদ। এক গম্বুজাকৃত বর্গাকৃতির নামাজ ঘর এবং নামাজ ঘরের সম্মুখে গম্বুজাকৃতির বারান্দা সমন্বয়ে আতিয়া মসজিদটি গঠিত। গম্বুজের নিম্নস্থ কানজুয়া (পত্র নকশা)-সংবলিত উঁচু অষ্টভুজাকৃতির পিপা এই ইমারতের মাধ্যমেই বাংলা স্থাপত্যে আত্মীকৃত হয়। এর ভূমি নকশা, বক্রাকার কার্নিশ, পোড়ামাটির অলংকরণ, অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব, দুই কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানপথ প্রভৃতিতে সুলতানি স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই মসজিদটি মোগল ও সুলতানি নির্মাণ রীতির সমন্বয়ে গড়া একটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের উদাহরণ।

ইসলাম খান মসজিদ : সুবেদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৩ খ্রি.) কর্তৃক বর্তমানের পুরান ঢাকায় নির্মিত হয়েছিল ইসলাম খান মসজিদ। মসজিদটিতে তিনটি গম্বুজ রয়েছে, তবে মধ্যবর্তী গম্বুজটি বেশ বড়ো। পূর্ব দেওয়ালের তিনটি খিলানপথ বরাবর কেবলা দেওয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মাঝের মিহরাবটি বড়ো এবং অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতি। মাঝের মিহরাব দুটি ছোটো এবং আয়তাকার। অনেকেই মনে করেন, এটির নির্মাতা সম্ভবত খ্যাতিমান সুবেদার ইসলাম খান মাশহাদি।

আন্দরকিল্লা মসজিদ : ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয়ের পর এটি নির্মাণ করেছিলেন।

লালবাগ দুর্গ মসজিদ : বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে যে তিন গম্বুজরীতির মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়েছিল, তা ঢাকাস্থ লালবাগ দুর্গ অভ্যন্তরের এই তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। আয়তাকৃতির মসদিজটি ১৬৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। তিন বে বিশিষ্ট মসজিদটি তিনটি পঞ্জর-সংবলিত বালবাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত। পুরো মসজিদের ভেতর-বাইর পলেস্তারায় আবৃত। তবে প্রবেশপথ ও মিহরাবের অর্ধ-গম্বুজাকৃতির ভল্টে পলেস্তারায় দৃষ্টিনন্দন মুকারনাস নকশা রয়েছে।

বিবি মসজিদ : ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার শায়েস্তা খান নারায়ণগঞ্জ জেলার হাজিগঞ্জ এলাকায় নির্মাণ করেন বিবি মরিয়ম মসজিদটি।

এ ছাড়াও মোগল আমলে নির্মিত হয় সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুর মসজিদ, নবরায় লেল মসজিদ (ঢাকা), আকবরি মসজিদ (রাজমহল), সিরীয় মসজিদ (রাজমহল), রওশন মসজিদ (রামহল), শাহ সুজা মসজিদ (কুমিল্লা), ওয়ালিপুর শাহ সুজা মসজিদ (কুমিল্লা), মহাজনতলী মসজিদ (রাজমহল), শায়েস্তা খান মসজিদ (ঢাকা, ১৬৬৬ খ্রি.), খাজা অম্বর মসজিদ (ঢাকা, ১৬৭৭-৭৮ খ্রি.), সাত গম্বুজ মসজিদ

https://nagorikpathagar.org

(ঢাকা, ১৬৮০ খ্রি.), বাগ-ই-হামজা মসজিদ (চট্টগ্রাম, ১৬৮২ খ্রি.), মাহমুদ খান মসজিদ (চট্টগ্রাম, ১৬৮৮ খ্রি.), বখশি হামিদ মসজিদ (চট্টগ্রাম, ১৬৯২ খ্রি.), পাথরঘাটা মসজিদ (মুন্সিগঞ্জ, ১৬৯০-৯১ খ্রি.), আলোয়ার শাহিদ মসজিদ (বদ্ধমান, ১৬৯৯ খ্রি.), কমলাপুর মসজিদ (বরিশাল), শাহ পরাণ দরগাহ মসজিদ (সিলেট), পাকুল্লা মসজিদ (টাঙ্গাইল), মরিয়ম সালেহা মসজিদ (ঢাকা, ১৭০৬ খ্রি.), বড়ো শরীফপুর মসজিদ (কুমিল্লা, ১৭০৬-০৭ খ্রি.), বড়ো জামালপুর মসজিদ (গাইবান্ধা), বায়েজিদ বোস্তামি দরগাহ মসজিদ (চট্টগ্রাম), জে.টি.খনি মহল্লা মসজিদ (রাজমহল), কদম-ই-মোবারক মসজিদ (চট্টগ্রাম, ১৭২৩ খ্রি.), উরচাপাড়া মসজিদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৭৩০-৩১ খ্রি.), বজরা মসজিদ (নোয়াখালী, ১৭৪১-৪২ খ্রি.), সাইফ উল্লাহ মসজিদ (মুর্শিদাবাদ, ১৭৪৮ খ্রি.), সফীদ মসজিদ (মুর্শিদাবাদ, ১৭৫৬-৫৭ খ্রি.), মির্জানগর মসজিদ (যশোর), খাজা শাহবাজ মসজিদ (ঢাকা), কাজিপাড়া মসজিদ (রংপুর), আরিফাইল মসজিদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পারুলিয়া মসজিদ (নরসিংদী), দরিয়াপুর মসজিদ (রংপুর), ফতেহ খান মসজিদ (গুহলি), ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ (দিনাজপুর), শাহজালাল দরদাগ মসজিদ (সিলেট), ঝাউদিয়া মসজিদ (কুষ্টিয়া), নরায়হাট (লালমনিরহাট), চক মসজিদ (ঢাকা, ১৬৭৬ খ্রি.), মুসা খান মসজিদ (ঢাকা, ১৬৭৬ খ্রি.), করতলব খান মসজিদ (ঢাকা, ১৭০০-০৪ খ্রি.), আজমপুরা মসজিদ (ঢাকা, ১৭৪৩ খ্রি.), মুর্শিদাবাদের কাটরা, আজিমুন্নেসা, নুসারীবানু, ফুটি বিবির মসজিদ (বগুড়া), সাদী মসজিদ (কিশোরগঞ্জ), সুলতানপুর মসজিদ (গাজিপুর), হায়াত বেপারী মসজিদ (ঢাকা), ভাদুগড় মসজিদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), হরশী মসজিদ (কিশোরগঞ্জ), আল্‌রাকুরী মসজিদ (ঢাকা), গোরাই মসজিদ (কিশোরগঞ্জ), শাহ মুহাম্মাদ মসজিদ (কিশোরগঞ্জ), চাকশ্রী মসজিদ (বাগেরহাট), মোগরাপাড়া মসজিদ (নারায়ণগঞ্জ), গোয়ালদি আবদুল হামিদ মসজিদ (নারায়ণগঞ্জ) ফারুখ শিয়ার মসজিদ (বগুড়া), সরাইল মসজিদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ওয়ালিপুর আলমগীর মসজিদ (কুমিল্লা), মোল্লা মিসকিন শাহ মসজিদ (চট্টগ্রাম, ১৭১৪-১৯ খ্রি.), ছোটী মসজিদ (রাজমহল, ১৭০১-০২ খ্রি.), সুজা উদ্দিন মসজিদ (মুর্শিদাবাদ, ১৭৪৩ খ্রি.), লালদিঘি মসজিদ (রংপুর), চুরিহাট্টা মসজিদ (ঢাকা, ১৬৪৯ খ্রি.), ফারুখশিয়ার মসজিদ (ঢাকা, ১৭০৩-০৬ খ্রি.) এবং ফিরোজপুরস্থ তাহখানা মসজিদ (নবাবগঞ্জ)।

সমাধি স্থাপত্য

মসজিদ স্থাপত্যের তুলনায় বাংলায় সমাধি স্থাপত্য খুবই কম। বাংলার সবচেয়ে আদি সমাধিসৌধটি হচ্ছে খ্যাতনামা যোদ্ধা সুফি জাফর খান গাজির সমাধি।

https://nagorikpathagar.org

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-২২ খ্রি.) খান-ই-জাহান জাফর খান ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে সমাধিসৌধটি নির্মাণ করেন। সমাধিতে জাফর খান গাজি ও তার স্ত্রীর পাথরের তৈরি দুটি কবর রয়েছে। আলাউদ্দিন আলি শাহ পাণ্ডুয়াতে নির্মাণ করেছিলেন শাইখ জালালুদ্দিন তাবরিজির (মৃ. ১২৪৪-৪৫ খ্রি.) সমাধিসৌধ। এখানেই পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বড়ি দরগাহ বা বাইশহাজারি (বাইশ হাজার বিঘা জমি ওয়াকফ থাকায় এই নামকরণ) নামের জননন্দিত বিশাল দরগাহ এলাকা। হজরত পাণ্ডুয়ায় রয়েছে আদিনা মসজিদের নির্মাতা সিকান্দার শাহ (১৩৯১-৯২ খ্রি.)-এর সমাধি।

পুত্র গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে তাকে মসজিদের পশ্চিম বহির্দেয়াল সংলগ্ন একটি বর্গাকার ক্ষেত্রে দাফন করা হয় বলে জনশ্রুতি আছে। শাইখ আলাউল হকের আধ্যাত্মিক পিতা শাইখ আখি সিরাজুদ্দিনের (মৃ. ১৩৫৭ খ্রি.) কবরের ওপর এক গম্বুজবিশিষ্ট ইটের তৈরি আয়তাকার সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের (মৃ. ১৪১১-১২ খ্রি.) সমাধিসৌধটি সচিলাপুর গ্রামে (মোগরাপাড়া, সোনারগাঁও) অবস্থিত। কালো পাথরের টেবিল আকৃতির ভিতের ওপর এই কবরটি অবস্থিত। সাদামাটা খিলানশীর্ষ খচিত এক বিশাল আকৃতির গোরফলক দিয়ে কবরটি চিহ্নিত। তা ছাড়া দেবিকোটের মাওলানা আতার সমাধি সৌধটি সুলতান সিকান্দার শাহের সামসময়িক সমাধিসৌধ।

হজরত পাণ্ডুয়ার একশাখী সমাধিসৌধটিও বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি যুগ নির্দেশক ইমারত হিসেবে পরিগণিত। এটি বাংলার মুসলমানদের স্বকীয় ধারার সর্বপ্রাচীন দালান এবং টিকে থাকা একমাত্র দেওয়াল-নিযুক্ত সমাধিসৌধ। ইটে তৈরি এই সমাধিসৌধটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘরের আদলে তৈরি। তবে দোচালা বা চৌচালার পরিবর্তে এখানে গম্বুজ ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রত্যেক কোনায় একটি অষ্টাকোনি স্তম্ভ সংযুক্ত রয়েছে। দালানটির দেওয়াল ও গম্বুজের প্রধান নির্মাণসামগ্রী হচ্ছে ইট। বহির্দেয়ালের সজ্জায় পোড়ামাটির অলংকরণ এবং গ্লেজ টাইল ব্যবহৃত হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগ প্লাস্টার দিকে ঢেকে ফুলসহ নানা রকম শোভাবর্ধক উপাদানে চিত্রিত। সমাধির অভ্যন্তরে তিনটি কবর রয়েছে। একটু উঁচু ভিটায় খানজাহানের সমাধিসৌধটি বর্গাকার এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট। দালানটি ছোটো আকারের এবং কোনায় গোলায়িত স্তম্ভ রয়েছে। সমাধিকক্ষের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়ালে একটি করে দরজা রয়েছে। আরবি ও ফারসি শিলালেখ দিয়ে সজ্জিত গোর ফলকটি সমাধিকক্ষের কেন্দ্রে অবস্থিত।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশিষ্ট সুফি বদর পীরের সমাধি চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রে বদরপাতি নামের একটু উঁচু জায়গায় অবস্থিত। সমাধিটি আকারে ছোটো হলেও খানজাহানের

https://nagorikpathagar.org

সমাধিসৌধের সঙ্গে স্থাপত্যিক সাযুজ্য লক্ষণীয়। ইমারতটির চার কোনায় চারটি স্তম্ভ এবং একটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্বের তোরণাকৃতির দরজা দিয়ে সমাধিকক্ষে প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। সুলতানি যুগের সমাধিসৌধের চেয়ে মোগল যুগের সমাধিসৌধগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং স্ব-ঐতিহ্য শৈলীর ব্যবহারে বৈচিত্র্যময়। এগুলো এককভাবে অথবা মসজিদের আশেপাশে নির্মিত হয়েছে। হুমায়ুনের রাজত্বকালে পীর বাহরাম বুখারা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৫৬২-৬৩ সালে তিনি বর্ধমানে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তার সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছে। এক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধের বর্গাকার কাঠামোটিতে একশাখী শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট তবে মোগল বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রেখে দেওয়ালগুলো পলেস্তারায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সমাধিসৌধটির পূর্ব দিকে একটি দরজা রয়েছে। দেওয়ালের বহিরাবরণ পোড়ামাটির ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত।

নবাবগঞ্জের পিরোজপুরে (গৌড়) শাহ নিয়ামতুল্লাহর সমাধিসৌধ অবস্থিত। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার সমাধিটিতে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করা যায়। এটি মূলত পলেস্তারা ঢাকা ইটের দালান। দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে গৌড়ের আরেকটি সমাধিসৌধ হচ্ছে ফতেহ খানের সমাধি। সপ্তদশ শতকের শেষে নির্মিত (১৬৫৭-৬০) সমাধিসৌধটি ইট-চুন-সুরকি দিয়ে আয়তাকার আদলে তৈরি। শাহ সুজার মৃত্যুর পর ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়। এরপর এখানে বেশ কিছু সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। ঢাকার লালবাগ দুর্গের মধ্যে অবস্থিত পরী বিবির সমাধি। ইরান দুখত ওরফে পরী বিবি ছিলেন সুবেদার শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা। ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। ব্যবহৃত নির্মাণ উপাদান এবং করণকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি অনন্য স্থাপত্য। এর বহিরাঙ্গ এবং কোনার আটভুজ বুরুজগুলো বিশেষ মোগল ধাঁচ ও সজ্জাবাহী অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়েছে জয়পুরের মার্বেল পাথর, গয়ার কালো ব্রসল্ট এবং চুনারের ধূসর বেলে পাথর। সাদা মার্বেলের বর্গাকার সমাধিকক্ষটিতে চন্দন কাঠের দরজা লাগানো আছে দক্ষিণ দিকে। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরের খিলানপথে মার্বেল পাথরের জালি ব্যবহৃত হয়েছে। তিন ধাপ উঁচু সমাধি ফলকটি সমাধিকক্ষের কেন্দ্রে অপরূপ অলংকারে শোভিত।

রাজমহলে রয়েছে ভক্ত হুমার সমাধিসৌধ। শায়েস্তা খানের বিধবা স্ত্রীর কবরে নির্মিত এই সমাধিসৌধটি রাজমহলের সর্বোত্তম রুচির দালান হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এটি পরি বিবি স্থাপত্যের সাথে কাঠামোগত সাযুজ্য লক্ষণীয়। তবে কেন্দ্রীয় সমাধিকক্ষটি ইটের গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং কোনার কক্ষগুলো কাঠের ছত্রীযুক্ত। সমাধিসৌধটির বহিরাঙ্গ উজ্জ্বল বর্ণ ফুলেল অলংকরণে সমৃদ্ধ। নারায়ণগঞ্জে রয়েছে বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধ। সমাধিকক্ষে একটি বিশাল

https://nagorikpathagar.org

কবর ফলক রয়েছে। তা ছাড়া খাজা আনোয়ার শহিদের সমাধি, নবাব আলিবর্দি খানের সমাধিসৌধ মোগল মোগল সমাধি স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাসাদ স্থাপত্য

গৌড় নগর দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাসাদের বিধ্বস্ত অংশ বাইশ গজ সুউচ্চ দেওয়ালে ঘেরা। প্রাসাদটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ রাজদরবার, মধ্য অংশ রাজপরিবারের বাসভবন এবং তৃতীয় অংশ হেরেম। প্রত্যেক অংশে একটি করে ছোটো দিঘি ছিল। প্রাসাদ পরিকল্পনা দৃষ্টে মনে হয়, অষ্টম শতকের প্রাথম দিকের উমাইয়া আমলের প্রাসাদ পরিকল্পনা কর্তৃক প্রভাবিত। প্রাসাদ কমপ্লেক্সে জলাধার ও পানির ফোয়ারা ছিল। প্রাসাদের নিচ দিয়ে নিম দরজা পর্যন্ত নালা দিয়ে বহমান পানির ধারা ছিল বলে সুলতান বারবক শাহের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। শিলালিপিটিতে লেখা আছে—'প্রাসাদের নিচ দিয়ে পানির বহমান ধারা বেহেশতের অনুরূপ পানির ঝরনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।'

চিকা ভবন

গৌড় নগর দুর্গের গুমতি দরজার সম্মুখে চিকা ভবন অবস্থিত। চিকা ভবন গৌড়ের অন্যান্য অনেক ইমারতের মতো একই স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। এটি পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধিসৌধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কানিংহামের মতে এটি সুলতান মাহমুদ শাহের সমাধি। আবার কারও মতে, এটি দফতরখানা বা সরকারি কার্যালয়। কেউ কেউ এটিকে আস্তাবল বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

মোগল আমলে নির্মিত প্রাসাদের একটিও আজ বিদ্যমান নেই। গৌড়ের ফিরোজপুর ও ঢাকার লালবাগে অবস্থিত যে দুটি ছোটো ইমারতকে প্রাসাদ বলা হয়, তার একটিকেও সুবেদারদের উপযুক্ত রাজকীয় প্রাসাদ বলা যায় না। গৌড়ের ফিরোজপুর প্রাসাদটি যুবরাজ সুজা নির্মাণ করেছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক সাধু পুরুষ শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালির ব্যক্তিগত বসবাসের জন্য। আর লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে 'দিওয়ান' নামের যে ক্ষুদ্র ভবন রয়েছে, সেটি ছিল নবাব শায়েস্তা খানের বসবাসের জন্য নির্মিত। শাহজাদা সুজা গৌড়ের প্রাসাদ দুর্গে থাকতেন। রাজমহলে শাহ সুজা নির্মাণ করেছিলেন সাংগী দালান (পারের প্রাসাদ)। কিছু অংশ ব্যতীত পুরো প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে আবাসিক ভবনাদি, হাম্মাম, দিওয়ান, পানির জলাধার ছিল। প্রাসাদের কেন্দ্রীয় ভবনটি ছিল বিশালাকার। তবে সবচেয়ে সুন্দর অংশটির অবস্থান ছিল কেন্দ্রীয় প্রাসাদের ওপর তলায়। ওপরের তলা তিনটি কক্ষে বিভক্ত ছিল, যার কেন্দ্রীয় কক্ষটি

https://nagorikpathagar.org

সর্ববৃহৎ। প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ কালো কষ্টিপাথরের স্তম্ভ ও খাঁজ খিলানের সারি দ্বারা একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত। এটি দৌলতখানা নামেও পরিচিত ছিল। এটি 'দিওয়ান-ই-খাসের' সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং লালবাগ দুর্গেও এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উমাইয়া প্রাসাদ রোমান প্রাসাদের অনুকরণে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে আব্বাসীয়দের সময়ে এটি বিস্তৃতভাবে বিকশিত হয়। এ ধরনের বিস্তারিতভাবে বিকশিত প্রাসাদের নিদর্শন সব মোগল প্রাসাদেই দেখা যায়।

গৌড়ের ছোটো সোনা মসজিদ থেকে একটু দূরে যুবরাজ শাহ সুজা সাধক শাহ নিয়ামত উল্লাহর জন্য গঠন করেছিলেন তাহখানা (শীতল ভবন)। সম্ভবত এটি ছিল পীরের খানকা ধরনের বাসস্থান। দ্বিতল এই ইমারতটিতে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ব্যবহৃত হয়েছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে হলরুম। একে ঘিরে পেছনে এবং পাশে রয়েছে অন্যান্য কক্ষ। প্রাসাদটির দক্ষিণে রয়েছে গোসলখানা কমপ্লেক্স। এখানে একটি অষ্টভুজাকৃতির জলাধারের মাধ্যমে পুকুর থেকে পানি তোলা হতো। উত্তর দিকে আছে একটি উন্মুক্ত কক্ষ। অষ্টভুজাকৃতির উঁচু কামরার সাথে সংযুক্ত। প্রাসাদের দেওয়াল পলেস্তারাবৃত এবং এই পলেস্তারায় চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নকশা, খোপ নকশা ও স্টাকো নকশা অলংকরণে সমৃদ্ধ।

লালবাগ দুর্গের দিওয়ান 'দিওয়ানখানা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। দিওয়ান ভবনটি ভূমি নকশা ও নির্মাণ পদ্ধতিতে রাজমহলের সাংগী দালানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটাকে লালবাগ প্রাসাদের দিওয়ান-ই-খাসও বলা হয়। ইমারতটি দ্বিতল এবং দ্বিতীয় তলায় বিশাল হলরুমের সাথে অন্যান্য কক্ষাদিও রয়েছে। লালবাগ প্রাসাদের নিচ তলায় একটি সুবিন্যস্ত 'হাম্মাম' বিদ্যমান।

ফিরোজ মিনার

আব্বাসীয় দাস বংশের দ্বিতীয় শাসক সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৮-৯০) গৌড়ে নির্মাণ করেছিলেন ফিরোজ মিনার। মিনারটি অদ্যাবধি বিদ্যমান গৌড়ের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

হাম্মাম খানা

উমাইয়া শাসনের (৬৬১-৭৫০) শুরু থেকে হাম্মাম বা গোসলখানা একটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্যের ধরন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই স্থাপত্যের উৎস হচ্ছে এজিয়ান-গ্রিক রোমানরা। স্পেনেও উমাইয়াগণ অসংখ্য হাম্মামখানা নির্মাণ করেছিলেন। হাম্মামের ভেতরে পানি ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রয়োগরীতি রাজমহল, গৌড়, ঢাকা, জিনজিরা, ঈশ্বরীপুর, মির্জানগরের

https://nagorikpathagar.org

হাম্মামের ধ্বংসাবশেষ দেখে ধারণা করা যায়। সব হাম্মামের কেন্দ্রীয় আচ্ছাদনে গম্বুজ লক্ষ করা যায়। পানি সরবরাহ এবং জলাধারের সাথে সংযোগের জন্য পাইপের ব্যবহার উন্নত নির্মাণ পদ্ধতির প্রমাণ দেয়। হাম্মামে এসব হাম্মামখানায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশেরও ব্যবস্থা ছিল।

কাটরা

কাটরা অর্থ খিলান সারিযুক্ত ইমারত। আরবি-ফারসি সাহিত্যে একে 'কারওয়ান সরাই' এবং ইংরেজিতে 'ক্যারভান সরাই' বা শুধু 'সরাই' বলা হয়। প্রচলিত অর্থে একে সরাইখানা বলে সম্বোধন করা হয়। ইসলামি স্থাপত্যশিল্পে খলিফা হিশামের সময় সিরিয়াতে বিশালাকার কারওয়ান সরাই নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সরাই নির্মাণ একটি পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হওয়াই অনেক শাসক ও ব্যক্তি সরাইখানা নির্মাণ করেছেন। এগুলো সাধারণত বাণিজ্যপথের পাশে নির্মাণ করা হতো। এটি মূলত অঙ্গনবিশিষ্ট ইমারত। অঙ্গনটিকে খিলান সারিযুক্ত বারান্দা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখত। বাংলার সুলতানি ও মোগল আমলে এ ধরনের সরাই নির্মিত হয়েছে। একটি কাটরায় পরিব্রাজকদের ঘুমানোর স্থান, রান্নাঘর, খাবার স্থান, গোসলখানা, মসজিদ, এমনকি আগত বসবাসকারীদের জন্য হাসপাতালও থাকত। মোগল আমলে নির্মিত ছোটো কাটরা ও বড়ো কাটরা মজবুত উঁচু ইমারত হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বড়ো কাটরা অবস্থিত। এটি একটি আয়তাকার প্রাঙ্গণ ঘিরে আবর্তিত। এতে ২২টি কক্ষ আছে। এর উত্তর ও দক্ষিণে দুটি প্রধান তোরণ ছিল। ইমারতটি বিরাট দ্বিতলবিশিষ্ট অংশ একটি কেন্দ্রীয় আট কোনাকার কক্ষ ধারণ করেছে। পার্শ্ব অংশ দ্বিতলবিশিষ্ট এবং এদের বাইরের দিকটা একটা বর্ধিত আট কোনাকার টাওয়ার দিয়ে সজ্জিত। সুউচ্চ তোরণটি আয়তাকার। মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী নির্মাণশৈলী অনুকরণ করে বড়ো কাটরা নির্মিত এবং এটি যথেষ্ট সুরক্ষিত। সম্পূর্ণ ইমারতটিতে রাজকীয় মোগল বৈশিষ্ট্য ভরপুর। এটি ১৬৪৩-৪৪/১৬৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। বড়ো কাটরা থেকে ২০০ গজ দূরে নির্মিত হয়েছিল ছোটো কাটরা। এটি বড়ো কাটরা থেকে সামান্য ছোটো। তবে নকশা ও নির্মাণ উদ্দেশ্য ছিল একই। এ ছাড়াও ঢাকা, মৌলভীবাজার ও চকবাজারে আরও কাটরার সন্ধান পাওয়া গেছে। মুকিম কাটরা, বকশীবাজার কাটরা, মুগলটুলি কাটরা, মায়া কাটরা, নবাব কাটরা, নাজির কাটরা, রহমতগঞ্জ কাটরা এবং বাদামতলী কাটরা প্রভৃতি মোগল আমলে নির্মিত কাটরা স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

https://nagorikpathagar.org

সেতু

শিলালিপি ও লিখিত তথ্যে গৌড়ের বেশ কিছু সেতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। মোগল সেতুগুলো কেম্বার বা উত্তলবক্রিমা রীতিতে গঠিত। পানি প্রবাহের জন্য তিন, পাঁচ কিংবা সাত স্প্যাস পরিমাণ জায়গা ফাঁকা ছিল। সেতুর নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ব্যবহৃত হলেও মাঝে মাঝে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। ঢাকার আশেপাশেই মধ্য সপ্তদশ শতকে সেতুগুলো নির্মিত হয়েছে। রাজমহলের হাদাকে রাজা মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯২ সালে নির্মিত হয়েছিল হাদাক সেতু। এটিই মোগল বাংলার সবচেয়ে পুরাতন সেতু। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কে মির জুমলার নির্দেশে পাগলু নদীর ওপর নির্মিত হয়েছিল পাগলা সেতু। এ নদী একসময় ধোলাইখাল নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি কদমতলী খান নামে পরিচিত। এ সেতুর শেষ দুই প্রান্তে চার কোনায় চারটি অষ্ট কোনাকার টাওয়ার রয়েছে। সব কটা টাওয়ার বহু খাঁজ যুক্ত খিলানপথ-সংবলিত এবং এদের মাথা গম্বুজ দিয়ে আবৃত। বর্তমানে সেতুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। মির জুমলা ১৬৬১ সালে তুরাগ নদীর ওপর টঙ্গী সেতু নির্মাণ করেছিলেন। তা ছাড়া সূত্রাপুর সেতু (১৬৬৪), ফতুল্লাহ সেতু, চাপাতলি সেতু (১৬৯০-৯১), পানাম সেতু (সোনারগাঁও), পানামনগর সেতু, পিঠাওয়ালির সেতু, তালতলা সেতু (মুন্সিগঞ্জ), মিরকাদিম সেতু (মুন্সিগঞ্জ) উল্লেখযোগ্য সেতু স্থাপত্য হিসেবে বিবেচিত।

নিমসরাই মিনার

মহানন্দা নদীর পশ্চিম পাশে কালিন্দী নদীর সংযোগস্থলে (মিত্র) অবস্থিত নিমসরাই মিনার। নিকটে একটি সরাইখানা ছিল বলে এটি নিমসরাই মিনার নামে পরিচিত। মিনারটি ইট নির্মিত এবং অষ্টভুজাকৃতি ভিতের ওপর দণ্ডায়মান।

ঈদগাহ

ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য সাধারণত একটি উঁচু জমিতে নির্মাণ করা হয় ঈদগাহ। এর উৎস সম্পর্কে জানা নেই, তবে সম্ভবত কুবাতে খোলা জায়গায় মহানবির নামাজ থেকে এটা গৃহীত হয়েছে। সম্ভবত মসজিদের তুলনায় অধিক লোক সমবেত হয় বলে এই ব্যবস্থা। শাহ সুজার দিওয়ান মির আবুল কাশিম ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাতে একটি ঈদগাহ নির্মাণ করেন। এর অঙ্গনটি ২৪৫ মিটার দীর্ঘ ও ১৩৭ মিটার প্রস্থ। কেবলা দেওয়ালে চার মিটার উঁচুতে মধ্য অষ্টকোণী মিহরাবটি পাশের তিনটি করে মিহরাব দিয়ে সাজানো। মধ্যের মিহরাবটি পার্শ্ব মিহরাব থেকে উঁচু ও বড়ো। সবগুলোই একটু উঁচু করা চতুষ্কেন্দ্রিকভাবে বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলানে নির্মিত। ঈদগাহের সম্পূর্ণ দেওয়াল একটি আনুভূমিক কার্নিশসহ ব্যাটেলম্যান্ট প্যারাপিট যুক্ত।

https://nagorikpathagar.org

মহানবি (সা.)-এর সময়ে আহলে সুফফায় জ্ঞানপিপাসুদের ঠাঁই হয়েছিল। উমাইয়া আমলে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ থেকে 'মক্তব' ও 'কুত্তার' নামে প্রাথমিক পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। মুসলমানদের বিজয়ের পর বিজিত অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক মসজিদে পাঠদানের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ থাকত। আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫০) মাদরাসা ভবন মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থানে উপনীত হয়। মাদরাসাগুলোর সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বাসস্থান নির্মিত হয়েছিল। সেলজুক সুলতানদের উদ্ভাবিত মাদরাসার অনুকরণে মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে গজনবি ও ঘুরি সুলতানগণ তাদের স্ব-স্ব এলাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই ধারাই উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয় থেকেছে। উপমহাদেশে দিল্লি সুলতানি আমলে (১১৯২-১৫২৬) মাদরাসা শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়। মোগল আমলেও এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। মধ্যযুগের বাংলার শাসকগণও রাজধানী শহর ও বিজিত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২-২৭) তার অধ্যুষিত অঞ্চলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার বংশধর সুলতান দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দিনও গৌড় নামক মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। জাফর খান ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার নাম দারুল খয়রাত।

মাদরাসা মসজিদ থেকে ভিন্ন এবং এটি প্রধানত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। *তবকাত-ই-নাসিরির* সূত্রে জানা যায় যে, বখতিয়ার খলজি একটি মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। তবে সে সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। কোতওয়ালি দরজা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে নির্মিত হয়েছে দরসবাড়ি মাদরাসা। ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত মাদরাসাটি বর্গাকৃতির। এর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫.৫০ মিটার। এই ইমারতের চতুর্দিকে ৪০টি কক্ষ রয়েছে। মাদরাসার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে তিনটি প্রবেশপথ ছিল। এর মধ্যাংশে লাইব্রেরি কাম ক্লাসকক্ষ বা ফোয়ারা নির্মিত ছিল। এটি একাধিক ইমারতের সমন্বয়ে গঠিত। ছাত্রাবাস হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। দরসবাড়ি মাদরাসার পূর্বে ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বেলবাড়িতেও একটি মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। এই মাদরাসাটিকে লিপিতে মাদরাসা আল শরিফা বা উত্তম মাদরাসা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মাদরাসাটি এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে সামসময়িক হওয়ায় এটাও দরসবাড়ি মাদরাসার অনুরূপ ছিল। ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল কদম রসুল (মহানবির পদযুগল) ভবনটি। ইট নির্মিত আয়তাকার এই ভবনটির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দরজা ছিল। মসজিদ না হলেও ভবনটি

https://nagorikpathagar.org

মসজিদের মতো করে নির্মাণ করা হয়েছিল। গৌড়স্থ এই কদম রসুল ভবনটি কুব্বাত আস-সাখরার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল।

নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের সময় (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) রাজশাহীর বাঘায় একটি মাদরাসা স্থাপিত হয়েছিল। মাদরাসাটি প্রায় তিন শতক টিকে ছিল। মোগল আমলে ঢাকায় করতলব খান মসজিদ (১৭০০-১৭০৪ খ্রি.)-এর সাথে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। লালবাগ দুর্গের পশ্চিম দিকে খান মুহাম্মাদ মৃধা ১৭০৬ সালে একটি আবাসিক মাদরাসা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আহমাদ হাসান দিনার মতে, এই ইমারতটি মুসলিম মাদরাসা কোরা নকশার ভিত্তিতে নির্মিত, যা আইয়ুবি ও মামলুক আমলে দেখা যায়। কাটরা মসজিদ (১৭২৫-২৬ খ্রি.), চক মসজিদ (১৬৭৬ খ্রি.) প্রভৃতিও মাদরাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ইমামবাড়া

ইমামবাড়া শব্দটি দিয়ে উপমহাদেশে মুহাররমের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য শিয়াদের নির্মিত ভবন বা সম্মেলনকক্ষকে বোঝানো হয়েছে। ইমামবাড়া প্রধানত উপমহাদেশের প্রতিষ্ঠান। উত্তর ভারতে এটি আশরাখানা নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, সৈয়দপুর, অষ্টগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদে মোগল আমলে ইমামবাড়া নির্মিত হয়েছিল। ঢাকায় ১৫টি ইমামবাড়া ছিল। তন্মধ্যে সৈয়দ মির মুয়াদ কর্তৃক নির্মিত হোসেনি দালান হলো বিখ্যাত। দালানটি ১৭ শতকে নির্মিত হয়েছিল। ইমামবাড়ায় দুটি হলরুম আছে যথা—শিরনি হল ও খুতবা হল। দালান দুটির সঙ্গে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই তলাবিশিষ্ট হল সংযুক্ত ছিল। ঠাকুরগাঁও-এ শেখ মুহাম্মাদ কর্তৃক ইমামবাড়া নির্মিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি প্রাসাদের ইমামবাড়া নির্মাণ করেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭)।

শিলালিপি

অস্তিত্বহীন ও অবলুপ্ত ইমারত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে শিলালিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শাসকগণের অনুক্রম নির্ধারণ, তাদের পরিচিতি, এমনকি বংশানুক্রম নির্ণয়ে শিলালিপির অবদান যথেষ্ট। শাসকগণের রাজ্য বিজয় প্রশস্তি, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ধর্মীয় অনুশাসনের বহু নীতিকথা শিলালিপিতে বিধৃত হয়েছে। শাসকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে স্থাপত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে জানা যায় শিলালিপির সাক্ষ্যে। মূলত শিলালিপিই শাসকবৃন্দের লৌকিক ও ধর্মীয় ইমারত নির্মাণের সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ফলে

https://nagorikpathagar.org

স্থাপত্য ও শিল্পকলায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, সমাধি, ঈদগাহ, প্রাসাদ, তোরণ ও অন্যান্য ইমারত নির্মাণে মুসলিম বিজেতাগণ অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। আর তাদের নির্মাণকীর্তি দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার জন্য ইমারত গাত্রে স্থাপন করেছিলেন শিলালিপি। সাধারণত আরবি ভাষায় কৃষ্ণ পাথরের ওপর নাসখ নয়তো তুঘরা পদ্ধতি কিংবা উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে এসব শিলালিপি লিখিত হয়েছে। এসব শিলালিপির সাক্ষ্যে বাংলার স্থাপত্যের নির্মাতা, নির্মাণ তারিখ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। মোগল আমলে ইমারত নির্মাণে পাথরের অপ্রতুল ব্যবহার এবং লিপিকলায় পাথর অপেক্ষা কাগজের বহুল ব্যবহার শিলালিপি তৈরিতে দৈন্য নিয়ে আসে। লিপিকলায় নাসতালিক রীতির বিস্তৃতিতে শক্ত ধাতু অপেক্ষা কাগজের কদর বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতীয় উপমহাদেশে শিলালিপি তৈরিতে স্থবিরতা দেখা দেয়।

বাংলার মুসলিম শাসনের সূচনাতেই আকর্ষণীয় শৈল্পিক অলংকার সমৃদ্ধ শিলালিপি পাওয়া গেছে। অলংকৃত এই লিপি তুঘরা নামে পরিচিত। এই তুঘরা লিখন পদ্ধতি প্রচলিত লিখন পদ্ধতিরই শিল্পমান সমৃদ্ধ প্রকাশমাত্র। সমগ্র বিশ্বের হস্তলিখন শিল্পের সঙ্গে বাংলার এই তুঘরা লিপির লিখন কৌশলের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই আকর্ষণীয় ও অভিনব লিখন কৌশল অবশ্যই বাংলার একটি স্বতন্ত্র অবদান। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কুফিক, নাসখ, তালিক, নাসতালিক ও তুঘরা লিখনশৈলী দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার সুলতানদের অধিকাংশ শিলালিপিতে অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। মুসলিম ক্যালিওগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিপির উদ্ভাবন এই রীতিকে বিশেষত্ব দান করেছে।

https://nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি

অপভ্রংশ যুগের শেষ এবং নব্য ভারতীয় যুগের প্রথম দিকে, অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা স্বকীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ের সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'; সংক্ষেপে 'চর্যাগীতি' বা 'চর্যাপদ'। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ গীতিকাব্যের আবিষ্কর্তা। চর্যাপদের ভাষা বাংলা এবং এ বাংলা যে বাংলা ভাষার প্রাথমিক অবস্থা, তাও সর্ববীকৃত সত্য। 'চর্যাপদে' যে বঙ্গ ভাষার শৈশবকাল কেটেছে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ তা কৈশোরে পদার্পণ করেছে এবং শাহ মুহাম্মাদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখায়* তা যৌবনমুখ হয়েছে। অতঃপর *মনসামঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *রামায়ণ*,*মহাভারত* প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাভাষা যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৭২] ড. এস. এম. লুৎফর রহমান বলেন—

> কেবল বাংলায় নয়, গোটা উপমহাদেশের ৫৪৪টি (মতান্তরে আরও বেশি) ভাষা-উপভাষার মধ্যে প্রায় ত্রিশটি ভাষা মুসলিম শাসন কায়েমের পরে মুসলমানরাই সৃষ্টি করেছে। বাংলা ভাষা তার একটি মাত্র।... সৃজ্যমান বাংলা ভাষার অবয়ব নির্মাণে, এদেশিয় মুসলমানদের ভূমিকার খোঁজ মুসলমানদেরই করতে হবে। তাহলে জানা যাবে, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈভব নির্মাণে মুসলমানদের অবদান কেবল মুসলিম শাসনশ্রেণিতে সীমিত নয়। তার সঙ্গে জনগণেরও সম্পর্ক ছিল। ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানদের অবদান শুধু হিন্দু কবিদের সাহিত্যেও সীমিত নয়; কিংবা সীমিত নয় তাদের দিয়ে কিছু বই-কেতাব লেখাতেও। বাংলাদেশের মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যে কেবল কিছুসংখ্যক আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের জোগান দেওয়ার কাজেও নিজেদের সীমিত রাখেননি। বরং বাঙালির মূল বাংলা ভাষাটাই তাদের দান; তাঁদেরই সৃষ্টি।[১৭৩]

---

[১৭২] মুহাম্মাদ এনামুল হক, *বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশ* (ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪), পৃ. ১৪৯-১৫৬

[১৭৩] ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, *মুসলমানরাই বাংলা ভাষার আদি ওয়ালেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

https://nagorikpathagar.org

অনেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রারম্ভিক যুগকে তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং এজন্য মুসলমানদের দায়ী করেন; এটা ঠিক নয়। কেননা, মুসলিম বিজয়ের প্রথম একশ বছরেরও অধিক কাল ধরে তুর্কিরা বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও কম অঞ্চলে আধিপত্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল উড়িষ্যার গঙ্গাংশীয় রাজাদের শাসনে আর পূর্ববঙ্গও ছিল সেন সামন্তদের অধীনে। বাংলা ভাষায় তখন সাহিত্য রচনার রেওয়াজ থাকলে হিন্দু শাসিত এসব অঞ্চলের সাহিত্য পাওয়া যেত। সেন রাজারা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের পড়ালেখার কোনো সুযোগ দেননি। তা ছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা সংস্কৃত ভাষাতেই লিখতেন। তাই তুর্কি বিজয়ের আগের সময়ের কোনো বাংলা রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শৌরসেনী ছাড়া অন্য কোনো অপভ্রংশে লেখার রেওয়াজ ছিল না। আর গৌড় অপভ্রংশে লেখার রেওয়াজ চালু না থাকলে বাংলাতেও থাকার কথা নয়। তুর্কি আফগানরা নিশ্চয়ই বেছে বেছে বাংলা বইগুলোই নষ্ট করেননি। বাংলায় বই থাকলে সেন-দরবারে রচিত সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে এগুলোও থাকত। তুর্কি অধিকারেও নিশ্চয়ই সব বাড়ি ও সব মন্দির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া হিন্দু শাসিত অঞ্চল তো ছিলই। আর এই সময় বাংলায় কিছু রচিত হলেও আগুন, পানি, উই কীটে ধ্বংস করেছে অথবা জনপ্রিয়তা হারিয়ে লোপ পেয়েছে। তাই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *শেখ শুভোদয়া* এবং *চর্যাগীতির* একাধিক পুথি পাওয়া যায়নি।[১৭৪] ড. আহমদ শরীফ বলেন—

> চর্যাগীতি যে বাংলা—এ বিশ্বাস থেকেই বাংলা সাহিত্যের 'তামস-যুগ' তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাংলা, তা আজও সর্বজনস্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিল, উড়িয়া, অসমিয়াও এর দাবিদার। ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয় রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালি বিদ্বানেরাও ওদের দাবির আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৭৫]

সব সিদ্ধার বাড়ি বাংলায় নয়। বাংলা তখনও শালীন লৈখ্য সাহিত্যের ভাষা নয়, আঞ্চলিক বুলি মাত্র। কাজেই উড়িষ্যা, মিথিলা কিংবা আসামের লোকের বাংলা পদ রচনা করার তখনও সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। অতএব, মানতে হয় যে, চর্যাপদ অর্বাচীন প্রাচ্য (গৌড়ি) অপভ্রংশে রচিত। সে সময় আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও উড়িষ্যা-বিহারি-বাংলা-আসামি অপভ্রংশ মোটামুটি অভিন্ন রচনাও নয়, আবার বাংলাও নয়—অর্বাচীন গৌড়ি-মাগধী

---

[১৭৪] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

https://nagorikpathagar.org

অপভ্রংশ এবং মৌখিক রচনা। কেবল ডক্টর শহিদুল্লাহ আর ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ই নন, ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন—

> অসমিয়া ভাষীদের দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি বাংলা ও অসমিয়া দুই ভাষায় বিশেষ তফাত ছিল না। উড়িয়া অসামীদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। অতএব চর্যাগীতি কেবল বাংলার নয়, উক্ত অপর ভাষাগুলোরও সাধারণ ঐতিহ্য এবং এর ভাষা আলোচ্য সব কয়টি ভাষার জননী। সে স্তরেই চর্যার ভাষা কিঞ্চিৎ শৌরসেনী অপভ্রংশ প্রভাবিত। তবে অধিকাংশ চর্যাগীতি বাংলাদেশের আবহে এবং বাঙালির রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আসাম-বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনাচারের পার্থক্য সামান্য; সাদৃশ্যই বেশি।[১৭৬]

ড. আহমদ শরীফ বলেন—

> তুর্কি আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাংলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হলো। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হলো চেতন্য প্রবর্তিত মত।...মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন না মেলার কারণ হলো: তুর্কি বিজয়ের পূর্বে বাংলা লৈখ্য ভাষার মর্যাদা পায়নি, তোর চৌদ্দ শতক পর্যন্ত তা উচ্চবিত্ত লোকের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠেনি এবং সংস্কৃতের কোনো ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয়নি।...
>
> সাত আট পুরুষ ধরে মানুষ ত্রস্ত ও স্তব্ধ থাকতে পারেনা। বাংলায় লিখিত রচনার রেওয়াজ থাকলে তার নিদর্শন আমাদের হাতে আসতই। চিরকেলে নিয়মে শাসকগোষ্ঠীর কৃপালিপ্সু বহু হিন্দু রাজ সরকারে চাকরি নিয়ে অনুগতের নিরুপদ্রব জীবনে স্বস্তি-সুখ ভোগ করত। এ কৃপাজীবী চাকুরে শ্রেণির বাঙ্গলায় লেখার রেওয়াজ থাকলে কিছু লিখতেন নিশ্চয়ই, কেননা এ সময়ে কেউ কেউ সংস্কৃত শাস্ত্রের টীকা ভাষ্য রচনা করেছেন। পরাধীনতার গ্লানি হিন্দুর মনে অবশ্যই ছিল। তেমন অবস্থায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে, তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। অতএব আমাদের অনুমান এই যে, বাংলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্য ভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। এ হচ্ছে বাংলার স্বাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।[১৭৭]

---

[১৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

https://nagorikpathagar.org

তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছেন—'কাজেই তুর্কি বিজয়ে কেবল সদ্ধর্মীদেরই পীড়ন মুক্তির নিশ্বাস পড়েনি, বাংলা ভাষারও সুদিনের শুরু হয়েছিল।'[১৭৮] মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ইতর ভাষা বলে 'বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। হাঁড়ি, ডোমের স্পর্শ থেকে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন; 'বঙ্গভাষা' তেমনি সুধী সমাজে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়—ঘৃণা, অনাদার ও উপেক্ষার পাত্র।'[১৭৯] এ কারণে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—'হীরা কয়লার খনির মধ্যে থেকে যেমন জহুরির আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভেতর মুক্তা লুকিয়ে থেকে যেমন ডুবুরির অপেক্ষা করে থাকে, মুসলমান বিজয় বঙ্গভাষার জন্য সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করল।'[১৮০]

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বঙ্গের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রসার লাভ করে। রামাই পণ্ডিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গের মুসলিম বিজয়কে স্বর্গীয় আশীর্বাদ হিসেবে উল্লেখ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৮১] দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—'সেন-রাজত্বের অবসানে গৌড়ের পাঠান-রাজদরবারে বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে স্বীয় প্রতিষ্ঠা পুনরায় স্থাপন করতে সুবিধা পেল। এদের প্রায় সকলেই বঙ্গভাষার উৎসাহ-বর্ধক ও অনুরাগী ছিলেন।'[১৮২] লিখিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে তথা আদি বাংলা কাব্য হিসেবে শাহ মুহাম্মাদ সগীরের *ইউসুফ জুলেখা* কাহিনি স্বীকৃতি পেয়েছে। কিছুটা তথ্যের, কিছুটা যুক্তির এবং কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, এটি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০) রচিত হয়।[১৮৩]

মহানরপতি গেছে পিরথিবীর সার।
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র শিষ্য হস্তে তিহেঁ মাগে পরাজএ।
মোহাজন বাকী ইহ পুরণ করিয়া
লৈলেন্ত রাজপাট বঙ্গাল গৌড়িয়া।

এর মধ্যেই সোনারগাঁওয়ের যুদ্ধে পিতৃহন্তারক গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে নির্দেশ করা হয়েছে বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক অনুমান করেছেন।[১৮৪] লিখিত

---

[১৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[১৭৯] ড. এস. এম. লুৎফর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

[১৮০] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[১৮১] সৈয়দ আশরাফ আলী, *বাংলা ভাষার জন্ম মুসলিম শাসনামলে, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, সম্পা. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

[১৮২] *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[১৮৩] আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১৮৪] প্রাগুক্ত

https://nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যের সর্বজনস্বীকৃত আদি নিদর্শন হচ্ছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এটি সম্পাদক প্রদত্ত নাম। এর রচয়িতা বাসুলীর সেবক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। আনুমানিক রচনা কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ বা পনেরো শতকের প্রথমার্ধ। এতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রানানুগ সুফি সাধনা পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ করেছেন। ড. আহমদ শরীফ বলেন—'তবে এ সময়ে যে শাসক-শাসিতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার আভাস পাই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর সাহিত্যিক তুর্কি-ফারসি-আরবি শব্দের মিশ্রণে। এটি গীতিনাট্য, বিভিন্ন ছন্দ ও রাগ-রাগিনীযুক্ত এবং ভাষা প্রাথমিকতার আড়ষ্টতামুক্ত। এতে বোঝা যায়, এর আগে মুখে মুখে বাংলা ভাষা শব্দে সমৃদ্ধি এবং প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে।'[১৮৫] এরপরের রচনা হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। ড. আহমদ শরীফ বলেন, আমাদের অনুমান কৃত্তিবাস (জন্ম আনু. ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান রুকন উদ্দিন বারবক শাহের প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন, যেমন পেয়েছিলেন গুনরাজ খান মালাদর বসু। মালাদর বসু বাবরক শাহের আগ্রহে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। বারবক শাহ তাকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। গুণরাজ খান লেখেন—

পুরাণ পড়িতে নাই শুদ্রের অধিকার।
পাঁচালী পড়িয়া তর কি ভব সংসার।

ড. আহমদ শরীফ বলেন—'পাঁচালী লেখার সাহস ও পড়ার এই অধিকার তুর্কি শাসনের দান।' শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাল সম্বন্ধে গুনরাজ খান বলেন—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুদর্শ দুই শকে হৈলো সমাপন ॥

অর্থাৎ ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রি.) এর রচনা শুরু হয় এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ) রচনা শেষ হয়। অর্থাৎ গ্রন্থটি বারবক শাহের আমলে শুরু হয়ে ইউসুফ শাহের আমলে শেষ হয়। কবি মালাধর বসু ছিলেন বর্ধমানের কুলীন গ্রামবাসী কায়স্থ এবং রাজকর্মচারী। এরপর রচিত হয় কবি জৈনুদ্দীনের *রসুলবিজয়*। সম্ভবত এটি সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের সামসময়িক হবে। এরপর রচিত হয় বিজয় গুপ্তের *পদ্মপুরাণ*। গ্রন্থটি ১৪৮৪-৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। পনেরো শতকের অপর কবি হচ্ছেন *মনসাবিজয়*-এর রচয়িতা বিপ্রদাস পিপিলাই। তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আমলে কবিচন্দ্র মিশ্র 'গৌরীমঙ্গল', কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস *মহাভারত* এবং শ্রীকর নন্দী *অশ্বমেধপর্ব* রচনা করেন।

---

[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

https://nagorikpathagar.org

বাংলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩)। এ সময় রচিত হয় বৈষ্ণব সাহিত্য। এই সাহিত্য একসময়ে জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে সকলের মনে রসের তরঙ্গ তুলেছিল। তুর্কি আফগান সুলতান সুবেদারদের প্রতিপোষণে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বুনিয়াদ তৈরি হয়। আর বৈষ্ণব রচনার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত প্রসার ও বিকাশ ঘটে। মুসলমানেরাও রাধা-কৃষ্ণকে আত্মা-পরমাত্মা, দেহ-মন এবং ভক্ত-ভগবানের রূপক হিসেবে গ্রহণ করে পদ রচনা করেছে। ব্রজবুলি নামে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টিও হয় এ সময়ে। চৈতন্যোত্তর যুগে প্রায় দশ হাজারের মতো বাংলা ও ব্রজবুলি পদ রচিত হয়েছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রামানন্দ বসু, বংশীবদন, জগদানন্দ, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, মুরারিগুপ্ত, নরহরি দাস, নরোত্তম দাম প্রমুখ এবং মুসলমানদের মধ্যে ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, আলাওল ও সৈয়দ মর্তুজা ছিলেন শ্রেষ্ঠ পদকার।[১৮৬]

বাংলা ভাষায় আদি *মহাভারত* অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী। গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের উত্তর চট্টগ্রামস্থ সেনানী শাসক পরাগল খানের (১৫১৩-১৫৩২) আগ্রহেই পরমেশ্বর দাস সংক্ষেপে *মহাভারত*-এর কাহিনি বর্ণনা করেন। তার পুত্র নসরত খান ওরফে ছুটি খানের প্রবর্তনায় শ্রীকর নন্দী অনুবাদ করেন *অশ্বমেধ পর্ব*। কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের আগ্রহেই কবিচন্দ্র মিশ্র ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন *গৌরীমঙ্গল*। *মহাভারত*-এর তৃতীয় (১৫৫২-৫৩) অনুবাদক ছিলেন রামচন্দ্র খান। হোসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের আদেশে সংস্কৃত কাহিনির অনুকরণে *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য রচনা করেন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫৩২-৩৩ খ্রি.)। পদ রচনা করেন সৈয়দ আফজল। কবি শেখর বিদ্যাপতি আর যশোরাজও তাদের পদে নাসির শাহ (নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ) ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহের স্তুতি করেছেন। সামন্তদের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে কৃষ্ণ রামদাস, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, মুকিম অনেকেই কাব্য রচনা করেছেন। রোসাঙের বাঙালি মুসলমান রাজমন্ত্রী আশরাফ খানের আগ্রহে কাজি দৌলত (১৬২২-৩৫ খ্রি.) অনুবাদ করেন হিন্দি কবি মিয়া সাধনের আধ্যাত্ম রূপক কাব্য *ময়নাসৎ*। এর বাংলা নাম *সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী*। মগন ঠাকুর, সুলাইমান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহাম্মাদ খান, নবরাজ মজলিস প্রমুখ রাজমন্ত্রীর আদেশে যথাক্রমে পদ্মাবতী, সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জামাল, *রতন কলিকা-আনন্দবর্মা*, তোহফা, সপ্ত পয়কর ও সেকান্দরনামা অনুবাদ করেন *আলাওল*। আহমদ শরীফ বলেন—

---

[১৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

https://nagorikpathagar.org

> বাংলাদেশে সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবেদারের প্রতিপোষকতায় কেবল হিন্দুরাই বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি করেনি, মুসলমানেরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানগণের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, ধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্য তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য আমরা তাঁদের হাতেই পেয়েছি। কাজের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাদের। মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি।[১৮৭]

চৌদ্দ শতকের শেষ কিংবা পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত শাহ মুহাম্মাদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) 'ইউসুফ-জুলেখা'ই সম্ভবত গোটা আধুনিক উপমহাদেশীয় সাহিত্যে প্রথম লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান। ষোলো শতকে পাচ্ছি দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লি-মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহেরাবিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যান হচ্ছে দোনা গাজির 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'; কাজি দৌলতের 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'; আলাউলের 'পদ্মাবতী'; 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল' 'সপ্ত পয়কর', 'রতন কলিকা'; মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমোতি সয়ফুলমুলক', 'ইউসুফ জুলেখা'; নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাউলি'; পরাগলের 'শাহপরী'; মঙ্গলচাঁদের 'শাহজালাল-মধুমালা'; সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবল মুলক শামারোখ'; আবদুল করম খোন্দকারের 'তমিম আনসারি'; শরীফ শাহের 'লালমোতি সয়ফুলমুলক'। আর আঠারো শতকে রচিত হয়েছে মুহম্মদ রফিউদ্দিনের 'জেবল মুলক শামারোখ'; শাকের মাহমুদের 'মনোহর মধুমালা'; নূর মুহাম্মদের 'মধুমালা'; ফকির গরিবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা'; সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা'; মুহম্মদ আলীরজার 'তমিম গোলাম চতুন্নছিলাল', 'মিশরীজামাল'; মুহম্মদ আলীর 'শাহপরী মল্লিকাজাদা', 'হাসান বানু'; আবদুর রাজ্জাকের 'সয়ফুলমুলুক লারবানু'; শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ'; মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহরাম গোর', 'কামরূপ কালাকাহ'; খলিলের 'চন্দ্রমুখী' প্রভৃতি।

মুসলমান কবিগণ এক বিরাট জীবনী সাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন। চরিতাখ্যানের মধ্যে উল্লেখ্য জৈনুদ্দিনের 'রসুল বিজয়' (১৪৭৩ খ্রি.); সৈয়দ সুলতানের 'নবিবংশ' (১৫৮৬ খ্রি.); শাহ বারিদ খানের 'হানিফার বিজয়' ও 'রসুল বিজয়';

---

[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

https://nagorikpathagar.org

শেখ ফয়জুল্লাহর 'গাজি বিজয়'; শেখ চাঁদের 'রসুল বিজয়'; নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'জঙ্গনামা'; আবদুন নবির 'আমির হামজা'; গরিবুল্লাহর (পশ্চিমবঙ্গ) 'আমির হামজা', 'হাতেম তাই'; উজীর আলির 'নসরে উসমান ইসলামাবাদ' (কুলজী-মূলক) এবং বিভিন্ন কবির 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'সিফাতুল আম্বিয়া' ও অন্যান্য আওলিয়া কাহিনি প্রভৃতি।

কারবালা কাহিনি নিয়েও অনেক যুদ্ধকাব্য ও মর্সিয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এগুলো সাধারণত 'জারি' ও 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। এ-বিষয়ক ফারসি কেতাব *মক্তুল হোসেন*-কে আদর্শ করেই বাংলা জঙ্গনামাগুলো রচিত হয়েছে। বাংলায় মক্তুল হোসেন বা জঙ্গনামার আদিকবি দৌলত উজির বাহরাম খান (১৬ শতক)। দ্বিতীয় কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। ইনি *জায়নবের চৌতিশা* নামে বিলাপ রচনা করেন। তৃতীয় কবি মুহম্মদ খান। ইনিই জঙ্গনামার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম *মক্তুল হোসেন*। এরপর যারা জঙ্গনামা রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে হায়াৎ মাহমুদ, জাফর, গরিবুল্লাহ, সফী উদ্দিন, সা'দ আলি, আলি মুহাম্মাদ, জিন্নাত আলি, হামিদুল্লাহ খান, আবদুল ওহাব, রাধাচরণ গোপ, মুহম্মদ মুন্সী, আবদুল হামিদ ও জনাব আলির নাম উল্লেখ্য। এ ছাড়া রাগ-তাল, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, তুকতাক প্রভৃতি নানা বিষয়ক মধ্যযুগের অনেক রচনা পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালি মুসলমানের বিশেষ গর্বের অবলম্বন হতে পারে। কেননা, এ ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় বাঙালিকে প্রবর্তনা দেন সুলতান-সুবেদারগণ। এ ভাষার অন্যতম আদিকবি ও প্রণয়োপাখ্যানের আদি লেখক শাহ মুহাম্মাদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.)। রোমান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা ও মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কাজি দৌলত। বাংলার প্রথম মৌলিক ও রূপক কাব্য *সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ*-এর (১৬৩৫ খ্রি.) রচয়িতা মুহাম্মাদ খান। বাস্তব প্রতিবেশে মাটির মানুষের জীবনচিত্র ও প্রণয়কাহিনি রচনা করেছেন *লায়লি-মজনু'র* কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ও পূর্ববাংলার গাথাকারগণ। বাংলা কাব্যের ভাষাকে পরিশ্রুত ও নাগরিক লাবণ্য দান করেন শা'বারিদ খান ও আলাওল। মুসলমান কবিও সংখ্যায় অমুসলমান কবির চেয়ে কম ছিলেন না। এভাবে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে মুসলমানদের বিশেষ সাধনা ও দান।[১৮৮]

[১৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

https://nagorikpathagar.org

নগর, দরবার, গার্হস্থ্য ও বিনোদন

নগর

সভ্যতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে নগর। প্রাচীন সব সভ্যতাই নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। উপমহাদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রিষ্টপূর্ব থেকেই নগরায়ণের জন্য অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছিল। উপমহাদেশের সামগ্রিক নগরায়ণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলায় দ্বিতীয় নগরায়ণ বিকাশ লাভ করেছিল। ১১ শতকের বৈয়াকরণ কৈয়টের মতে, নগর হলো উঁচু পাঁচিল ও পরিখা দিয়ে ঘেরা বাসভূমি। কৌটিল্যর মতে, দুর্গ হলো নগর। আদি ঐতিহাসিক যুগে বাংলায় নগরায়ণ হয়েছিল, তবে কোন দশকে বা শতকে তা বলা সম্ভব নয়। বরেন্দ্র, মহাস্থানগড়, বানগড়, উয়ারী-বটেশ্বর, মঙ্গলকোট, কোটা সুর, পোখান্না, চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপিতে আদি-ঐতিহাসিক যুগে নগর গড়ে উঠেছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে—

> আদি ঐতিহাসিক যুগের নগরগুলো গড়ে উঠেছিল ব্যাপক বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও সমৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে শাসন কেন্দ্র বা সামরিক কেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই নগর বা শহর গড়ে উঠেছিল। অনেকের মতে, মহাস্থানগড়, বানগড়, মঙ্গলকোট ও চন্দ্রকেতুগড়ে যে নগরায়ণ—তা গুপ্ত ও পাল সেন যুগ পর্যন্ত চলেছিল।[১৮৯]

মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পর এখানে নগরায়ণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। পুরোনো নগরীগুলোতে অনেক কিছুই সংযোজিত হয় এবং সেইসাথে নতুন নতুন নগরীর গোড়াপত্তন হয়। বিজয়ের পর প্রশাসকরা বিভিন্ন স্থানে রাজধানী শহর, প্রশাসনিক সদর দপ্তর, থানা বা পুলিশ ক্যাম্প, সেনানিবাস ও দুর্গ নির্মাণ করেন। মুসলিম বিজয়ের পর বহু আলিম-উলামা, কবি-সাহিত্যিক, অভিবাসী, বৈজ্ঞানিক, সুফি সাধক ও অভিবাসী বাংলায় আসেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকশ্রেণি, অভিবাসী ও বণিকশ্রেণির বসতি গড়ে ওঠে; যেগুলো সময়ের বির্বতনে একপর্যায়ে মেট্রোপলিটন সিটি কিংবা ছোট্টা শহরে উপনীত

---

[১৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

https://nagorikpathagar.org

হয়। ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত লখনৌতি (গৌড়), দেবকোট (দেবীকোট), সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া, তান্ডা, আকবর নগর (রাজমহল), ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) ও মুর্শিদাবাদ—এই আটটি নগর খ্যাতি অর্জন করেছিল। এগুলো রাজধানী শহরের মর্যাদা লাভ করেছিল এবং প্রধান প্রধান মেট্রোপলিটন শহরের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল।

মোগল আমলে সোনারগাঁও, বুকাইনগর, ভুলুয়া (নোয়াখালী), চাট মহল (চাটমোহর, পাবনা), শাহজাদপুর, শ্রীপুর প্রভৃতি বারোভুঁইয়া অধিকৃত অঞ্চলে শহর গড়ে উঠেছিল। তবে পরবর্তী সময়ে মোগলরা এসব অঞ্চল পরিত্যাগ করলে এ সকল শহর বিলুপ্ত হয়ে যায়। মোগল আমলে পুরো বাংলায় ১৯টি সরকার এবং ৬৩৮টি মহল ছিল। পুরোনো শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ঘিরে সরকার ও মহল গঠন করা হয়েছিল। বাংলার নবাবরা এসব পুরোনো সরকার শহরকে ১৩টি চাকলা হিসেবে পুনর্গঠন করেছিল। কিছু কিছু বন্দরকেও চাকলায় রূপান্তর করা হয়েছিল। সাতগাঁও, চট্টগ্রাম, তাজপুর, সিলেট, ঘোড়াঘাট, গুহলি, কোলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বালাশোর, হিজলি, কুড়িবাড়ি ছিল নতুনরূপে চাকলায় রূপান্তরিত বন্দর।

থানা ও ব্যারাককে কেন্দ্র করেও শহর গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন স্থানে টাঁকশাল স্থাপনকে কেন্দ্র করে বহু শহর সৃষ্টি হয়েছিল। পরে টাঁকশাল নগরী প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন : গিয়াসপুর (ময়মনসিংহ), শহর-ই-নও (পাণ্ডুয়া), মুয়াজ্জমাবাদ (সোনারগাঁও), জান্নাতাবাদ (লখনৌতি), ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), রোটাসপুর (বিহার), মাহমুদাবাদ (নদীয়া-যশোর-ফরিদপুর নিয়ে গঠিত), বারকাব্যাদ (পশ্চিম দিনাজপুর), চন্দ্রাবাদ (মুর্শিদাবাদ), নুসরাতবাদ (ঘোড়াঘাট), খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট), শরীকাব্যাদ (বীরভূম) প্রভৃতি ছিল টাঁকশাল শহর। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনের ফলে বেশ কিছু বাণিজ্য-বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে সময় ফিরিঙ্গি বাজার (নারায়ণগঞ্জ, ১৫৬৩ খ্রি.), মুর্শিদাবাদে আর্মেনিয়ান বসতি মুকসুদাবাদ (১৬৬৫ খ্রি.), সুতানটি, কোলকাতা, জব চার্ণকের বাণিজ্যিক দুর্গ, গুহলি (পর্তুগিজ বসতি), পাদরিশিবপুর (বরিশালের পর্তুগিজ বসতি), ত্রিবেণী, সাতগাঁও, এগারো সিন্ধুর, কাসিম বাজার, চন্দননগর (ফরাসি বসতি, ১৬৭৩ খ্রি.), চালক (বারাকপুর), চিরামপুর (দিনামার নগর) প্রভৃতি বাণিজ্য নগরীর উদ্ভব হয়েছিল।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে কিছু শহরের উদ্ভব ঘটেছিল। তাব্রিজাবাদ, নবদ্বীপ, বিহার শরীফ, সোনারগাঁও, আজিমাবাদ (পাটনা) প্রভৃতি শহরের তখন উত্থান ঘটেছিল। মোগলদের অধীনে বাংলার শহরগুলো বিশেষ

https://nagorikpathagar.org

গুরুত্ব লাভ করেছিল। মোগলরা ছিলেন মূলত শহরের লোক এবং তারা স্থানীয় সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। এ সময়ে কোতোয়ালের কার্যালয় নগর তত্ত্বাবধানকারী সংগঠনে উন্নীত হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা বিভাগের প্রধান কোতোয়ালের অধীনে থাকত অশ্বারোহী সৈন্য, পাহারাদার ও গোয়েন্দাদের একটি দল। কোতোয়াল প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন মির মহল (ওয়ার্ডপ্রধান) নিয়োগ দিতেন। তিনি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন, ওজন ও মাপ পরীক্ষা করতেন এবং স্থানীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান যাচাই করতেন। তিনি স্থানীয় কর, বাজার শুল্ক ও যাতায়াত কর আরোপ করতেন। টোডরমল বাংলাকে ৬৮৯টি মহলসহ ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেকটি সরকারের প্রধান প্রশাসনিক দপ্তর একেকটি গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

এসব শহরে ধীরগতিতে হলেও পোশাক, চিনি, লবণ, তেল, চামড়া, কাগজ, গজদন্ত, মৎস্য, ধাতব, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছিল এবং এই শহরগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। পরবর্তী সময়ে এসব শহরের সঙ্গে বিদেশিদের পরিচয় শিল্প বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফলে নতুন নতুন বাজার ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক জেলা শহরে ৪-৬ বর্গ মাইল এলাকাজুড়ে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি জনগণ বাস করত। মহকুমা সদর দপ্তরগুলোর আয়তন ছিল প্রায় ৩.৫ বর্গমাইল এবং এসব অঞ্চলে গড়ে ১০-১২ হাজার লোক বাস করত।[১৯০]

দরবার

মহানবি (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদা অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তবে উমাইয়াদের (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) দরবারি জীবন ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ। আর আব্বাসীয়দের সময় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) রাজধানী বাগদাদের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এমন কোনো শহরই বিশ্বে ছিল না। খলিফা হারুন অর রশিদের সময় (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদ খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেছিল। এ সময় ইতিহাস ও কিংবদন্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ধনসম্পদ আর জাঁকজমকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আব্বাসীয় খলিফাদের পাশাপাশি উজির, রাজকর্মচারী ও অমাত্যরাও রাজকীয় ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভাও ইউরোপের সবচেয়ে সংস্কৃতিমনা শহরে পরিণত হয়েছিল। একজন স্যাক্সন সন্ন্যাসিনী কর্ডোভাকে বিশ্বের রত্ন হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

---

[১৯০] প্রাগুক্ত, ৫১২-৫১৬

https://nagorikpathagar.org

সুলতানি বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষত সুলতান প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রশাসন ও শাসনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অমাত্য পরিষদ ছিল এবং একদল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সুলতানের কার্য বাস্তবায়নে সহায়তা করতেন। বাংলার সুলতানগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং প্রাচীন যুগের শক্তিমান নরপতিদের সাথে নিজেদের তুলনা করতেন। অনেকে নিজেকে সুলতান আল আজম (শ্রেষ্ঠ সুলতান), সুলতান আল মুয়াজ্জাম, সুলতান আল সালাতিন (রাজাধিরাজ) ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ মুদ্রায় 'আবুল মুজাফফর' (বিজয়ীদের পিতা) উপাধি ধারণ করেছিলেন। বাংলার এ সুলতানরা অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। তাদের রাজোচিত জীবনের সাথে সাথে বাহারি শোভাযাত্রা, রাজভোজ ও উৎসবাদি বাংলার লোককাহিনির বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

বাংলার সুলতানগণ জাঁকজমক, সুরুচি ও সংস্কৃতির বিষয়ে দিল্লির সুলতান ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলতেন। শেরশাহ বাংলার রাজধানী গৌড় দখলের পর (১৫৩৮ খ্রি.) এর ধনসম্পদ 'রোটাসগড়' দুর্গে স্থানান্তর করতে কয়েক শত উট ও অশ্ব ব্যবহার করেছিলেন। এটা সাক্ষ্য দেয়, বাংলার শাসকগণ খুব শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন। বাংলার শাসক দাউদ খান কররানি সম্রাট আকবরের সাথে প্রতিযোগিতা করে বিচিত্র অনুষ্ঠান পালন করতেন। তিনি নিজে 'বঙ্গশাই' উপাধি ধারণ করেন এবং দিল্লির মোগল সম্রাটদের রাজদরবারের আদবকায়দা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে নিজ দরবারের সভাসদদের 'খান-খানান' উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলার শাসকগণ বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদে বসবাস করতেন। মুসলিম বাংলার রাজধানী গৌড় ছিল ২৫ বর্গমাইলের। এটি উত্তর-দক্ষিণে সাড়ে ১২ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ছিল প্রায় ২ মাইল। পরে গৌড় থেকে ২০ মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়াতে (ফিরোজাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল।

সম্রাট হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করে দেখেন, এটি অতুলনীয় বিলাসপূর্ণ প্রাসাদ, রাজিতে সুশোভিত এবং প্রাসাদের মেঝে বহু মূল্যবান কার্পেট দ্বারা সুসজ্জিত। খাদ্যসামগ্রী, বাসন-কোসন ও সোনার কাজ করা হাতলবিহীন অসংখ্য সুগন্ধি পানপাত্রে পরিপূর্ণ ছিল এ স্থান। স্তম্ভগুলো ছিল চন্দন কাঠের এবং মেঝে ছিল চীনা টালিতে মোড়ানো। কক্ষের দেওয়ালগুলোতেও একই ধরনের টালি ব্যবহৃত হয়েছিল। মূল্যবান আসবাবপত্র ও বিলাসবহুল পর্দায় প্রাসাদসমূহের কক্ষগুলো সুসজ্জিত ছিল। উদ্যানসমূহ অজস্র ফুল ও পাথর নির্মিত স্রোতস্বিনীতে সুশোভিত ছিল। হুমায়ুন গৌড় দেখে এতটাই মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি

https://nagorikpathagar.org

এখানে দীর্ঘ দুই মাস একটানা আরাম-আয়েশে ডুবেছিলেন। এই দুই মাসে একবারের জন্যও দরবারে বসেননি। গৌড়ের সৌন্দর্য ও জাঁকজমকে অভিভূত সম্রাট এর নাম দিয়েছিলেন জান্নাতাবাদ।

যে সমস্ত চীনা পরিব্রাজক গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজধানী পাণ্ডুয়া পরিদর্শন করেছিলেন, তাদের অন্যতম সিংচ সেঙ্গলান বলেন—

> রাজার বাসভবন মর্টার মিশ্রিত ইটের তৈরি; বাসভবন পর্যন্ত সিঁড়িগুলো ছিল উঁচু ও প্রশস্ত। কক্ষগুলো ছিল প্রশস্ত ছাদ বিশিষ্ট এবং এর অভ্যন্তরভাগ ছিল সাদা চুন-কাম করানো। অভ্যন্তরভাগের দরজাগুলো ছিল তিনগুণ ঘন ও প্রতিটি দরজা নয়টি প্যানেল বিশিষ্ট। সভাকক্ষের স্তম্ভগুলো ছিল পিতল দিয়ে মোড়ানো, নানাবিধ ফুল ও জীবজন্তুতে চিত্রায়িত, বক্রাকৃতির এবং সুমার্জিত। ডানে ও বামে প্রসারিত দীর্ঘ অলিন্দ। সেখানে আমাদের দর্শন উপলক্ষ্যে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত সহস্রাধিক লোক সারিবদ্ধভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল। সভাগৃহের বহির্ভাগের প্রাঙ্গণে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরিহিত এবং বর্শা, তরবারি ও তির-ধনুক সজ্জিত (আমাদের) অশ্বারোহী চীনা সৈনিকদের দীর্ঘ সারি ছিল। তাদের প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল।...রাজার ডানে ও বামে ময়ূর পালকে তৈরি শত শত ছত্র ছিল এবং দরবার কক্ষের সম্মুখভাগে হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিল কয়েক শত সৈনিক। রাজাপ্রধান দরবার কক্ষে মূল্যবান পাথর-বসানো উচ্চ রাজসিংহাসনে পা দুটো আড়াআড়ি করে বসেছিলেন এবং একখানা দুধারী তলোয়ার তার কোলের ওপর রাখা ছিল। পাগড়ি পরিহিত ও হাতে রুপার কাঠিধারী দুজন লোক আমাদের অভ্যর্থনার এগিয়ে এলো। দরবার কক্ষের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে তারা থামল এবং অন্য দুজন রাজকর্মচারী স্বর্ণষষ্ঠি হাতে পূর্বের মতোই আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের এগিয়ে নিল।[১৯১]

পাণ্ডুয়ার রাজদরবার পরিদর্শনকারী আরেক চীনা পরিদর্শক ইয়াং চৌ কুংতিয়েনলু লেখেন—

> মেঝেতে কার্পেট বিছানো হয় এবং রাজা চীনা সফরকারী দলকে স্যাঁকা, সংরক্ষিত এবং ঘিয়ে ভাজা গরু ও ভেড়ার মাংস, গোলাপজল এবং বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধিযুক্ত সুমিষ্ট পানীয় যোগে আপ্যায়িত করেন। রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা শেষে রাজা চৈনিক দূতদের স্বর্ণ নির্মিত পানপাত্র, রুটি স্যাঁকার পাত্র ও নানা প্রকার স্বর্ণনির্মিত থালাবাটি উপহার দেন। সকল সফরকারী দূতকে রৌপ্যমুদ্রা উপহার দেওয়া হয়।

---

[১৯১] ড. এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ : ২২৪

https://nagorikpathagar.org

এই চীনা লেখক লেখেন—'বাস্তবিকই দেশটি খুব সম্পদশালী এবং অতিথিপরায়ণ।' এভাবে রাজসভায় নিয়মিত রাজকীয় অনুষ্ঠানাদি অনুসৃত হতো। সুলতানকে কেন্দ্র করেই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আমির-উমরা ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দ উপবেশন করতেন। সুলতান উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত দেহরক্ষী ও অনুচরবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। উজির, আমির-উমরা ও মনসবদারগণ তাদের নির্ধারিত জায়গায় রাজসিংহাসনের দু-পাশে বসতেন। একদল রাজকর্মচারী রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। 'নকিবরা' রাজপ্রাসাদ থেকে সুলতানের দরবারগৃহে আগমনবার্তা ঘোষণা করতেন। তারা দরবারে আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শনপ্রার্থীদের নামও ঘোষণা করতেন। রুপার ষষ্ঠী বহনকারী হাজিরগণ রাজদরবারে আগমনকারীদের অভ্যর্থনা জানাত। স্বর্ণের ষষ্ঠী বহনকারী বারঠিক বা আমির-ই-হাজির নামক পদস্থ কর্মচারী দর্শনপ্রার্থীদের পত্রাদি সুলতানের হাতে অর্পণ করত।

সুলতানের ব্যক্তিগত রাজকর্মচারী 'দবির-ই-খাস' রাজকীয় ফরমান, আইন ও আদেশনামাসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি ছিলেন সুপাঠক, সুন্দর হস্তলিপিকার এবং সুদক্ষ লেখক। অনেক সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীকেও দবির-ই-খাস নিযুক্ত করা হতো। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দবির-ই-খাস হস্তাক্ষর শিল্প ও রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দেহরক্ষী দলের প্রধানকে বলা হতো ছত্রী (ছাতাধারী)। সুলতান হোসেন শাহের ছত্রী ছিলেন কেশব। তার পরিবার, পূর্বপুরুষ ঘিরে থাকত সিলাহদার (বর্মরক্ষক) নামক এক সামরিক অফিসার। সুলতানের সাথে সার্বক্ষণিক থাকত একটি সশস্ত্র সৈন্যদল। রাজচিকিৎসক, রাজজ্যোতিষী, কোতায়াল, রাজকবি, সংগীতজ্ঞ, গায়ক, রসজ্ঞ ব্যক্তি প্রমুখদের আবাসস্থল ছিল রাজপ্রাসাদ।

মোগল আমলেও রাজপ্রাসাদে, রাজধানীতে, তাঁবুতে বা যেকোনো অভিযানে সর্বত্র সুবেদার ও নবাবগণ দিল্লির সম্রাটের অনুকরণে জাঁকালো আয়োজনে পরিবেষ্টিত থাকতেন। মোগল সুবেদারদের প্রথম রাজধানী ছিল রাজমহল এবং পরে ঢাকা। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী শহরের মর্যাদা লাভ করে। এগুলো কালক্রমে সেকালের বৃহৎ ও সুন্দর নগরীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইসলাম খান ও তার উত্তরাধিকারী আমির-উমরা ঢাকার পুরাতন দুর্গের আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং প্রাসাদরাজি নির্মাণ করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান, শাহজাদা মুহাম্মাদ আজম ও আজিম-উশ-শানের আমলে আরও প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মিত হয় এবং শহর বিস্তৃত হয়। শায়েস্তা খান বাদশাহি দুর্গের ভেতরে চল্লিশ স্তম্ভের একটি হলঘর ও রংমহল নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাদা আজমের ছিল একটি বিরাট হলরুম ও একটি বাদকগৃহ। মুর্শিদকুলি খান মুর্শিদাবাদে দুর্গ, প্রাসাদ এবং মসনদ ও রাজদরবারের জন্য চল্লিশ স্তম্ভবিশিষ্ট চেহেল সেতুন নামে একটি

https://nagorikpathagar.org

আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ তৈরি করেন। মুর্শিদাবাদের পরবর্তী নবাব, নবাব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ ও আমির-উমরাগণ নিজেদের জন্য সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, বিলাসভবন প্রভৃতি নির্মাণ করেন। শাহ মতাজাদ্দের মতিঝিল এবং সিরাজউদ্দৌলার হিরাঝিল ও মনসুর গজ্জত প্রাসাদ সেকালের সুরম্য স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম। নবাব আলিবর্দি খানের আমলে মুর্শিদাবাদ দৈর্ঘ্যে ১২ কোশ এবং প্রস্থে ৭ কোশ বিস্তৃত ছিল। অধিকন্তু নগরের বাইরে ধনী ব্যক্তিরা বিলাসভবন তৈরি করেন।[১৯২]

বাংলার কোনো কোনো সুবেদার এমন কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন, যা ছিল সম্রাটেরই অধিকারভুক্ত। সুবেদার ইসলাম খান ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ঝরোকায় উপবেশন করতেন। স্বর্ণ খচিত কার্পেট এবং নানা প্রকার মখমল দিয়ে জাঁকালোভাবে ঝরোকাটি সাজানো হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান স্বীয় নির্মিত এই গৃহে কালো মার্বেল পাথরে নির্মিত 'মসনদ' নামক সিংহাসন স্থাপন করেছিলেন। মাত্র একখণ্ড পাথরে খোদিত সিংহাসনটির উপরি ভাগ সোনালি ও রুপালি ঝালরবিশিষ্ট একটি গাঢ় রঙের জমকালো চাদোয়া দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল। বাংলার শাসনকর্তা শাহ সুজা এটি নির্মাণ করেছিলেন। সুবেদারের জন্য ছিল নহবতখানা এবং 'নাকারা' বা 'দামামা' দল। শোভাযাত্রা বা অন্যান্য স্থানে গমনকালে বাদকদল 'নাকারা' বা 'দামামা' বাজাত। সুবেদারকে সাহায্য করত দিওয়ান (আয়-ব্যয়ে) ও বখশি (সামরিক কর্মকর্তা)।

বারবিক নামক বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন দরবারের অনুষ্ঠানাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তিনি আমির হাজির ও মির তুজক নামেও পরিচিত ছিলেন। বারবিকের সহকারী হিসেবে হাজির নামক কর্মকর্তাও ছিলেন। 'আরজবেগ' নামক কর্মকর্তার মাধ্যমে নবাব শুনতেন জনগণের দুঃখ-দুর্দশা। 'দারোগা-ই-খাস বরদার' ছিলেন নবাবের অস্ত্রশস্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক। নবাবের তরবারির দায়িত্ব বহন করতেন 'আরবাব-ই-সিলাহ' বা সিলাহদার। একদল দেহরক্ষী 'সার জানদার' নামক প্রধানের নেতৃত্বে সেকালের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকতেন। নবাবের গোসলখানা তদারকি করতেন আকতাবটি।

মির-ই-আ খুর দেখতেন অশ্বশালা, শাহনা ই-ফিল দেখতেন হস্তীশালা আর দারোগা-ই-ফারাশখানা সরবরাহ করতেন নবাব ও দরবারের প্রয়োজনীয় পোশাক। মশালচি করতেন বাতির ব্যবস্থাপনা, শামাদার দেখতেন মোমবাতিসমূহ। কাউল নবাবের রান্নার তদারকি ছাড়াও খানাপিনা ও রাষ্ট্রীয় ভোজের ব্যবস্থা করতেন, সেইসাথে নবাবের রুচি অনুসারে খাবার তৈরি করতেন।

---

[১৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

https://nagorikpathagar.org

একেবারে শেষের দিকের নবাব, নবাব আলিবর্দি খান সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা আগে শয্যা ত্যাগ করতেন। ফজরের নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের পর তিনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেন। অতঃপর বসতেন দরবারে। ঘণ্টা দুয়েক দরবার পরিচালনার পর চলে যেতেন খাস কামরায়। এখানে তিনি গল্প, কবিতা শুনে ঘণ্টাখানেক সময় পার করতেন। অতঃপর খাদ্য গ্রহণ করে নিজ কক্ষে বিশ্রাম নিতেন। জোহরের নামাজ আদায়ের পর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আসরের নামাজ আদায় করে বরফ অথবা যবক্ষার দিয়ে ঠান্ডা করা পানি পান করতেন। তিনি আলিম-উলামাদের সাথে মিলিত হতেন; এরপর দ্বিতীয়বার দরবারে বসতেন। দ্বিতীয় দরবার দুই ঘণ্টা স্থায়ী হতো। এরপর কয়েকজন রসিক ও আমোদি লোক নবাবকে সঙ্গ দিতেন। রাতে আলিবর্দি খান কখনো খাদ্য গ্রহণ করতেন না। তিনি রাতে দুই থেকে তিন ঘণ্টা ঘুমাতেন।

নবাব ও সুবেদারগণ একটি বিরাট হেরেম সংরক্ষণ করতেন। তাদের রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ছিল আড়ম্বরপূর্ণ, হেরেম ছিল বিশাল। অনুচরদের সংখ্যা ইত্যাদি দিক দিয়ে অধীনস্থ ভূখণ্ডে তাদের সমতুল্য কেউ ছিল না। স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিয়ে গঠিত হয়েছিল হেরেম। নবাব আলিবর্দি খানের হেরেমে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী নিহত আফগান সর্দার শমসের খান ও অন্যদের স্ত্রী-কন্যাও বসবসাস করতেন। নবাব কখনো বিনা নোটিশে হেরেমে প্রবেশ করতেন না। নবাবের বেগম ছিলেন হেরেমপ্রধান। হেরেমের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল খোজা। কোনো কোনো নবাব উপপত্নী রাখতেন; তাদেরও স্থান ছিল হেরেমে। লুতি, হুরকানি, কাঞ্চি ও ডোমনিদের (জিপসি) নিয়ে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিল সুবেদার ইসলাম খানের। তিনি তাদের জন্য মাসে ৮০,০০০ টাকা খরচ করতেন। তার অনুচরগণ হীরা-জহরতের গহনা ও সিল্কের কাপড়চোপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মতিঝিলে হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে নওয়াজিশ মুহাম্মাদ শাহামত জঙ্গ ২০০ চৌবাচ্চা পূর্ণ করতেন রঙিন পানিতে। চারিদিকে রাশি রাশি হলুদ ও জাফরানি রং আকাশে উত্থিত হতো। বিরাট আনন্দ, উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে পালিত হতো নওরোজ উৎসব।

চৈত্র মাসে অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে 'পুণ্যাহ' উৎসব হতো। এদিন নবাব স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণখচিত কাপড়ের চন্দ্রাতপের নিচে কারুকার্যপূর্ণ বালিশ দিয়ে সজ্জিত মসনদে উপবেশন করতেন এবং তার সম্মুখে থাকত রাজস্বের হিসাব-নিকাশের স্বর্ণখচিত খাতা। নবাব পরিবারে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতো বিবাহ উৎসব। নবাব সরফরাজ খানের পুত্র শুকুর উল্লাহর

https://nagorikpathagar.org

বিবাহের 'সাচক' অনুষ্ঠানে বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনাপত্র, মিষ্টান্ন, আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি নিয়ে গিয়েছিল শত শত ক্রীতদাস। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিবাহ উৎসব চলেছিল মাসাধিক কালব্যাপী। সাধারণ লোকের মাঝেও বিতরণ করা হয়েছিল হাজার খাদ্যের তোড়া। এসব তোড়ার মূল্য কোনোটারই পঁচিশ টাকার কম ছিল না। আলোকসজ্জায় প্রাসাদসমূহ অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। আতশবাজিতে মনে হতো যেন সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীতে আগুন লেগে গেছে। করম আলি লেখেন—'সুগন্ধিদ্রব্য, আলোকসজ্জা এবং আতশবাজিতেই খরচ হয়েছিল ১২ লক্ষ টাকা। দীর্ঘ তিন মাস দিনরাত এক লক্ষ পদাতিক বাহিনী ও এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যদল এবং এক কোটি প্রজা আনন্দ-উৎসব ও সংগীতাদিতে অংশগ্রহণ করেছিল। বিপুল অর্থব্যয়ে আগ্রা ও অন্যান্য স্থান থেকে এসেছিল বহু গায়ক ও নাচিয়ের দল। নবাবদের অর্থবিত্তের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলারই ছিল মণিমুক্তা ছাড়া ৬৮ কোটি টাকার সম্পদ।[১৯৩]

সুলতান ও রাজপরিবারের সদস্যদের পরেই আমির-উমরাগণ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণি। তারা রাষ্ট্র ও সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন দখল করেছিলেন। শুধু প্রতিভার বলেই তারা আমির-উমরার মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজার সিংহাসন ও মর্যাদা এদের সমর্থন ও আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। 'খান-ই-আজম', 'খান-ই-জাহান', 'মজলিশ-ই-আলা', 'মজলিশ-ই-নূর', 'মালিক আল-মুয়াজ্জাম', 'মজলিকা-আল-মুয়াজ্জম' প্রভৃতি ছিল তাদের উপাধি। প্রতিভার বলে অনেক অমুসলিমও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন।

সুলতানি আমলে পীর-দরবেশ ও উলামা ছিলেন সমাজের উচ্চস্তরের নেতৃস্থানীয় ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেণি। তাই অভিজাত আমির-উমরাগণও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী এই অভিজাত শ্রেণি আড়ম্বর ও জাঁকজমকের ব্যাপারে শাসককে অনুসরণ করতেন। ভেতরে ও বাইরে উভয় দিকে সুরুচিপূর্ণভাবে সজ্জিত প্রাসাদে তারা বাস করতেন। তাদের কক্ষসমূহ বহু মূল্যবান গালিচা, সোফা, দিয়ান ও পর্দায় চমৎকারভাবে সজ্জিত ছিল এবং তারা অত্যন্ত জমকালো পোশাক পরিধান করতেন। তারা জমকালো পোশাক পরিহিত অনুচর বাহিনী নিয়ে চলাফেরা করতেন। এরা পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও উৎসব-অনুষ্ঠানে ছিলেন বিলাসী এবং এ কাজে তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। এদের অনেকে হেরেম প্রথাও সংরক্ষণ করতেন। সিবাস্তিয়ান মানরিক গৌড়ের জনৈক সেনাধ্যক্ষের মধ্যাহ্নভোজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

---

[১৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-১০৬

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন পাখি, গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণীর নানা রকম মাংস এবং সিরকায় ভেজানো শসা, মুলা, লেবুর রস ও কাঁচা লঙ্কার সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত ক্ষুধা উত্তেজক আচার পরিবেশন করা হয়। খাদ্যসামগ্রী এত মাত্রাতিরিক্ত ছিল যে, তা আমার নিকট বিরক্তিকর মনে হয়েছিল। খাবার শেষে আসে নানা ধরনের মিষ্টান্ন। এরপরে দেশীয় প্রত্যেক প্রকারের শুকনো ফলমূল। অবশেষে তিনটি ঘণ্টা শেষে আমরা খাবার টেবিল ছেড়ে উঠলাম।

বাংলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ স্বর্ণপাত্রে খাবার গ্রহণ করতেন এবং ভোজানুষ্ঠানে যে যত বেশি স্বর্ণালংকার পরিবেশন করতে পারতেন, তিনি তত বেশি উচ্চমর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতেন। উচ্চ পরিবারের মহিলারা সুন্দরী ও কায়দাদুরস্ত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক সিং-চা-শেঙ্গ লিখেছেন—

রমণীরা খাটো জামা পরিধান করে এবং এর চতুষ্পার্শ্বে এক খণ্ড সুতিবস্ত্র রেশমি বা বুঁটিতোলা রেশমি ওড়না জড়ানো থাকে। তারা কর্ণে স্বর্ণভূষিত মূল্যবান পাথরের দুল ব্যবহার করেন, গলায় হারের সঙ্গে কারুকাজ করা লকেট ঝুলিয়ে রাখেন এবং পিছনে খোঁপা বেঁধে চুলের প্রসাধন করেন। হাতের কবজিতে এবং পায়ের গোড়ালিতে তারা স্বর্ণ নির্মিত বালা-বলয় এবং হাত ও পায়ের আঙুলে আংটি ব্যবহার করেন।

বারবোসার বিবরণ অনুযায়ী, তারা বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিতা এবং স্বর্ণখচিত পলিশ করা উজ্জ্বল অলংকারাদিতে বিভূষিতা। মাহুয়ান লিখেছেন— 'পুরুষেরা তাদের মস্তক মুণ্ডন করেন এবং গোল গলাবন্ধবিশিষ্ট লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করেন; মাথায় সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। কোমরে চওড়া রঙিন রুমাল বাঁধেন। তারা সুচালো চামড়ার জুতা পরেন।'

মুসলিম বাংলার সুলতানি আমলের অভিজাত শ্রেণি একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিবান এবং প্রগতিশীল সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। উলামা ও শেখগণ উচ্চশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। সমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির জন্য তারা উদ্যোগী ছিলেন। আমির-উমরা, রাজকর্মচারীবৃন্দ এবং ভূস্বামীগণও ছিলেন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। তারা বিদ্যানুশীলন করতেন, শিক্ষা ও প্রতিভার উৎসাহ দিতেন, শিষ্টাচার ও আদবকায়দার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করতেন, নতুন রুচির উন্নতি সাধন করতেন, নতুন নকশা উদ্ভাবন করতেন এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাদের দরবার ও আবাসগৃহ ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বিশেষ। তারা যে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সূচনা করেছিলেন, তা বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে সমাজের ব্যাপক সমৃদ্ধি ও উন্নতির পরিচায়ক ছিল।[১৯৪]

---

[১৯৪] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪

https://nagorikpathagar.org

মুর্শিদাবাদের নিয়ামত আমলে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী একটি প্রতিপত্তিশালী অভিজাত শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তিতে এরা মুসলমান কর্মচারীদের অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলছিল। সুবেদারদের আমলের অভিজাত শ্রেণি ছিল প্রধানত সরকারি কর্মচারী। আর সকল চাকরির ভিত্তি ছিল মনসবদারি পদ্ধতি। সামান্য 'মনসব' বা ছোটো সৈন্যদলের নায়ক হিসেবে চাকরি শুরু করে নিজ মেধার জোরে অনেকেই আমিরের পদমর্যাদা অর্জন করতেন এবং অনেকে সুবেদার পর্যন্ত পদমর্যাদার অধিষ্ঠিত হতেন। সুবেদার জাহাঙ্গীর কুলি খান ১৫০০ মনসব নিয়ে যাত্রা শুরু করে ৫০০০ মনসবদারিতে উত্তীর্ণ হন এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার সুবেদারি লাভ করেন। ইসলাম খানও অনুরূপভাবে বাংলার সুবেদার হয়েছিলেন। মাত্র ৩৫ জন সেনার মনসব নিয়ে মুস্তফা খান আলিবর্দি খানের অধীনে ৭০০০ মনসবে উন্নীত হন এবং বাবুর জঙ্গ উপাধি লাভ করেন।

গার্হস্থ্য

সুলতানি আমলে বাংলায় কার্যকরী মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে এ সময়ের কেরানি, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, শিল্পী, স্থপতি, কবি, সংগীতশিল্পীকে বোঝানো যেতে পারে। মসলিন উৎপাদনকারীরাও বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতেন। মির্জা নাথান এক খণ্ড মসলিন চার হাজার টাকায় ক্রয় করেছিলেন। বাংলার বণিকেরাও খুব ধনী ছিলেন এবং তারা বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা সাধারণত সেনাবাহিনীতে যোগ দিত অথবা রাজসরকারের কেরানিগিরি করত। হিন্দুদের বেশির ভাগই করত কৃষিকাজ।

অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানরা ব্যাবসা-বাণিজ্য করতেন এবং বাণিজ্য জাহাজে সমুদ্রযাত্রাও করতেন। তারা সে যুগের দক্ষ নাবিক ছিলেন। তাই হিন্দু ব্যবসায়ীরাও তাদের নাবিক হিসেবে নিয়োগ করত। দর্জির পেশায় মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। হিন্দুরাও তাদের কাপড়চোপড় মুসলমান দর্জিদের দিয়ে বানিয়ে নিত। সুতি বস্ত্র উৎপাদন ছিল মুসলিম বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী শিল্প এবং মুসলমান তাঁতিরা এ পেশায় খুবই দক্ষ ছিল। সে যুগে জোলা (তাঁতি), মুকেরি (পশু ব্যাবসা), পিঠারী (রুটি প্রস্তুতকারী), তিরকার (ধনুক প্রস্তুতকারী) সানকর (তাঁত তৈরিকারী), হাজ্জাম (খতনাকারী), কাগচা (কাগজ তৈরিকারী), পটকার (চিত্রশিল্পী) ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করেছিল মুসলমানরা। মুসলমান আমলে মোল্লা ছিলেন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। মোল্লা ছিলেন তার এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় পণ্ডিত, শিক্ষক ও ইমাম।

https://nagorikpathagar.org

এ যুগের মুসলমানদের পোশাক-আশাক সম্বন্ধে বারবোসা বলেন—'সাধারণ অধিবাসীরা খাটো সাদা শার্ট পরিধান করে, এটি উরু পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। তারা তিন কিংবা চার প্যাঁচবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে থাকে। তারা সকলেই চামড়ার জুতা পরিধান করে এবং কেউ কেউ রেশমি অথবা সোনালি সুতার কাজ করা পাদুকা পরে থাকে।' মাহুয়ান লেখেন—'লোকেরা (মুসলমান) তাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং মাথায় সাদা সুতি পাগড়ি ব্যবহার করে। তারা বন্ধনীযুক্ত লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করে ও মাথায় শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে।' চৈনিক পরিব্রাজকগণ মুসলমানদের অকপট, সরল, সৎ ও ভালো স্বভাবের ধনী হিসেবে অভিহিত করেছেন। কবি মুকুন্দরামের ভাষায়—'তারা জ্ঞানী এবং বিদ্বান; কপটতা ও ফাঁকিবাজি তাদের নিকট অপরিচিত ছিল।'[১৯৫]

ক্রীতদাস একটি প্রাচীন প্রথা। এই প্রথা হিন্দু ও মুসলিম আমলে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। সুলতান রুকন উদ্দিন বরবক শাহ আট হাজার হাবশি ক্রীতদাস আমদানি করেছিলেন। আবুল ফজলের সাক্ষ্যেও মোগল সাম্রাজ্যে এবং বাংলায় দাসত্ব প্রথার প্রমাণ মেলে। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও বারবোসার বিবরণেও বাংলায় দাসত্ব প্রথা ও খোজা প্রথার প্রমাণ মেলে। যুদ্ধবন্দি ছাড়াও দাসদের একটি বড়ো উৎস ছিল আবিসিনিয়া, পারস্য, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া। বাংলায় হাবশি ক্রীতদাসরা এত বেশি প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তারা বাংলার সিংহাসনও দখল করেছিল। সুন্দরী ও গুণবতী ক্রীতদাসীরা হেরেমে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করত। শহরে কর্মচারী হিসেবে এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ করার জন্য ক্রীতদাস কেনাবেচা হতো।

মুসলমানগণ অতি নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। এমনকি পোশাক-আশাকে, আচার-ব্যবহারে এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতেন। কবি মুকুন্দরাম বলেন—

> তারা অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে এবং রঙিন মাদুর বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে। সোলায়মানি তজবিহ পাঠ করে, পীর-পয়গম্বরের ধ্যান করে এবং পীরের আস্তানায় প্রদীপ দেয়। দশ বিশ ভাই একত্রে বসে তারা মামলা নিষ্পত্তি করে। তারা সদাসর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করে।... তারা বড় জ্ঞানী; তারা কাউকে ভয় করে না এবং প্রাণ গেলেও তারা রোজা ছাড়ে না।...মুসলমানরা তাদের মস্তক মুণ্ডন করে এবং বুক

[১৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৪১

https://nagorikpathagar.org

পর্যন্ত দাড়ি রাখে। তারা সর্বদা নিজেদের রীতিনীতি মেনে চলে। তারা মাথায় দশধারা বিশিষ্ট টুপি পরে এবং কোমরে শক্ত করে বাঁধা ইজার পরিধান করে।'[১৯৬]

উৎসব ও বিনোদন

ইসলাম একটি আড়ম্বরহীন সহজ সরল ধর্ম। এর অনুষ্ঠানাদিও অতি অনাড়ম্বর এবং সামান্য। রমজান ধর্মীয়ভাবে সংযম সাধনার মাস হলেও এই মাসে প্রতি রাতে মুসলমান গৃহে খানাপিনার আয়োজন করা হতো। মির্জা নাথান বর্ণনা করেন, রমজান মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ছোটো-বড়ো সকলে প্রত্যহ নিজ নিজ বন্ধুর তাঁবুতে যেত। অনেকে সন্ধ্যাভোজের আয়োজনও করত। ঈদের চাঁদ দেখে মুসলমানরা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠত। এক চাঁদরাতের বর্ণনা দিয়ে মির্জা নাথান লেখেন—'যখন চাঁদ দেখা গেল, তখন শিবিরে রাজকীয় বাজনা বেজে উঠল এবং আগ্নেয়াস্ত্র ক্রমাগত অগ্নি উদ্‌গিরণ করে চলল। রাত্রির শেষ ভাগে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ থেমে গেল। এর স্থলে ভারী কামানের অগ্নি উদ্‌গিরণ শুরু হলো। এ যেন ভূমিকম্প।'

ঈদের দিন নারী-পুরুষ-বালকনির্বিশেষে সকলে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠত। সকলে নতুন নতুন পোশাক পরত। অবস্থাপন্ন লোকেরা পথে পথে টাকা-পয়সা ও উপহার দ্রব্য ছড়িয়ে দিত। সাধারণ মুসলমানগণ গরিবদের দানখয়রাত করতেন। নবাব মুর্শিদকুলি খান ঈদের দিন ঢাকা দুর্গ থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত এক ক্রোশ পথে প্রচুর টাকাকড়ি ছিটিয়ে দিতেন। মুসলমানরা ঈদগাহে সমবেত হয়ে নামাজ আদায় করত এবং একে অপরের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে বাড়ি বাড়ি গমন করত। এভাবে তারা আনন্দ-উৎসব ভাগাভাগি করত। ঈদুল আজহাতে মুসলমান সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, মহিষ বা উট কুরবানি দিত এবং গরিবদের মধ্যে মাংস বিতরণ করত। মির্জা নাথান লেখেন—'উৎসবের দিনে বন্ধুজন, আত্মীয়স্বজন ও রাজকর্মচারীরা একে অন্যের নিকটে যেতেন এবং ঈদ উপলক্ষ্যে তাদের অভিনন্দন জানাতেন।' বাঙালি মুসলমানগণ রাসূল (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীও আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করত। নবাব মুর্শিদকুলি খান এই দিনকে একটি বিরাট উৎসবে পরিণত করেন। তিনি রবিউল আউয়ালের প্রথম ১২ দিন লোকদের আপ্যায়িত করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আতিথেয়তায় উপস্থিত হতেন। ভাগীরথীর তীরভূমিসহ সমগ্র মুর্শিদাবাদ আলোকমালায় সজ্জিত করতেন। ১২ দিনব্যাপী আলোকসজ্জা ও উৎসব অব্যাহত থাকত। তোপ ধ্বনির মাধ্যমেও আনন্দ প্রকাশ করা হতো। শবেবরাতের দিন আলোকসজ্জা ও

---

[১৯৬] প্রাগুক্ত : ২৪০

https://nagorikpathagar.org

আতশবাজির ব্যবস্থা করা হতো। এই দিন ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হতো এবং দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো।

শবেবরাত ছিল মুসলমানদের জনপ্রিয় পর্ব; আরাধনা, খানাপিনা ও আনন্দ-উৎসবের একটি বিশেষ দিন। শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও সুন্নি মুসলমানরাও এই দিনটি পালন করত। মুসলমানরা এই দিনে আনন্দ-উৎসব ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করত। মুহাররমের প্রথম ১০ দিন রোজা রাখত। শেষের দিন তারা সমাধি-চিতা তৈরি করে এগুলো একটির পর একটি জ্বালিয়ে দিত। লোকেরা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং লাথি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলত। তারা হাসান-হুসাইনের নাম করে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করত।

ষোড়শ শতকে মোগল অধিকারের পর এই প্রদেশে শিয়া প্রভাব অনুভূত হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে বিশেষত শাহজাদা সুজার সুবেদারির আমলে বাংলায় বহুসংখ্যক শিয়া বসতি স্থাপন করেছিল। সম্রাট শাহজাহানের সময় আগ্রার মুহাররম শোভাযাত্রার বিবরণ দিয়ে মানডেলসলো লেখেন—তির-ধনুক, পাগড়ি, ভোজালি এবং পশমি পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত শবধারাগুলো শোভাযাত্রা সহকারে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো এবং অশ্রুসিক্ত চোখে বিলাপ করতে করতে লোকেরা তা অনুসরণ করত। তাদের অনেকে নিজেদের দেহে এমনভাবে তরবারির আঘাত করত ও ক্ষত সৃষ্টি করত যে, কয়েক জায়গা থেকে রক্তও বেরিয়ে আসত। এইসব অনুষ্ঠানাদি মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর বাংলাতেও হতো। মুর্শিদাবাদের নবাবদের সময়ে শিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা ইমামবাড়া নির্মাণ করে তাজিয়া বের করত। নবাবদের সময়ে মুহররম একটি জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। মুহাররমের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব শুরু হতো এবং সেই রাত্রি থেকে ইমামবাড়ার 'নহবত খানা'য় করুণ সুর বাজানো হতো। ইমামবাড়ার দেওয়ালে দেওয়ালে মোমবাতি জ্বালানো হতো। চতুর্থ দিবস থেকে মর্সিয়া (শোকসংগীত) শোনার জন্য ইমামবাড়াতে লোকেরা সমবেত হতো। মর্সিয়া-গায়করা দলে দলে তাদের নিজস্ব নিশান নিয়ে সমাগত হতো। ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে আতশবাজি পোড়ানো হতো। সপ্তম দিনে ইমামবাড়ায় আলোকসজ্জা করা হতো। অষ্টম দিনে মহিলারা ইমামবাড়ায় সমবেত হতো এবং শোকসংগীত পরিবেশন করত। নবম দিনে শোভাযাত্রা বের করা হতো এবং রাত্রিবেলা লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হতো। দশম দিনকে বলা হতো আশুরা এবং এই দিনই তাজিয়া মিছিল বের হতো।

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে খোয়াজ খিজিরের স্মরণে বেড়া উৎসব পালিত হতো। নবাব মুর্শিদকুলি খান বিরাট আড়ম্বরের সাথে এই উৎসব পালন করতেন। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে পালিত এই অনুষ্ঠানটি প্রথম ঢাকায়

https://nagorikpathagar.org

চালু করেন নবাব মুকাররম খান। খোয়াজ খিজিরকে জলরাশির অভিভাবক মনে করে অনুষ্ঠানটি পালন করা হতো। নবাব মুর্শিদকুলি খান ৩০০ ঘনফুট আকারের একটি নৌকা তৈরি করে তার ওপরে নির্মাণ করেন ঘর ও মসজিদ। তারপর ব্যাপক আলোকসজ্জা করে জাহাজটি নদীতে ভাসিয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানে আতশবাজিও পোড়ানো হতো।

কোনো শিশু, বিশেষত কোনো শিশুপুত্রের জন্ম সমাজে বিরাট একটি আমোদ-প্রমোদের মুহূর্ত ছিল। মির্জা নাথানের একটি শিশুপুত্রের জন্মের সংবাদে বাংলায় মোগল সেনাবাহিনী পূর্ণ এক দিন আনন্দ-উৎসবে অতিবাহিত করেন। বিরাট ভোজ দেওয়া হয় এবং অভ্যাসগত অতিথিদের উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। শুভক্ষণ উদ্‌যাপন করতে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এভাবে শিশুর জন্মের পর সংগীত, নৃত্য ও মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা হতো এবং কখনো কখনো সাত দিন পর্যন্ত এ আনন্দ-উৎসব চলত। নামকরণ ও আকিকার দিনেও অবস্থাপন্ন মুসলিমরা ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করত। শিশুর হাতেখড়ির দিন পালন করা হতো বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠান। শিশুর ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে এই অনুষ্ঠান পালন করা হতো। খাতনা অনুষ্ঠানও আড়ম্বরের সাথে পালন করা হতো। মুসলমানদের বিয়েশাদিও খুব ধুমধামের সাথে পালন করা হতো। উচ্চ পরিবারের বিয়েগুলো আরও আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। বিয়ের ব্যাপারে দু-পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছালেই শুরু হতো 'তিলক' বা মাগদি নামে পরিচিত বাগদান উৎসব। লগন থেকে চলত বিয়ের প্রস্তুতি। সাচক (মেহেদি লাগানো/গায়ে হলুদ) অনুষ্ঠানও খুব আমোদ-প্রমোদ ও ধুমধামের সাথে পালিত হতো। আমরা পূর্বে সাচক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকরামউদ্দৌলার বিয়েতে খরচ করা হয়েছিল অমিত পরিমাণ অর্থ, আমরা পূর্ব তা উল্লেখ করেছি। সিরাজউদ্দৌলার দ্বিতীয় বিয়ে আকরামউদ্দৌলার চেয়েও আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছিল। নবাব আলিবর্দি এই ঘটনাকে একটি জমকালো আনন্দ-উৎসবে পরিণত করেছিলেন। সারাটা বর্ষাকাল প্রতিটি গৃহের প্রতিটি রাত্রি শবেবরাতের মতো এবং প্রতিটি দিন নববর্ষ দিনের মতো উৎসবমুখর ছিল। আকরামউদ্দৌলার বিয়েতে আলিবর্দি খান এক হাজার মূল্যবান পোশাক বিতরণ করেছিলেন এবং শাহবাত জঙ্গ তার সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম, অনুচরবর্গ, সঙ্গীসাথি এবং সংগীতশিল্পীদের মধ্যে এক হাজার কাপড় বিতরণ করেন—যার একেকটির মূল্য ছিল একশ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে উভয়ের গৃহে খানাপিনা চলতে থাকে। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের এমন কেউ ছিলেন না, যিনি বারবার ভোজপর্বে অংশ নেয়নি। মৃতের মঙ্গল কামনায়ও ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হতো। মির্জা নাথান তার পিতার

https://nagorikpathagar.org

মৃত্যুতে বিরাট ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এতে এত লোক সমাগম হয় যে, তিনি লেখেন—'এটা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।'

উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো কবি, গল্পকথক, রসিক ও সংগীতজ্ঞদের প্রতিযোগিতায় সজীব হয়ে উঠত। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মাঝেও এরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হতো। মোগল সেনাবাহিনী বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতিটি বিজয় উৎসব পালন করত। সামরিক অফিসারগণ বিরাট ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। বিপুলসংখ্যক লোক এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। সে যুগে খেলাধুলা ছিল জনপ্রিয় আমোদানুষ্ঠান। উচ্চশ্রেণির লোকেরা চৌহান (হকির মতো) খেলতে ভালোবাসতেন। চৌপর বা পাশাখেলারও প্রচলন ছিল। বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে এটি খেলা হতো। বাসরঘরে বর-কনে এই খেলা খেলে থাকত। বালকেরা পুষ্পবল দিয়ে খেলত 'ঘেরু' খেলা। মুরগি বাজি বা মোরগ লড়াই, পারাবত উড়াল, বাঘকে পোষ মানানো, সাঁতার কাটা, নৌকা-বাইচ ইত্যাদি ছিল সে যুগের জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদ।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় সংগীত ও নৃত্যকলা খুবই প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। বাঙালিরা এত বেশি সংগীতের চর্চা করত যে, তা দেখে বারবোসা লেখেন—'বাঙালিরা যন্ত্রসংগীতে ও গানে খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ছিলেন।' *বাহারিব-স্তান-ই-গায়েবি*-র প্রণেতা মির্জা নাথান লেখেন—'বাঙালি গায়করা তাদের সুমিষ্ট সংগীতের দ্বারা যশোহরে অবস্থানরত মোগল কর্মচারী ও সৈন্যদের চিত্তরঞ্জন করেছিল।' মুসলিম আমলে প্রতিটি সামাজিক উৎসবে সংগীত ও নৃত্যকলা ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। চীনা দূত বাংলার সংগীত ও নৃত্যকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখেন—'সুরাপান ও ভোজানুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বাঙালিরা ছিল সুগায়ক ও নৃত্যপটীয়সী।' মহুয়ান বলেন—

> সেখানে (বাংলায়) আরেক শ্রেণির সংগীতশিল্পী (কান-সিয়াও-সুলু-নাল) রয়েছে; এরা প্রতিদিন ভোর চারটা সময় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের গৃহে গমন করে। কেউ তুরী যন্ত্র বাজায়, কেউ ক্ষুদ্র ঢোল বাজায়, কেউবা একটু বড় ধরনের ঢোল বাজায়। আরম্ভ করার সময় তাদের কণ্ঠ থাকে মন্থর; ধীরে ধীরে তাদের কণ্ঠ বাড়তে থাকে, তারপর একসময় সহসা সংগীত নেমে যায়। এভাবে তারা প্রতিগৃহে গমন করে।[১৯৭]

[১৯৭] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

https://nagorikpathagar.org

সারণি-০৫

১২০৫-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তাগণ

ক্রম	পদ ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি	দিল্লির প্রতিনিধি	লক্ষনৌতি পরে দেবকোট	৬০১-৬০২ হি. ১২০৫-১২০৬ খ্রি.
২.	ইজ্জ উদ্দিন মুহাম্মাদ শিরান খলজি	স্বাধীন	দেবকোট	৬০২-৬০৩ হি. ১২০৬-১২০৭ খ্রি.
৩.	হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি (প্রথমবার)	দিল্লির প্রতিনিধি	দেবকোট	৬০৩-৬০৬ হি. ১২২৭-১২২৯ খ্রি.
৪.	আলা উদ্দিন আলি মর্দান খলজি	দিল্লির প্রতিনিধি, পরে স্বাধীন	দেবকোট	৬০৬-৬০৯ হি. ১২০৯-১২১২ খ্রি.
৫.	গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি (দ্বিতীয়বার)	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬০৯-৬২৪ হি. ১২১২-১২২৭ খ্রি.
৬.	নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ বিন ইলতুৎমিশ	দিল্লির প্রতিনিধি	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬২৪-৬২৬ হি. ১২২৭-১২২৯ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

১৪.	ইখতিয়ার উদ্দিন ইউজবক তুঘরিল খান	দিল্লির প্রতিনিধি, পরে স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৪৮-৬৫৫ হি. ১২৫০-১২৫৭ খ্রি.
১৫.	বলবন ইউজবকি	দিল্লির অনুগত	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৫৫-৬৫৭ হি. ১২৫৭-১২৫৯ খ্রি.
১৬.	তাজ উদ্দিন সনজর আরসলান খান	অনধিকার প্রবেশকারী, পরে স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৫৭-৬৬০ হি. ১২৫৭-১২৫৯ খ্রি.
১৭.	তাতার খান	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৬১-৬৬৫ হি. ১২৫৯-১২৬২ খ্রি.
১৮.	আমির খান/শের খান	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৬৬-৬৭৭ হি. ১২৬৬-১২৭৮ খ্রি.
১৯.	মুগিস উদ্দিন তুঘরিল	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৭৭-৬৮২ হি. ১২৭৮-১২৮৩ খ্রি.

বলবনি বংশ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (বগরা খান) বিন বলবন	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৮২-৬৯০ হি. ১২৮৩-১২৯১ খ্রি.
২.	রুকন উদ্দিন কাইকাউস বিন বগরা খান	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৬৯০-৭০১ হি. ১২৯১-১৩০১ খ্রি.
৩.	শামস্ উদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন বাগরা খান	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৭০১-৭২২ হি. ১৩০১-১৩২২ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

৪.	জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ বিন ফিরোজ শাহ	পিতার অধীনস্থ বা বিদ্রোহী	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৭০৭-৭০৯ হি. ১৩০৭-১৩০৯ খ্রি.
৫.	শিহাব উদ্দিন বুগদাহ শাহ বিন ফিরোজ শাহ	পিতার অধীনস্থ বা বিদ্রোহী	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৭১৭-৭১৮ হি. ১৩১৭-১৩১৮ খ্রি.
৬.	গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ বিন ফিরোজ শাহ	কিছু সময় স্বাধীন, কিছু সময় দিল্লির অধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৭২২-৭২৪ হি. ১৩২২-১৩২৩ খ্রি.
৭.	নাসির উদ্দিন ইবরাহিম শাহ বিন ফিরোজ শাহ	দিল্লির অধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৭২৪ হি. ১৩২৪ খ্রি.

বাংলা যখন তিন ভাগে বিভক্ত

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	বাহরাম খান (বা তাতার খান)	দিল্লির প্রতিনিধি	সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা	৭২৫-৭৩৯ হি. ১৩২৫-১৩৩৮ খ্রি.
২.	কদর খান	দিল্লির প্রতিনিধি	লক্ষনৌতির শাসনকর্তা	৭২৫-৭৩৯ হি. ১৩২৫-১৩৩৮ খ্রি.
৩.	ইজ্জ উদ্দিন আজমল মুলক	দিল্লির প্রতিনিধি	সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা	৭২৫-৭৩৯ হি. ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি

বাংলা যখন তিন ভাগে বিভক্ত

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (ফখরা শাহ)	স্বাধীন	সোনারগাঁ	৭৩৯-৭৫০ হি. ১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

২.	ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ বিন মুবারক শাহ	স্বাধীন	সোনারগাঁ	৭৫০-৭৫৩ হি. ১৩৪৯-১৩৫২ খ্রি.
৩.	আলা উদ্দিন আলি শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি	৭৪৩ হি. ১৩৪২ খ্রি.

ইলিয়াস শাহি বংশ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া (সমগ্র বাংলা)	৭৪৩-৭৫৮ হি. ১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি.
২.	সেকান্দর শাহ বিন ইলিয়াস শাহ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৭৫৯-৭৯২ হি. ১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রি.
৩.	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ বিন সেকান্দর শাহ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৭৯২-৮১৩ হি. ১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.
৪.	সৈফদ্দিন হামজা শাহ বিন আজম শাহ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮১৩-৮১৪ হি. ১৪১০-১৪১১ খ্রি.
৫.	শিহাব উদ্দিন বায়েজিদ শাহ (হামজা শাহের ভৃত্য)	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮১৫-৮১৭ হি. ১৪১২-১৪১৪ খ্রি.
৬.	আলা উদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন বায়েজিদ শাহ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮১৭ হি. ১৪১৪ খ্রি.

রাজা গণেশের বংশ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	রাজা গণেশ (কন্স)	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮১৮ হি. ১৪১৫ খ্রি.
২.	জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ (যদু) (রাজা গণেশের পুত্র)	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮১৮-৮১৯ হি. ১৪১৫-১৪১৪ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

৩.	দনুজ মর্দনদেব নাম গ্রহণপূর্বক গণেশের পুনরায় সিংহাসন দখল	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮২০-৮২১ হি. ১৪১৭-১৪১৮ খ্রি.
৪.	জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহের পুনরায় শাসন গ্রহণ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮২১-৮৩৫ হি. ১৪১৮-১৪৩১ খ্রি.
৫.	শাহসুদ্দিন আহমদ শাহ বিন মাহমুদ শাহ	স্বাধীন	পাণ্ডুয়া	৮৩৫-৮৬৪ হি. ১৪৩১-১৪৩৬ খ্রি.

ইলিয়াস শাহি বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (মাহমুদ শাহি বংশ)

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৪০-৮৬০ হি. ১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রি.
২.	রুকন উদ্দিন বারবক শাহ বিন নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৬৪-৮৭৯ হি. ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.
৩.	শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ বিন বারবক শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৭৯-৮৮৬ হি. ১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.
৪.	সেকান্দর শাহ বিন শাসুদ্দিন ইউসুফ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৮৬ হি. ১৪৮১ খ্রি.
৫.	জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ বিন নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৮৬-৮৯১ হি. ১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি.

হাবশি সুলতানগণ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	বারবক শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৪০-৮৬০ হি. ১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

২.	সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৯২-৮৯৬ হি. ১৪৮৬-১৪৯০ খ্রি.
৩.	নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৯৬ হি. ১৪৯০ খ্রি.
৪.	শামস উদ্দিন মুজাফফর শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৯৬-৮৯৯ হি. ১৪৯০-১৪৯৩ খ্রি.

হোসেন শাহি বংশ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	আলা উদ্দিন হোসেন শাহ বিন সৈয়দ আশরাফ আল হোসেইনি	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৮৯৯-৯২৫ হি. ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.
২.	নাসির উদ্দিন নসরত শাহ বিন হোসেন শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯২৫-৯৩৮ হি. ১৫১৯-১৫৩১ খ্রি.
৩.	আলা উদ্দিন ফিরোজ শাহ বিন নসরত শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৩৮-৯৩৯ হি. ১৫৩১-১৫৩৫ খ্রি.
৪.	গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি	৯৩৯-৯৪৫ হি. ১৫৩২-১৫৩৮ খ্রি.

দিল্লির অধীনে বাংলা

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	হুমায়ুন		লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৪৫ হি. ১৫৩৯ খ্রি.
২.	শেরশাহ সূর		লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৪৭-৯৫২হি.
৩.	ইসলাম শাহ সূর		লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৫২-৯৬০ হি. ১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রি.
৪.	ফিরোজ খান		লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৬১ হি. ১৫৫৩ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

১.	শামসু উদ্দিন মাহমুদ শাহ গাজি	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৬১-৯৬৩ হি. ১৫৫৪-১৫৫৩ খ্রি.
২.	গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৫২-৯৬৩ হি. ১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রি.
৩.	গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৬৩-৯৬৮ হি. ১৫৫৫-১৫৬০ খ্রি.
৪.	জালাল শাহের পুত্র (নাম অজ্ঞাত)	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৭১ হি. ১৫৬৩ খ্রি.

কররানি বংশ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	তাজ খান কররানি	স্বাধীন	লক্ষনৌতি (গৌড়)	৯৭২ হি. ১৫৫৩ খ্রি.
২.	সুলাইমান কররানি (তাজ খান কররানির ভ্রাতা)	স্বাধীন	তান্ডা (তাড়া)	৯৭৩-৯৮০ হি. ১৫৬৫-১৫৭২ খ্রি.
৩.	বায়েজিদ কররানি (বিন সুলাইমান কররানি)	স্বাধীন	তান্ডা (তাড়া)	৯৮০ হি. ১৫৭২ খ্রি.
৪.	দাউদ কররানি (বিন সুলাইমান কররানি)	স্বাধীন	তান্ডা (তাড়া)	৯৮০-৯৮৪ হি. ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.

বাংলায় মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ

ক্রম	নাম ও পদবি	পদমর্যাদা	রাজধানী	শাসনকাল
১.	খান-ই-খানন মুমিন খান	সুবেদার	গৌড় (পরবর্তী সময় তান্ডা)	৯৮৪ হি. ১৫৭৫ খ্রি.
২.	খান-ই-জাহান হোসেন কুলি খান	সুবেদার	তান্ডা	৯৮৪-৯৮৬ হি. ১৫৭৬-১৫৭৮ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

৩.	ইসমাইল কুলি (অস্থায়ী)	সুবেদার	তান্ডা	৯৮৬-৯৮৭ হি. ১৫৭৮-১৫৭৯ খ্রি.
৪.	মুজাফফর খান তুরবকি	সুবেদার	তান্ডা	৯৮৭-৯৮৮ হি. ১৫৭৯-১৫৮০ খ্রি.
৫.	খান-ই-আজম মির্জা আজিজ কোকা	সুবেদার	তান্ডা	৯৯১ হি. ১৫৮৩ খ্রি.
৬.	ওয়াজির খান (অস্থায়ী)	সুবেদার	তান্ডা	৯৯১ হি. ১৫৮৩ খ্রি.
৭.	শাহবাজ খান	সুবেদার	তান্ডা	৯৯১-৯৯২ হি. ১৫৮৩-১৫৮৪ খ্রি.
৮.	সাদিক খান	সুবেদার	তান্ডা	৯৯৪ হি. ১৫৮৫ খ্রি.
৯.	কাহবাজ খান (দ্বিতীয়বার)	সুবেদার	তান্ডা	৯৯৫ হি. ১৫৮৬ খ্রি.
১০.	ওয়াজির খান	সুবেদার	তান্ডা	৯৯৫-৯৯৬ হি. ১৫৮৬-১৫৫৭ খ্রি.
১১.	সাঈদ (সৈয়দ) খান	সুবেদার	তান্ডা	৯৯৬-১০০৩ হি. ১৫৮৭-১৫৯৪ খ্রি.
১২.	রাজা মানসিংহ	সুবেদার	রাজমহল	১০০৩-১০১৫ হি. ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রি.
১৩.	কুতুব উদ্দিন খান কোকা	সুবেদার	রাজমহল	১০১৫-১০১৬ হি. ১৬০৬-১৬০৭ খ্রি.
১৪.	জাহাঙ্গীর কুলি বেগ	সুবেদার	রাজমহল	১০১৬-১০১৭ হি. ১৬০৭-১৬০৮ খ্রি.
১৫.	ইসলাম খান চিশতি	সুবেদার	ঢাকা	১০১৭-১০২২ হি. ১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.
১৬.	শেখ হোসাইন (অস্থায়ী)	সুবেদার	ঢাকা	১০২৩ হি. ১৬১৪ খ্রি.
১৭.	কাশিম খান চিশতি	সুবেদার	ঢাকা	১০২৩-১০২৮ হি. ১৬১৪-১৬১৭ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

১৮.	ইবরাহিম খান	সুবেদার	ঢাকা	১০২৮-১০৩৪ হি. ১৬১৮-১৬২৪ খ্রি.
১৯.	দারাব খান	সুবেদার	ঢাকা	১০৩৪-১০৩৫ হি. ১৬২৪-১৬২৫ খ্রি.
২০.	মহব্বত খান	সুবেদার	ঢাকা	১০৩৫-১০৩৬ হি. ১৬২৫-১৬২৬ খ্রি.
২১.	মোকারম খান চিশতি	সুবেদার	ঢাকা	১০৩৬-১০৩৭ হি. ১৬২৬-১৬২৭ খ্রি.
২২.	ফিদাই খান	সুবেদার	ঢাকা	১০৩৭-১০৩৮ হি. ১৬২৭-১৬২৮ খ্রি.
২৩.	কাশিম খান জুয়িনি	সুবেদার	ঢাকা	১০৩৮-১০৪২ হি. ১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.
২৪.	আজম খান	সুবেদার	ঢাকা	১০৪২-১০৪৪ হি. ১৬৩২-১৬৩৫ খ্রি.
২৫.	ইসলাম খান মাশাদি	সুবেদার	ঢাকা	১০৪৫-১০৪৯ হি. ১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.
২৬.	সাইফ খান (অস্থায়ী)	সুবেদার	ঢাকা	১০৪৯ হি. ১৬৩৯ খ্রি.
২৭.	শাহজাদা মুহাম্মাদ সুজা	সুবেদার	রাজমহল	১০৪৯-১০৭০ হি. ১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রি.
২৮.	মির জুমলা (মুয়াজ্জেম খান)	সুবেদার	ঢাকা	১০৭১-১০৭৪ হি. ১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.
২৯.	দিল্লির খান (অস্থায়ী)	সুবেদার	ঢাকা	১০৭৪ হি. ১৬৬৩ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

৩৩.	শাহজাদা মুহাম্মাদ আজম	সুবেদার	ঢাকা	১০৮৯-১০৯০ হি. ১৬৭৮-১৬৮৮ খ্রি.
৩৪.	শায়েস্তা খান (দ্বিতীয়বার)	সুবেদার	ঢাকা	১০৯১-১১০০ হি. ১৬৮০-১৬৮৮ খ্রি.
৩৫.	খান-ই-জাহান বাহাদুর	সুবেদার	ঢাকা	১১০০-১১০১ হি. ১৬৮৮-১৬৮৯ খ্রি.
৩৬.	ইবরাহিম খান	সুবেদার	ঢাকা	১১০১-১১০৯ হি. ১৬৮৯-১৬৯৮ খ্রি.
৩৭.	শাহজাদা আজিম উদ্দিন (পরে আজিম-উশ-শান)	সুবেদার	ঢাকা	১১০৯-১১২৪ হি. ১৬৯৮-১৭১২ খ্রি.
৩৮.	শাহজাদা ফরুখ শিয়ার (অপ্রাপ্ত)	সুবেদার	ঢাকা	১১২৫ হি. ১৭১৩ খ্রি.
৩৯.	মির জুমলা বা মুজাফফর জঙ্গ	সুবেদার	ঢাকা	১১২৫-১১২৯ হি. ১৭১৩-১৭১৬ খ্রি.
৪০.	মুর্শিদকুলি খান	সুবেদার (নবাব)	মুর্শিদাবাদ	১১৩০-১১৪০ হি. ১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.
৪১.	সুজা উদ্দিন মুহাম্মাদ খান (মুর্শিদকুলি খানের জামাতা)	স্বাধীন	মুর্শিদাবাদ	১১৪১-১১৫২ হি. ১৭২৮-১৭৩৯ খ্রি.
৪২.	সরফরাজ খান (বিন সুজা উদ্দিন)	স্বাধীন	মুর্শিদাবাদ	১১৫২-১১৫৩ হি. ১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.

https://nagorikpathagar.org

মুসলিম শাসনামলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলাম অগ্রগতির ধর্ম। এটি মানবসভ্যতার ইতিহাসে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির সৃষ্টি করেছে। বাংলার মুসলমান শাসকেরা খিলাফত যুগের পূর্বসূরিদের নিকট হতে একটি মূল্যবান শিক্ষাপদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তারা মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ার শিক্ষা ও জ্ঞানের মশাল বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। বাংলার শাসনকর্তা, আমির-উমরা, রাজকর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত। তারা সকল উপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। উলামা ও সুফি-দরবেশগণও শিক্ষার উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন। ফলে শহরে ও প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহুসংখ্যক মাদরাসা, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মসজিদকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল মাদরাসা। অনেক খ্যাতনামা আলিমও মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি বিখ্যাত সুফি পণ্ডিতদের কয়েকটি খানকাও শিক্ষার একেকটি উজ্জ্বল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তবাকাত-ই-নাসিরি-র সাক্ষ্যে জানা যায়, বঙ্গ বিজেতা মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি গৌড়ে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজিও (১২১২-২৭) একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে গৌড়ের ওমরপুরে 'দরাসবাড়ি' (পাঠশালা) নামে একটি মাদরাসার নিদর্শন পাওয়া গেছে। গৌড়ের ছোটো সাগরদিঘির পার্শ্বে যে বড়ো দালানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, জনশ্রুতি অনুসারে দালানটি 'বেলবাড়ি' মাদরাসা। আধুনিক মালদহের ইংলিশ বাজারেও আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৫০২) একটি চমৎকার মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মহিসুনে মাওলানা তজি উদ্দিন আরাবি একটি 'জ্ঞানকেন্দ্র' পরিচালনা করতেন। বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত ইয়াহিয়া মানেরি মাওলানা তজি উদ্দিন আরাবির মহিসুন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁওয়ে একটি ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বুখারায় জন্মগ্রহণকারী আবু তাওয়ামা (মৃ. ১৩০০) ছিলেন একজন হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রবিদ। সাধারণ বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ও

https://nagorikpathagar.org

প্রকৃতি বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তার ছাত্র ছিলেন শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি। সোনারগাঁও সে সময় বাংলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সুফি শেখ আলাউল হক তার নির্বাসনের দুই বছর এখানেই অতিবাসিত করেন। একইভাবে তাঁর পৌত্র শেখ বদর-ই-ইসলাম এবং প্রপৌত্রি শেখ জাহিদি তাদের নির্বাসনকাল এখানে অতিবাহিত করেন। নুসরত শাহের রাজত্বকালে (১৫২৩) সোনারগাঁওয়ের একজন মসজিদ নির্মাতার পরিচয় শিলালিপিতে এভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে—'একজন প্রসিদ্ধ ইসলামি আইনজ্ঞ ও মুহাদ্দিস, ফিকাহ ও হাদিস শিক্ষাদাতাদের প্রধান।' এতে বোঝা যায়, ষোড়শ শতক পর্যন্ত সোনারগাঁও তার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল।

সুলতান রুকন উদ্দিন কায়কাউসের রাজত্বকালে (১২৯৩ খ্রি.) কাজি আল নাসির সাতগাঁওয়ের ত্রিবেণীতে একটি মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে জাফর খান এই অঞ্চলে 'দারুল খায়রাত' নামে আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বীরভূম জেলার নাগোরেও ছিল একটি শিক্ষাকেন্দ্র। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর সূত্রে জানা যায়, এখানে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ও শেখ নুর কুতুব-উল-আলম বাল্যকালে হাসিদ উদ্দিন কুনুনসিনের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৫০২ সালে সুলতান হোসেন শাহের আদেশে মান্দারনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি মাদরাসা। শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজি, শেখ আখি সিরাজ উদ্দিন উসমান, শেখ আলাউল হক, শেখ নুর কুতুব-উল-আলম, শেখ জাহিদসহ বহু আলিম-উলামার পদভারে সমৃদ্ধ পাণ্ডুয়া ছিল সুলতানি বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ, রুকন উদ্দিন বারবক শাহ, শামস্ উদ্দিন ইউসুফ শাহ ও জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের মতো বিদ্বান ও জ্ঞানী সুলতানদের রাজধানীও ছিল এই পাণ্ডুয়া। ফলে পুরো সুলতানি আমলে পাণ্ডুয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

রাজশাহী জেলার বাঘাও ছিল একটি প্রাণবন্ত শিক্ষাকেন্দ্র। সুলতান নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩৪) এখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এখানে একটি বড়ো মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাডাম তার শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টে বাঘাকে ফারসি শিক্ষার কেন্দ্ররূপে উল্লেখ করেন। রংপুর, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র নির্মিত হয়েছিল। মোগল আমলেও অনেক নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উচ্চশিক্ষার নতুন কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। সুবেদার ইসলাম খানের আমল থেকে রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুবেদার,

https://nagorikpathagar.org

নবাব, অভিজাত শ্রেণি, রাজকর্মচারীবৃন্দ ও মনসবদারগণ সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। শেখ উলামাগণ খানকাসমূহে এবং তাদের স্বীয় গৃহে বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। মসজিদ ও ইমামবাড়াগুলোতেও মাদরাসা স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশদের শিক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়—এমন একটি মাদরাসা কিংবা ইমামবাড়া ছিল না, যেখানে আরাবি ও ফারসির অধ্যাপকদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো না।

প্রারম্ভিক ইসলামিক সমাজে শিক্ষার সূচনা হতো মসজিদে এবং এর বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ ছিল আদব ও ফিকাহর মধ্যে। কিন্তু মাদরাসা পরবর্তী সময়ে আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তখন তাতে সুন্নি মাজহাবের দিকনির্দেশনায় কুরআন, হাদিস এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখা ফালাসাফা, গণিত, রসায়ন ও স্বাস্থ্যশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত হয়। বেলবাড়ি মাদরাসার শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 'জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনে চীনা দেশে যাও' বাক্য প্রমাণ করে, সম্ভবত বিজ্ঞানের বিস্তৃত বিষয় এখানে পড়ানো হতো। গৌড়ের 'দরাসবাড়ি' মাদরাসার প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণে প্রতীয়মান হয়, এই মাদরাসা স্থাপত্য বাগদাদ অথবা নিশাপুরস্থ মাদরাসা থেকে কিছুটা ভিন্ন।[১৬৮] বাংলার মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য এবং সামাজিক সম্মানের বিষয়রূপে পরিগণিত হতো। মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু হতো মক্তবে। মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি সংলগ্ন ছিল। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত, এমনকি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়াতেও এমনই অবস্থা ছিল। কবি মুকুন্দরাম বলেন—'মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলেমেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলভিগণ শিক্ষা দিতেন।'

সে সময় প্রাথমিক বিদ্যালয় 'মক্তব' পাঠশালা নামে অভিহিত হতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষারও প্রচলন ছিল। ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে শিশুর 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাতেখড়ি হতো এবং পাঁচ বছর বয়স থেকে শিশু স্কুলে গমন করত। অবশ্য বেশি বয়সেও যাওয়ার প্রমাণ আছে। যেমন—কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের *লাইলি-মজনু* কাব্য থেকে জানা যায়, মজনু সাত বছর বয়সে পাঠশালায় গিয়েছিল। তবে বাংলাসহ সমগ্র মুসলিম ভারতে বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা শুরু হতো। একজন শিক্ষক কুরআন থেকে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য মুসলমান পিতা-মাতা যে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করতেন, তা বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠান থেকে প্রমাণিত হয়।

---

[১৬৮] স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

https://nagorikpathagar.org

প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ইমামই ছিলেন শিক্ষক; বিশেষ করে তিনি ছেলেমেয়েদের কুরআন পাঠ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিতেন। ১৮৩৫ সালে অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে বলেন, ৪০,০০০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ বিদ্যালয় ছিল। অর্থাৎ ৩০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে বিদ্যালয়। মনে রাখা প্রয়োজন, মি. অ্যাডাম যে সময়ের রিপোর্ট পেশ করছেন, তারও ১০০ বছর পূর্বে পলাশির প্রান্তরে মুসলিম শক্তির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। তথাপি এত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি মুসলিম বাংলার শিক্ষা সমৃদ্ধির অকাট্য দলিল বহন করে।

ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকানির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশুসন্তানকে ধর্মের মূলনীতিসমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো। কুরআন, হাদিস, ক্যালিওগ্রাফি, ফারসি, আরবি ও বাংলা ভাষাও পড়ানো হতো। সমগ্র মুসলমান শাসনামলে ফারসি ছিল রাজভাষা ও শিক্ষার বাহন। সুতরাং এ সময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বাংলা ছিল বহু মুসলিম-অমুসলিমের মাতৃভাষা। কাজেই বাংলাও অবহেলিত ছিল না। বাংলার মুসলমান শাসকগণ বহিরাগত হলেও এ দেশকে তারা নিজ দেশ ও বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় তাদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বেশির ভাগ মুসলমান আরবি ও ফারসি ভাষা বুঝতে অক্ষম ছিলেন। সেজন্য তারা বাংলা ভাষায় লিখতেন, যাতে সাধারণ লোকেরা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর লিখিত পুস্তকাদি পড়তে ও বুঝতে পারে।

সুতরাং মুসলিম আমলে বাংলা পড়ানো হতো এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এই ভাষাই শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল।[১৯৯] *শমসের গাজির পুথি* নামক বাংলা কাব্য থেকে জানা যায় যে, শমসের গাজি একটি 'তুলবা-ই-খানা' (বিদ্যালয়) স্থাপন করেন। তার স্কুলের জন্য ঢাকা থেকে একজন মুনশি, হিন্দুস্তান থেকে একজন মৌলভি ও জুগদিয়া থেকে একজন পণ্ডিত যথাক্রমে ফারসি, আরবি ও বাংলা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আনেন। তা ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অঙ্কের মৌলিক শিক্ষা, যেমন : যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, কাঠাকিয়া, গন্ডাকিয়া ও বিক্ষকিয়া শিক্ষা দেওয়া হতো। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবি, ফারসি, বাংলা; ধর্ম, নীতিমালা, গদ্য-পদ্য, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো।[২০০] রাজভাষা ফারসি শেখার জন্য কায়স্থ হিন্দুরাও মৌলভিদের নিকট মক্তবে ফারসি শিক্ষা নিত। রাজস্ব বিভাগের কাজ প্রায়ই কায়স্থদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

---

[১৯৯] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[২০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

https://nagorikpathagar.org

এসব হিন্দুরা অবশ্যই ফারসি ভাষা শিখেছিল, অন্যথায় রাজসরকারের চাকরিতে তাদের নিয়োগ সম্ভব ছিল না। *বিদ্যাসুন্দর*-এর লেখক রামপ্রসাদ সেনকে তার পিতা একজন মৌলভির নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

মাদরাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হতো। বহু মসজিদ ও ইমামবাড়াতেও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদরাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করতেন। কাজি নাসির উদ্দিনের ত্রিবেণীর মাদরাসায় ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। বাঘার মাদরাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। ছাত্ররা সেখানে বিনা খরচে শিক্ষা, আহার, বাসস্থান, কাপড়চোপড়, তেল, প্রসাধনী-দ্রব্যাদি এবং মূলগ্রন্থ পাণ্ডুলিপি নকল করার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ সবকিছু পেত। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। মি. অ্যাডাম বলেন—

> এগুলো (বীরভূমের বিদ্যালয়সমূহ) ধর্মীয় দানের দ্বারা পরিচালিত হতো। বিনা খরচে ছাত্রদের শিক্ষা, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বৃত্তি লাভও করত।...সম্পদশালী মুসলমানগণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাদের গৃহে শিক্ষক রাখতেন। বিনা খরচে স্থানীয় গরিব ছেলেমেয়েরা তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করত। একজন ধনী গৃহস্থ বা গ্রাম্য প্রধান শিক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহে শিক্ষকের ব্যবস্থা করেননি, এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল।

বাংলার নবাব ও সুবেদারগণ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন। কুরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস এবং অন্যান্য ইসলামি বিষয়গুলো মাধ্যমিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও অন্য বিষয়গুলোও মাদরাসাগুলোতে শিক্ষা দেওয়া হতো। সম্রাট আকবরের আমলের শিক্ষাসংক্রান্ত রেগুলেশনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল ফজল লেখেন—

> প্রত্যেকটি বালকের পক্ষে নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্রের জন্য নতুন পদ্ধতি বা চিহ্ন, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, ক্ষেত্রবিদ্যা, শরীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রশাসনবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, কারিগরি বিদ্যা, সংগীত, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস শেখা আবশ্যক। এর সবগুলো বিষয়ই পর্যায়ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে। সংস্কৃত শিখতে গিয়ে ছাত্রদের বৈয়াকরণ (ব্যাকরণ), নৈরাই (ন্যায়শাস্ত্র), বেদান্ত পতঞ্জলি ইত্যাদি অধ্যয়ন

https://nagorikpathagar.org

> আবশ্যক। বর্তমানকালের প্রয়োজন এরূপ কোনো বিষয়ই কাউকে অবহেলা করতে দেওয়া উচিত হবে না। এ সমস্ত বিধি বিদ্যালয়সমূহে নতুন আলোকের সঞ্চার করে এবং মাদরাসাগুলোর দীপ্তি বৃদ্ধি করে।[২০১]

অ্যাডাম বলেন, আরবি বিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত ব্যাপক ধরনের পাঠ্য তালিকা রয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাকরণগ্রন্থ, ছন্দের পূর্ণ তালিকা, তর্কশাস্ত্র, আইন, বাহ্যিক পর্যবেক্ষণসমূহের অধ্যয়ন এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। জ্যামিতি শাস্ত্রের ওপর ইউক্লিডের এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর টলেমির গ্রন্থাবলি অনূদিত হয়ে প্রাকৃতিক দর্শন ও সাধারণ দর্শনশাস্ত্রের ওপর নিবন্ধসমূহের সঙ্গে একত্রে কোনো কোনো বিদ্যায়তনে ব্যবহৃত হতো।[২০২] জেনারেল স্লিমান বলেন—

> সম্ভবত পৃথিবীতে কম সম্প্রদায়ই রয়েছে, যাদের মধ্যে ভারতের মোহামেডানদের অপেক্ষা ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে। যিনি মাসিক বিশ টাকা বেতনে সরকারি দপ্তরে চাকরির করেন, তিনিও তার সন্তানসন্ততিদেরকে সাধারণত একজন প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য শিক্ষা প্রদান করেন। তারা আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেন, যা আমাদের কলেজে যুবকরা গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় ব্যাকরণ, ছন্দ ও তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষা পেয়ে থাকে। সাত বছরকাল অধ্যয়নের পর একজন মুসলমান যুবক মাথায় পাগড়ি পরিধান করে এবং অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা একজন নব্য যুবকের মতো জ্ঞানের এই সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সে অনর্গলভাবে সক্রেটিস ও এরিস্টটল, প্লেটো ও হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও আভিসিনা (ইবনে সীনা) সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে পারে।[২০৩]

মুসলিম আমলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইসলাম খানের চিকিৎসক হাকিম কুদসি ও মির আলাউল মুলক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ নবাবি আমলের বিখ্যাত চিকিৎসক হাকিম হাদি আলি খানকে প্লেটো ও গ্যালেনের সাথে তুলনা করেছেন। একজন দক্ষ চিকিৎসক ও পর্যটক বার্নিয়ার বলেন—'মুসলমান চিকিৎসকগণ আভিসিনা (ইবনে সিনা) ও আভারোজের (ইবনে রুশদ) নিয়মাবলি অনুসরণ করেন এবং গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের

---

[২০১] উদ্ধৃতি, ডক্টর এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৮

[২০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

[২০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

https://nagorikpathagar.org

করে দেন। এভাবে প্রায় সূচনাতেই তারা রোগ দমন করার জন্যে রক্তক্ষরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন।' তিনি আরও বলেন—'জারাহগণ (মুসলিম সার্জন) চমৎকার অস্ত্রোপচার করতেন এবং কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাগাতে পারতেন।'

তৎকালে বৈদিক চিকিৎসাও বেশ উন্নত ছিল। সুলতানি শাসনামলে বৈদ্যদের কেউ কেউ সুলতান বারবক শাহ ও সুলতান হোসেন শাহের রাজবৈদ্যের মর্যাদায় উন্নীত হন। মাদরাসাগুলোতে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এটা অঙ্কশাস্ত্র, কারিগরি শিক্ষা ও সংগীতবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই বিষয়গুলোকে একত্রে 'রিয়াজী' বিজ্ঞানরূপে চিহ্নিত করা হতো। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ নবাব আলিবর্দির দরবারের অন্যতম পণ্ডিত মুহাম্মাদ হাজিনকে সে যুগের একজন জ্যোতির্বিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র খুব প্রচলিত ছিল।

প্রাক-মুসলমান যুগে বাংলার শিক্ষাদীক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা জ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন শুরু করে। *মানিকচন্দ্র রাজার গান* নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মুসলমান শাসনামলে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণির 'হরি' ও 'সাউদ'-গণ দলিলপত্র পড়া ও লেখার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। এমনকি নাপিত ও ঝাড়ুদাররাও বিদ্যা ও সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল। হিন্দু বালক-বালিকাদেরকে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। এসব পাঠশালা সাধারণত ধনী লোকদের গৃহ-সংলগ্ন থাকত; গুরুর বাসস্থানের কোনো বৃক্ষের নিচেও পাঠশালা বসত। মুসলমানদের মতো হিন্দুদেরও প্রাথমিক পর্যায়ে সহশিক্ষা চালু ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর হিন্দু বালকগণ, যারা উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা করত, তারা সাধারণত টোলে প্রবেশ করত। এই সমস্ত টোল ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্রদের টোলে শিক্ষা দেওয়া হতো। এ পর্যায়ে ছয়শাস্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ছন্দ নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ), দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভকারীরা বালি ও ধুলোর ওপর লেখার অভ্যাস করত। এরপর তারা মেঝেতে খড়িকাঠি দিয়ে লেখার চেষ্টা করত। পরবর্তী সময়ে তারা তালপাতা, কলাপাতা ও ভোজপাতায় লিখত। খড় বা নলখাগড়ার টুকরো, বাঁশের কঞ্চি, পাখি, ময়ূর ও হাঁসের পালক কলমরূপে ব্যবহৃত হতো। তা ছাড়া তুলোট ও গন্ধকচূর্ণ রঙিন কাগজও লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। ছাত্ররা নিজেদের কালি নিজেরাই তৈরি করত। এই দেশীয় কালি ছিল অবিশ্বাস্য রকম দীর্ঘস্থায়ী। সর্বোপরি মুসলিম শাসনামলে বাংলার সর্বত্র অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ দেখা দেয় এবং বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে।

https://nagorikpathagar.org

মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। তারা যাতে ধর্মের মূলনীতি, কুরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেজন্যে পিতাগণ কন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বালিকাদেরও 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাতেখড়ি হতো এবং প্রাথমিক পর্যন্ত তারা বালকদের সাথেই শিক্ষা অর্জন করত। সমাজের পর্দাপ্রথার কারণে মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ; এক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো নিয়মিত পদ্ধতি ছিল না। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মূলত উচ্চশ্রেণি ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এমনটা দেখা গেছে যে, মুসলমান শাসনামলে উচ্চ পরিবারের মেয়েরা ছিলেন সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী সুলতানগণ, অভিজাত সম্প্রদায় ও অবস্থাপন্ন লোকেরাও তাদের কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহে শিক্ষয়িত্রী রাখতেন। মি. অ্যাডাম পাণ্ডুয়ায় ধনী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক রাখার রীতি লক্ষ করেন। কার্যত এই রীতি বাংলায় মুসলিম শাসনামলে ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। বাংলার উচ্চশ্রেণির মহিলারা উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন।

বাংলার সুবেদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গের স্ত্রী রোকেয়া বেগম তার বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণরাজির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলি খানের কন্যা ও নবাব সুজা উদ্দিনের স্ত্রী জিন্নাতুন নেসা বেগম ছিলেন একজন প্রতিভাময়ী ও সংস্কৃতিমনা মহিলা। সে যুগের অন্যতম উচ্চশিক্ষিত ছিলেন আলিবর্দি খানের স্ত্রী বেগম শরফুননিসা। আলিবর্দি কন্যা বেগম মেহেরুননিসা (ঘসেটি বেগম), মায়মুনা বেগম ও আমেনা বেগম—এরা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত ছিলেন। স্বামী শাহজাদ জঙ্গের মৃত্যুর পর ঘষেটি বেগম নবাব কর্তৃক বাংলার দিওয়ানও নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২০৪] আলিবর্দি খানের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং আতাউল্লাহ খানের স্ত্রী রাবেয়া বেগম, সিরাজউদ্দৌলার পত্নী লুৎফুন্নেসা প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত।

---

[২০৪] ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

https://nagorikpathagar.org

কবি বিজয়গুপ্তের মতে, হাসানকাটির কাজির স্ত্রী হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। *মল্লিকার হাজার সওয়াল* (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামক বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নামের জনৈক মুসলমান বালিকা জ্ঞানের নানা শাখায় গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন—যে তাকে সাহিত্যসংক্রান্ত বিতর্কে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই তিনি বিবাহ করবেন। বহু যুবরাজ ও বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু তাদের সকলেই পরাজয় বরণ করে। এটা গল্প হলেও এতে সমাজ বাস্তবতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সায়ফুল মূলক পুথির নায়িকা লালমতি (লালবানু) সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। হিন্দু সমাজেও উচ্চশিক্ষিত রমণীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি চণ্ডিদাসের প্রেয়সী ধোপা রমণী বাংলায় পদাবলি রচনা করেন। চৈতন্যের শিষ্যা মাধবী ছিলেন সুশিক্ষিত। কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীও ছিলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি। খনা ছিলেন একজন গুণবতী রমণী।

সম্পত্তিতে হিন্দু রমণীর কোনো অধিকার ছিল না; সে ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন—'একটা মেয়ের জীবন খুব সুখের নয়; সে সর্বদা পরনির্ভরশীল এবং তাকে অন্যদের বোঝা বহন করতে হয়। স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হলে একজন হিন্দু রমণীর পক্ষে দাঁড়ানোর আর কোনো জায়গা থাকত না; এমনকি তার বাড়িতেও না।' বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও সতীদাহ প্রথা সমাজে মেয়েদের অবস্থা দুর্বিষহ করে তুলেছিল। মুসলমান সমাজে নারীদের অবস্থা এতটা অসহনীয় ছিল না। সম্পত্তিতে তার অধিকার ছিল এবং এই আর্থিক সংগতি তাকে পরাধীনতা থেকে রক্ষা করেছিল। আর্থিক সংগতি ও উচ্চশ্রেণির লোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের ফলে নারীরা অনেকটাই পরাধীনতা থেকে মুক্ত ছিল। আফগানদের বিপর্যয়ের সময় মুহাম্মাদ আমিনের স্ত্রী তার সাথে থাকতে অস্বীকার করে। উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা সুজা উদ্দিনের অত্যধিক রমণী আসক্তির কারণে স্ত্রী জিন্নাতুন নেসা তার সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তী সময়ে তিনি পৃথকভাবে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন। তেজস্বিনী মহিলা দারদানা বেগম ভ্রাতা সরফরাজ খানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে স্বামী দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে নবাব আলিবর্দি খানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

উচ্চ বংশে স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারেও মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। সমাজে নারীদের পর্দা আভিজাত্য ও শালীনতা বলে গণ্য করা হতো। সে যুগে মুসলমান-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের মুখ-মাথা আবরণহীন অবস্থায় বের হওয়া অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হতো। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ লেখক ভেরেলস্ট লিখেছেন—

https://nagorikpathagar.org

'নারীদেরকে অবরোধ অবস্থায় রাখা একটি আইন, যা অপরিবর্তনীয়।' সমগ্র ভারতে এই রীতি প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর বে-আবরু হওয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়ের চোখেই অমর্যাদাজনক ছিল। উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে পর্দাপ্রথা ও অবগুণ্ঠন প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজে নারীদের অবগুণ্ঠনহীনতা চরম অপমানজনক ব্যাপার ছিল। গোলাম হোসেনের মতে, নবাব আলিবর্দি তার বেগমের নিকট পূর্বে খবর না দিয়ে কখনো জেনানামহলে প্রবেশ করেননি। তিনি তার প্রাসাদে আশ্রিত আফসান মহিলাদের সম্মানার্থে অন্দরমহলে প্রবেশের পূর্বে সব সময় সম্মান পাঠাতেন।

পর্দার অন্তরালে বাস করলেও মুসলমান রমণীরা যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন। দারাশিকোর কন্যা ও যুবরাজ মুহাম্মাদ আজমের স্ত্রী জাহানজেব বানু মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। শরফুন নেসা বানু মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাব আলিবর্দির সাথে গমন করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খানের কন্যা জিন্নাতুন নেসা স্বামী সুজা উদ্দিনের প্রশাসনব্যবস্থায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দারদানা বেগম ও তার স্বামী ও উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের ওপর নানা বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নবাব সুজা উদ্দিনের কন্যা ও সরফরাজ খানের ভগ্নী নাফিসা বেগমও একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নবাব আলিবর্দি খানের কনিষ্ঠ কন্যা ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার মা আমিনা বেগম তার সুরুচি ও মিষ্টি স্বরের গুণে সে যুগের সমাজজীবনের ওপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। কোমল বেগমও রাজকার্যের অনেক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। নবাবপত্নী লুৎফুন নেসাও ছিলেন একজন আদর্শ রমণী।

এমন বহু রমণী বাংলার মুসলমান শাসনামলে তাদের সাহস, শক্তি ও বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মুসলমান আমলে হিন্দু সমাজেও বেশ কিছু প্রতিভাময়ী রমণীর জন্ম হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের নায়িকা বিদ্যা উচ্চশিক্ষিত রমণী ছিলেন। নাটোরের জমিদার পরিবারের বাণী ভবানী একজন খ্যাতনামা মহিলা ছিলেন। জমিদার জয় দুর্গা চৌধুরানি রংপুরের একজন অত্যাচারী জমিদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে, এ যুগের অনেক রমণী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

মুসলিম বাংলায় শিল্পের বিকাশ

কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের প্রাচুর্য, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সহজলভ্যতা ও অফুরন্ত ধনসম্পদের জন্য মুসলিম শাসনামলে বাংলা ছিল পর্তুগিজ, ডাচ ও অন্য ইউরোপীয়দের চোখে দুনিয়ার মধ্যে বসবাস করার উত্তম স্থান।[২০৫] মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই বাংলা শিল্পকারখানা, বিশেষ করে পশমি ও রেশমি বস্ত্র উৎপাদনে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এ দেশের অধিবাসীদের শিল্প প্রতিভা উৎকৃষ্ট পশমি ও রেশমি কাপড় তৈরি, নানাবিধ অলংকার ও সূক্ষ্ম সূচিকর্মে প্রকাশ পেয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতার ফলে তাদের পক্ষে নানা ধরনের পোশাক-আশাক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এ সময়ের মসলিন পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল। মোগলদের বাংলা বিজয়ের ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে বাংলায় উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তৃত বাজার উন্মুক্ত হয়। বাজার সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলার মানুষ ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিল।[২০৬] বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম মসলিন উৎপাদনে ঢাকা শীর্ষস্থান দখল করে। মোগল সম্রাট, অভিজাত বর্গ, সুবেদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিন বয়নশিল্পে উন্নতি সাধিত হয় এবং সুতি বস্ত্র কারখানাসমূহ সমৃদ্ধি লাভ করে। মূলত সমগ্র মুসলিম শাসনামলে সুতি বস্ত্র শিল্প ও বয়নকারীগণ বাংলার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। তা ছাড়া এ সময় বাংলায় জাহাজ নির্মাণ, কার্পেট, কাগজ, ইস্পাতদ্রব্য, কামান, বন্দুক ইত্যাদি শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, লোহার জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে বাংলার সুখ্যাতি ছিল। বাঙালি কারিগররা তামা, কাঁসা, কাঠ, পাথর, হস্তীদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালার কারুকাজ করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শঙ্খ তৈরিও এখানকার

---

[২০৫] ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩৬৮

[২০৬] আব্দুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম, *মানুষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ২৪৫

https://nagorikpathagar.org

একটি সমৃদ্ধ শিল্প ছিল। মুসলিম শাসনামলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়েছিল। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদন ছিল মুসলিম বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর অন্যতম। বাংলা ছিল নদীনালা, খালবিলের দেশ। এখানকার নদীগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। ফলে এখানে তাজা ও শুকনো উভয় প্রকারের 'মৎস শিল্প' সমৃদ্ধশালী ছিল। লবণ ও শুকনো মাছ প্রতিবেশী দেশগুলোতে রফতানি করা হতো।[২০৭]

আঠারো শতকের প্রথম পর্বে বাংলা একটি সমৃদ্ধশালী ও বর্ধিষ্ণু প্রদেশরূপে সুপরিচিত ছিল। এর বিপুল প্রাচুর্যের জন্যই সামসময়িক সুধীজনেরা এ দেশটিকে 'রাজসমূহের মধ্যে স্বর্গ', 'ভারতের স্বর্গ', 'স্বর্গরাজ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। মূল্যবান সম্পদের আকর্ষণেই দূরদূরান্ত থেকে বিদেশি বণিকেরা বাংলার উপকূলে এসে ভিড় জমাত। বার্নিয়ারের ভাষায়—'সেখানে প্রবেশের জন্য রয়েছে হাজারো উন্মুক্ত দরজা, কিন্তু ফিরে যাওয়ার জন্য একটিও নয়।'[২০৮] প্রাক-উপনিবেশিক বাংলা হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতের তুলা এবং সিল্কের তৈরি পণ্যের এক অসাধারণ ভান্ডার। তুলা ও সিল্কের তৈরি পণ্যসামগ্রী শুধু চমৎকার মসৃণতা এবং মিহি কারুকাজের জন্যই খ্যাত ছিল তা নয়; তুলনামূলকভাবে দামেও ছিল সস্তা। এভাবে প্রাক-উপনিবেশিক আমলের বাংলার শিল্প-অর্থনীতিকে পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশের অর্থনীতির সাথে তুলনা করা যায়।

বস্ত্রশিল্প

অতি প্রাচীনকালে বাংলাদেশে যে কয়টি শিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার মধ্যে বস্ত্রশিল্প অন্যতম। পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলা অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট প্রভাব অর্জন করেছিল। কৌটিল্য বাংলায় প্রস্তুতকৃত চার শ্রেণির বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন যথা—ক্ষৌমা, ধুকুলা, পত্রোর্যা ও কাপাসিয়া। ক্ষৌমা ছিল একটু মোটা শন বা রেশমের তৈরি বস্ত্র, যাতে তুলার মিশ্রণ থাকত। এ শ্রেণির বস্ত্রের আরও মিহি শ্রেণির নাম ধুকুলা। পত্রোর্যা ছিল সম্পূর্ণ রেশমের বস্ত্র। কার্পাসিকা ছিল সম্পূর্ণ তুলা থেকে প্রস্তুতকৃত কাপড়। বস্ত্র বয়নে বাংলা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে, বাংলা বস্ত্র বয়নশিল্পের জন্মভূমি।[২০৯] তবে সবকিছু ছাপিয়ে বাংলার 'মসলিন' বিশ্বের দরবারে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

---

[২০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

[২০৮] Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire* (London : Oxford University Press, 1914), Vol. 1, p. 190.

[২০৯] ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫), পুনর্মুদ্রণ মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ৯৩১

https://nagorikpathagar.org

মসলিন : মসলিন নামের উৎপত্তি নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। কারও কারও মতে, 'মসলি পত্তন' থেকে বিদেশি বণিকগণ ইউরোপে এ বস্ত্র চালান দিত বলে এর নাম করা হয় মসলিন।[২১০] হেনরি ইউল ও এ. সি. বার্নেল মনে করেন, মসিলন শব্দ মসুল নাম থেকে উদ্ভূত। মসুল বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যাবসা কেন্দ্র। একসময় পুরাকালে মসুলে উৎকৃষ্ট ধরনের বস্ত্র তৈরি হতো, তাই হয়তো ইউরোপীয়রা সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রকে সাধারণভাবে মসুলি, মসুলিন বা মসলিন নামে অভিহিত করত।[২১১] আবার কেউ কেউ মনে করেন, এককালের দক্ষিণ ভারতে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির সদর দপ্তর মসলিপট্টমের সঙ্গে মসলিন শব্দটি সম্পৃক্ত।[২১২] মসলিনের ইতিহাস বেশ পুরোনো। তবে মুসলিম আমল ছিল মসিলনের স্বর্ণযুগ। প্রাচীন সিরীয় ও ব্যাবিলনে ঢাকাই মসলিন খ্যাতি লাভ করেছিল বলে বার্ড উড প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। মসলিন জড়ানো মমির সন্ধানও মিশরে পাওয়া গেছে। জে. এফ. রয়েল তাঁর *History of Cotton* গ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রাচীন গ্রিকদের নিকট মসলিন পরিচিত ছিল।[২১৩]

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী কোনো কোনো এলাকায় ফুটি নামে একপ্রকার তুলা জন্মাত। এর সুতা থেকে তৈরি হতো সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র।[২১৪] রয়রাতি ও দেশি তুলা দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম ও মোটা মসলিন তৈরি হতো। সম্রাট, উজির, নওয়াব প্রমুখ অভিজাত শ্রেণির জন্য বোনা হতো সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্র। কাপড়ের সূক্ষ্মতা, স্বচ্ছতা, উৎপাদনের উৎস ও ব্যবহারভেদে মসলিনের বিভিন্ন নাম দেওয়া হতো। নামগুলো ছিল মলমল (সূক্ষ্মতম বস্ত্র), ঝুনা (স্থানীয় নর্তকীদের ব্যবহৃত বস্ত্র), রঙ্গ (স্বচ্ছ ও জালিজাতীয় বস্ত্র), আবি-রাওয়ান (প্রবহমান পানির তুল্য বস্ত্র), খাস (বিশেষ ধরনের মিহি বা জমকালো), শবনম (ভোরের শিশির), আলাবালি (অতি মিহি), তনজিব (দেহের অলংকারসদৃশ), নয়নসুক (দর্শন প্রীতিকর), বদনখাস (বিশেষ ধরনের বস্ত্র), শিরবন্দ (পাগড়ির উপযোগী), কামিজ (জামার কাপড়), ডোরিয়া (ডোরাকাটা), চার কোনা (ছক কাটা বস্ত্র) ইত্যাদি।[২১৫]

সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিনের নাম ছিল মলমল। বিদেশি পর্যটকরা এ মসলিনকে কখনো কখনো 'মলমল শাহি' বা 'মলমল খাস' নামে উল্লেখ করেছেন। এগুলো

---

২১০ তোফায়েল আহ্‌মদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৪), পৃ. ২৫

২১১ আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন* (ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০), পৃ. ১০

২১২ *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২১৩ তোফায়েল আহ্‌মেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২১৪ *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

https://nagorikpathagar.org

ছিল বেশ দামি। এ রকম এক প্রস্থ বস্ত্র তৈরি করতে তাঁতিদের ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত। এ বস্ত্র সম্রাট ও নওয়াবগণই ব্যবহার করতেন। সম্রাটদের জন্য সংগৃহীত বস্ত্রের নাম ছিল মলবুস খাস এবং নওয়াবদের জন্য সংগৃহীত বস্ত্রের নাম ছিল সরকার-ই-আনা।[২১৬] মলমল ব্যতীত অন্যান্য মসলিন বস্ত্র ব্যবসায়ীরা রফতানি করত। স্থানীয় লোকেরাও কিছু কিছু মসলিন ব্যবহার করত।[২১৭] বাংলার মসলিন সুতি বস্ত্র শিল্পকারখানা ছিল পৃথিবী বিখ্যাত।

জামদানি : যে মসলিন সমগ্র বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, সেই মসলিনেরই একটি অঙ্গশিল্প হলো জামদানি। প্রাচীনকালে তাঁতশিল্পের মাধ্যমে মসলিনের ওপর যে জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো, তারই নাম জামদানি। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়ি বোঝালেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যবাহী নকশায় সমৃদ্ধ ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, ঘাগড়া, রুমাল, পর্দা, টেবিল ক্লথ সবই জামদানির আওতায় পড়ে।[২১৮] জামদানি নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। ফারসি শব্দ জামা মানে কাপড় আর দানা অর্থ বুটি; সুতরাং জামদানি মানে বুটিদার কাপড়।[২১৯] সম্ভবত মুসলমানরাই জামদানির প্রচলন করেন এবং দীর্ঘদিন তাদের হাতেই এ শিল্পের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। মুসলিম সমাজের অন্যতম অভিজাত ভাষা ফারসি থেকেই জামদানি নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়।[২২০] অবশ্য যতীন্দ্রমোহন রায়ের মতে, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত *Periplus of the Enythrean Sea* গ্রন্থে উল্লিখিত Skotulas বস্ত্র এবং জামদানি অভিন্ন।[২২১] মূলত মোগল যুগের সুবেদারি ও নবাবি শাসনামলই ছিল এ শিল্পের উৎকর্ষের সর্বোত্তম যুগ। জামদানি নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জ্যামিতিক অলংকরণ। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন জামদানি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন : পান্না হাজার, দুবলি জাল, বুটিদার, তেরচা, জালার, ডুরিয়া, চারকোনা, ময়ূর প্যাঁচ, বালমিলতা, পুঁইলতা, কচুপাতা, কাটিহার, কলকা পাড়, আঙুরলতা, সন্দেশ পাড়, প্রজাপতি পাড়, জবাফুল, বাদুড় পাখি পাড় ইত্যাদি। ব্যয়বহুল জামদানির উৎপাদন একচেটিয়াভাবে বহুকাল মোগলদের হাতেই ছিল।

---

২১৬ *ঢাকাই মসলিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২১৭ *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২১৮ *বাংলাপিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২১৯ তোফায়েল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২২০ *বাংলাপিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২২১ যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ মজুমদার, *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ ঢাকার ইতিহাস* (দু'খণ্ড একত্রে) (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩),
পৃ. ১১৭; শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬৫

https://nagorikpathagar.org

রেশমশিল্প

রেশমের আদি আবিষ্কার এবং রেশম উৎপাদন প্রথার উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন চীনে। বাংলায় শেষ হিন্দু রাজত্বকালে রেশমের উৎপাদন শুরু হয়। রেশমের তৈরি কাপড় তখন ঢাকা, সোনারগাঁও ও সপ্তগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে রফতানি করা হতো। আবুল ফজলের মতে, আকবরের রাজত্বকালে সরকার ঘোড়াঘাটে (রাজশাহী) বিপুল পরিমাণ রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হতো। সুবেদার, নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। মসলিনের ন্যায় রেশম বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল।

১৬৬৬ সালে টেভর্নিয়ার কাসিম বাজার পরিদর্শন করেন। তিনি লিখেছেন যে, সে সময় কাসিম বাজারে কাঁচা রেশমের বার্ষিক উৎপাদন ছিল প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড। মসলিন, জামদানি ও রেশম বস্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদি বাংলায় প্রস্তুত করা হতো। বাফতা নামক একপ্রকার খুব মোটা কাপড় চাদর হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যা বাংলাতেই উৎপন্ন হতো। হাম্মাম, ডিমটি, সাল, জঙ্গল খাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি নামের বাফতা এখানে তৈরি করা হতো। মুসলমানদের জন্য লুঙ্গি, হিন্দুদের জন্য একপাট্টা ও জোর, হিন্দু-মুসলমান সমাজের জন্য বুন্নি, গামছার ন্যায় বুন্নি এবং কার্পাস সুতা ও রেশমের সংমিশ্রণে কাসিদা বস্ত্র এখানে উৎপাদিত হতো। আরব দেশে কাসিদার ব্যাপক চাহিদা ছিল। রেঙ্গুন, পিনাং প্রভৃতি দেশে এটা বিক্রি হলেও জেদ্দা নগরে এটা অধিক পরিমাণে রফতানি করা হতো। আরব, পারস্য ও তুরস্কের সৈনিকদের শিরস্ত্রাণ ও ফতুয়া এ কাসিদা দ্বারা প্রস্তুত করা হতো।

পাটশিল্প

সম্ভবত উড়িয়া শব্দ Jhuta ev Jota থেকে Jute শব্দটির উৎপত্তি। 'জুটা' ও 'পট্ট' বস্ত্র ব্যবহারের উল্লেখ যথাক্রমে বাইবেল, মনুসংহিত ও মহাভারতে আছে; যা এতদঅঞ্চলে পাটদ্রব্যের সুপ্রাচীন ব্যবহারের সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীনকাল থেকে প্যাকেজিংয়ের কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবহৃত হতো। মুসলিম আমলের বাংলা সাহিত্যে পাট ও পাটজাত বস্ত্রের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের পণ্ডিত জ্যোতিরিশ্বরের লিখিত *বর্ণ রত্নাকর* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মেয়েরা নানা রকম পাটের শাড়ি (পট্টবস্ত্র) পরিধান করত।[২২২] কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*-এ, মানিক চন্দ্রের গানে, জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গলে*, বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলে*, মুহাম্মাদ কবীরের *মনোহর মধুমালতী*-তে এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের

[২২২] নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)* (কলিকাতা : বুক এমপোরিয়াম, ১৩৫৬ বাং), পৃ. ৫৩৭

https://nagorikpathagar.org

অনেক বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায়—সমাজের সাধারণ স্ত্রীলোকেরা পাটের শাড়ি ব্যবহার করত। বাঙালি কবিদের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় আবুল ফজলের লেখা থেকে। তিনি বলেন, বাংলার ঘোড়াঘাট সরকারে রেশম ও একপ্রকার চটের কাপড় তৈরি হয়।[২২৩] তবে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রফতানিযোগ্য পণ্য হয়ে ওঠেনি। সপ্তদশ শতকে বাংলার পাট ইউরোপীয় বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিনিশিল্প

স্মরণাতীত কাল থেকেই বাংলাদেশে আখের চাষ করা হতো। আখ ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। এটা ব্যাপক হারে উৎপাদিত হতো। আখ মূলত গুড়, সুক্কার (Sukkar) বা খণ্ডেশ্বরী (Khandeswari) তৈরির জন্য ব্যবহৃত হতো। ষোড়শ শতকে পর্যটক বারবোসা বাংলার চিনিশিল্পের প্রশংসা করেন এবং বলেন—'এ অঞ্চলের মানুষ চিনি দিয়ে প্রচুর জাহাজ বোঝাই করে এবং অন্যান্য অঞ্চলে রফতানি করে।'[২২৪] তিনি 'বেঙ্গল' শহরে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুতের কথাও উল্লেখ করেন। এ চিনি বিদেশেও রফতানি করা হতো। ঢাকার বন্দর থেকে চিনি বিদেশে রফতানি হওয়ার কথা সেবাস্টিন ম্যানরিকও বলেছেন।[২২৫] ইতালীয় বণিক লিউইচ বার্থেমাও ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভ্রমণের সময় এখানকার চিনি উৎপাদন লক্ষ করেন। সপ্তদশ শতকে বার্নিয়ার লেখেন, বাংলা প্রচুর চিনি উৎপাদন করে এবং তা গোলকুন্ডা ও কর্ণাটকে রফতানি করে। এ ছাড়া মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি রাজ্যে, এমনকি বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে চিনি রফতানি হয়ে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ডাচ বণিকদের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চিনির বার্ষিক রফতানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০,০০০ মণ।[২২৬] পরবর্তীকালে উপমহাদেশের পশ্চিমাংশের বাজারে ডাচ ব্যবসায়ীদের আমদানিকৃত জাভা চিনির প্রতিযোগিতার ফলে বাংলার চিনি রফতানি বাণিজ্য হ্রাস পায়। বাংলায় একধরনের লাল চিনিও উৎপাদিত হতো। ফিটকিরি, পুকুরের শ্যাওলা ও মাটি জাতীয় সোডার পুট দ্বারা গুড় প্রস্তুতের পর হামানদিস্তা দিয়ে পিষে পরপর কয়েকবার ছেঁকে এ চিনি প্রস্তুত করা হতো।[২২৭]

---

[২২৩] Abul Fadl, Allami, *Ain-i-Akbari*, Vol. II, Trans, H.S. Jarret (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1891), p. 136.

[২২৪] ড. এম. এ রহিম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

[২২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[২২৬] ড. এম. এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৪৪

[২২৭] কাজী মোহাম্মদ মিছের, *বগুড়ার ইতিকাহিনী* (বগুড়া : কাজী প্রকাশনী, ১৯৫৭), পৃ. ৫৭-৭৬

https://nagorikpathagar.org

নীলশিল্প

প্রাচীনকালে মিশর, গ্রিস ও রোমের নৌপেয়া লোকেরা নীলের কথা জানত। অতি প্রাচীনকাল থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে নীল চাষ হতো। এটি জনপ্রিয় রঞ্জকদ্রব্য ও বাণিজ্যসম্ভার হিসেবে ইউরোপে প্রচলিত হয়। উপমহাদেশের নামানুসারে সেখানকার প্রাচীন লোকজন এটাকে Indicum বলে অভিহিত করত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহিরের *ভারত-সংহিত* থেকে নীলরঞ্জকের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তে নীলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে উৎপন্ন ফসলের মূল্য সম্পর্কে আবুল ফজল যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে নীল চাষ সবচাইতে অর্থকরী ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলেও বাংলা নীল চাষের জন্য খ্যাত ছিল। স্যার টমাস রো'র মতে, তখন নীল ছিল রফতানির জন্য Prime Commodity। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এটা ইউরোপীয় বণিকদের নজরে আসে।

লবণ শিল্প

সমুদ্রের পানি ও লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদন ছিল মুসলিম বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর অন্যতম। বাংলার মানুষ একাদশ শতাব্দী থেকে লবণ তৈরির প্রক্রিয়া জানত বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। সূর্যালোকে সমুদ্রের পানি বাষ্পীকরণ বা কুরকুচ পদ্ধতি ও সমুদ্রের ঘন লবণাক্ত পানি সিদ্ধ করে লবণ উৎপাদন করা হতো। মুসলিম শাসনামলে লবণের লাভজনক ব্যাবসা ছিল এবং বিদেশেও তা রফতানি করা হতো।[২২৮] এটি ছিল মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি দেশীয় শিল্প উদ্যোগ। এটি সম্প্রসারিত ছিল কটক থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। সমুদ্র উপকূলবর্তী মালঙ্গী নামক একশ্রেণির চাষি প্রথমে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদন করত। মোগল আমল পর্যন্ত লবণ শিল্পে সরকারের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। এর ব্যবস্থাপনা ছিল জমিদার শ্রেণির হাতে; তারা লবণ চাষিদের দিয়ে লবণ উৎপাদন করার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাদন প্রদান করত।[২২৯] সিজার ফ্রেডারিক নামক একজন ভেনেসীয় পর্যটক ১৫৬৩-৮১ খ্রিষ্টাব্দে সন্দ্বীপ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, বছরে লবণভর্তি ২০০ জাহাজ এখান থেকে বাইরে পাড়ি দিত।[২৩০]

কাগজ শিল্প

মানবসভ্যতা ও জ্ঞানের প্রসারে কাগজের অবদান অপরিসীম। সর্বপ্রথম চীনে কাগজ আবিষ্কৃত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে কাগজ প্রচলনের দাবিদার

---

[২২৮]ওয়াকিল আহমেদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮), পৃ. ৬৬

[২২৯]*বাংলাপিডিয়া*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[২৩০]তোফায়েল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

https://nagorikpathagar.org

একমাত্র মুসলমানেরাই।[২৩১] প্রায় ছয় হাজার বছর আগে কাগজ তৈরিতে বাঁশ, মালবেরি ও প্যাপিরাস নামক গাছ ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন সত্যতার উৎসভূমি চীন, মিশর প্রভৃতি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দেশজ পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি হতো। তবে আবহাওয়াগত কারণে ও সংরক্ষণের অভাবে দূরাতীত কালের কাগজের কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইলে দেশীয় পদ্ধতিতে কাগজ প্রস্তুতে মেস্তা ব্যবহৃত হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ শিল্পটি সিরাজগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে চালু ছিল। কুটিরশিল্পীগণ এ শিল্পে কাজ করে বেশ উপার্জন করত। প্রথমে তারা সাদা কাগজই তৈরি করত, তবে ব্রিটিশ কাগজের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে পরে তারা শুধু মোটা কাগজ প্রস্তুত করত, যার উপাদান ছিল সেই পুরোনো মেস্তা। এক মণ মেস্তা থেকে ২০/২৫ দিস্তা কাগজ হতো। তা ছাড়া চীনা ভাষায় রক্ষিত দলিলে বাংলার তুঁত গাছের ছালে তৈরি কাগজেরও উল্লেখ আছে। মাহুয়ানের মতে, বারনায় গাছের বাকল থেকে কাগজ প্রস্তুত হতো। তার মতে এ বাকল ছিল অত্যন্ত মসৃণ ও তৈলাক্ত। মাহুয়ান লিখেছেন যে, বাঙালি অধিবাসীগণ গাছের বাকল থেকে সাদা কাগজ তৈরি করত এবং এসব কাগজ হরিণের চামড়ার মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল ছিল।

জাহাজ নির্মাণশিল্প

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা সমুদ্রগামী জাতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। অস্টিক জাতি সর্বপ্রথম এ জনপদে জলযান ব্যবহার করে।[২৩২] এ দেশের নাবিকদের নৈপুণ্য ও সাহস, উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উদ্দাম-মনোবল এবং অভিবাসীদের উৎসাহ যুগ যুগ ধরে বাংলাকে সমুদ্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছে। অতীত কাল থেকেই সমুদ্রপথে বাঙালিরা ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছে। বাংলার নাবিকেরা চীন, জাপান, সুমাত্রা ও জাভায় গমন করত। তারা করোমণ্ডল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, বার্মা ও সিংহলের উপকূলেও অভিযান চালিয়েছিল। পশ্চিমে তাদের যোগাযোগ ছিল আফ্রিকার সাথে এবং পূর্বে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সাথে। *চর্যাপদ*, *চন্ডীমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*-এর মতো প্রথম দিকের উপাখ্যানগুলোতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিশাল বিশাল নৌকা নির্মাণের উল্লেখ আছে।[২৩৩]

---

[২৩১] তোফায়েল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[২৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[২৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

https://nagorikpathagar.org

প্রাচীনকালে জাহাজ নির্মাণশিল্পে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বিশেষ করে এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশ চট্টগ্রাম বন্দরে নির্মিত জাহাজ নিয়মিত ক্রয় করত। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আরবীয়, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য এ দেশে আসত। তখন বাহন ছিল পালের জাহাজ। বাংলার প্রধান সমুদ্রবন্দর ছিল চট্টগ্রাম। প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রাম পালের জাহাজ নির্মাণশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জাহাজ নির্মাণের প্রধান উপকরণ লোহা, কাঠ, সেগুন ও জারুল চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ছিল বলেই প্রাচীনকাল থেকে এখানে জাহাজ নির্মাণশিল্প গড়ে উঠেছিল। এ দেশে যে সকল পর্যটক পরিভ্রমণ করেছেন, তাদের বর্ণনায় জানা যায়—শুধু চট্টগ্রামেই নয়, বাংলার বিভিন্ন নদীবন্দরেও জাহাজ নির্মাণশিল্প গড়ে উঠেছিল।[২৩৪]

সিজার ফ্রেডারিক ১৫৬৭ সালে লিখেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর রণপোত নির্মাণের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।[২৩৫] ১৬০০-১৭০০ শতাব্দীতে তুরস্কের সুলতানের জাহাজের বহর চট্টগ্রামে তৈরি হতো।[২৩৬] মোগল সাম্রাজ্যে জাহাজ ও নৌকা নির্মাণে বাংলাদেশের স্থান ছিল শীর্ষে। চট্টগ্রামে নির্মিত জাহাজ যুদ্ধেও ব্যবহৃত হতো। মোগল নৌবাহিনীতে এ দেশীয় প্রচুর জাহাজ সংযোজিত হয়েছিল।[২৩৭] সিজার ফ্রেডারিকের বর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, আলেকজান্দ্রিয়াসহ অন্যান্য দেশে প্রতি বছর এখান থেকে তৈরিকৃত ২৫ থেকে ৩০টি জাহাজ রফতানি করা হতো। ফ্রান্সের পর্যটক টেভার্নিয়ার ঢাকা সম্পর্কে উল্লেখ করেন, শহরটি নদীর উত্তর তীরঘেঁষে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দারা ছুতার। তারা রণপোত এবং ছোটো নৌকা তৈরি করে। তার বর্ণনামতে, ওলন্দাজরা এ দেশের মিস্ত্রির তৈরি রণপোত ক্রয় করত এবং তা দিয়ে বাণিজ্য চালাত। চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে সে সময় শক্তিশালী নৌকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায়, ঢাকা ছিল নৌবহরের সদর ঘাঁটি। সম্রাট আকবর বাংলায় একটি রাজকীয় নৌঘাঁটি স্থাপন করে তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। রাজ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সময় শায়েস্তা খান জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ঢাকায় একটি বিরাট শিপইয়ার্ড তৈরি করেন। তিনি হুগলি, বালাসোর, সুরাট, চিলমারী, যশোর ও কড়িবাড়ি প্রভৃতি বন্দরসমূহে যত বেশি সম্ভব জাহাজ নির্মাণের হুকুম জারি করেন।[২৩৮] জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে সিলেটের

---

[২৩৪] *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[২৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[২৩৬] মিসবাহ্ উদ্দিন খান, *চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস (১৮৮৮-১৯০০)* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫), পৃ. ৫৯

[২৩৭] *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[২৩৮] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

https://nagorikpathagar.org

নামও ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানকার বিরাট অরণ্য সম্পদ ছিল এ শিল্পের মূল উৎস। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট ছাড়াও শ্রীপুর, বরিশাল, সন্দ্বীপ, যশোর ও চিলমারীতে প্রাচীন জাহাজ নির্মাণশিল্পের কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।

মুসলিম আমলে নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণশিল্প খুব বেশি সম্প্রসারিত হয়েছিল। বাঙালি বণিকেরা এ সময় নানা ধরনের বৃহৎ ও দ্রুতগামী জাহাজ নির্মাণ করত। ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিশ মির জুমলা ও শায়েস্তা খাঁর সময়ের নৌবহরের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে কোষা, জলবা, খ্রাব, পারেন্দা, বজরা, পাতেলা, সলব, পালেল বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মাহল কুড়ি, পালওয়ার, জঙ্গি খালু প্রভৃতি প্রকারের নৌকার নাম জানা যায়।[২৩৯] *মাসালিক আল-আবসার* গ্রন্থের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন যে, সে সময় অনেক জাহাজে কারখানা, তন্দুর ও বাজারের ব্যবস্থা ছিল। এসব জাহাজ এতই বৃহৎ ছিল যে, একই জাহাজের যাত্রীরা বেশ কিছুকাল পরে একে অন্যকে জানতে পারত। ইতালীয় বণিক বারথেমা লেখেন, বাংলার লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের প্রকাণ্ড জাহাজ ব্যবহার করে। গিউঙ্গী নামক জাহাজ এক হাজার বড়ো পিপার (টন হিসেবে) মাল বহন করতে পারত।[২৪০] কথিত আছে যে, প্যাটেলা শ্রেণির জাহাজগুলো ১৫০ থেকে ২০০ টন পর্যন্ত পণ্য পরিবহন করত।[২৪১]

এ ছাড়াও এ দেশে আরও বেশ কয়েকটি শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। চৈনিক পরিব্রাজকগণ বাংলায় কার্পেট, ইস্পাতদ্রব্য, কামান, বন্দুক ইত্যাদি শিল্পের উল্লেখ করেছেন। চীনাদের বিবরণে বন্দুক নির্মাণের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, বাঙালিরা পঞ্চদশ শতকের গোড়াতে বন্দুক উৎপাদন ও ব্যবহার জানত। মোগল আমলে বাঙালিরা চমৎকার বন্দুক তৈরি করত; ইংরেজ গোলন্দাজরাও এর প্রশংসা করেছে।[২৪২] গোলাবারুদের আবশ্যকীয় একটি উপাদান ছিল যবক্ষার। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর নিকট এর চাহিদা ছিল ব্যাপক। পূর্ব বাংলায় নির্মিত তরবারির বিশেষ খ্যাতি ছিল। চীনা বিবরণ অনুসারে, অত্যন্ত শক্ত ও উৎকৃষ্ট মানের দু-ধারি তরবারি বাংলায় প্রস্তুত হতো। সে যুগের ঢাকায় সুচশিল্পের কাজ চরম উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

---

[২৩৯] যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার ইতিহাস* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ১৪০

[২৪০] ডক্টর এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

[২৪১] সিরাজুল ইসাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

[২৪২] ডক্টর এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩

https://nagorikpathagar.org

বাংলার অতুলনীয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি ছিল গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য গ্রামেই উৎপন্ন হতো। লোকসংখ্যা কম থাকায় পতিত অনাবাদি জমির অভাব ছিল না। প্রত্যেক গ্রামে যেমন কৃষি ভূমি ছিল, তেমনই গো-চারণ ভূমিও ছিল বিস্তর। অসংখ্য নদনদী, খালবিলের অস্তিত্ব থাকায় মাছেরও প্রাচুর্য ছিল।

প্রাচীন বাংলায় অভ্যন্তরীণ ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। বিদেশি বণিকেরা তাঁতে তৈরি বস্ত্র, সুগন্ধি দ্রব্য, মসলাজাতীয় দ্রব্য বঙ্গদেশ থেকে রফতানি করত। বাংলার মসলিন প্রাচীনকালে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মূলত মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার অর্থনীতি এত দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে যে, বাংলা পৃথিবীর একটি অতি সম্পদশালী দেশ হিসেবে পরিচিত হয় এবং এর কৃষি ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। মাটির উর্বরতা, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যতা এবং বিরাট বৈদেশিক বাণিজ্য বিদেশি বণিক ও পর্যটকদের এত বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে যে, তারা এ দেশকে একটি উদ্যান, এমনকি কেউ কেউ একে স্বর্গ বলেও অভিহিত করেন।[২৪৩] মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই এ প্রদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অথচ পাল ও সেন রাজাদের সময়েও বাংলায় রৌপ্যমুদ্রাও বিরল ছিল।

অসংখ্য নদনদীর কল্যাণে বাংলার সমতলভূমি ছিল বহু শতাব্দীব্যাপী পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল। আবুল ফজলের মতে, বাংলার মাটি এত বেশি উর্বর ছিল যে, একই মাটিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হতো এবং ধানের ডগাগুলো এক রাতেই এক হাত বেড়ে যেত।[২৪৪] এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান, পাট, লাক্ষা, জোয়ার, ভুট্টা, সরিষা, তিসি, তিল, কলাই, শাকসবজি, পিঁয়াজ, রসুন, পান,

---

[২৪৩] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২

[২৪৪] Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, Vol-1, p.130.

https://nagorikpathagar.org

সুপারি, নারিকেল, আম, কলা, কাঁঠাল, ডালিম, কমলালেবু উৎপাদিত হতো। আবুল ফজলের মতে, যদি প্রত্যেক প্রকারের একটি করে শস্যকণা সংগ্রহ করা হতো, তাতে একটি বড়ো কলস ভরে উঠত।[২৪৫] এ অঞ্চলে কিছু খনিজ সম্পদও পাওয়া যেত। আবুল ফজলের মতে, 'বাজুহা' সরকারে (রাজশাহীর অংশবিশেষ, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা) লৌহ খনি ছিল। মান্দারন সরকারে (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম হুগলি) হরপ্পা নামক স্থানে মুক্তার একটি খনি ছিল।[২৪৬] সেকালের মানের বিচারে মুসলিম শাসনামলে বাংলা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম।[২৪৭] সুতি ও রেশমি শিল্পের ঐশ্বর্যে এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং সেকালের সকল সভ্য দেশে এর খ্যাতি ছিল। ইবনে বতুতা, চৈনিক পরিব্রাজকসহ সকল দেশের পরিব্রাজকই বাংলার সুতিবস্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মুসলিম শাসনামলে চিনি একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। জাহাজ নির্মাণশিল্পেও বাংলার গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল। মুসলিম শাসনামলে নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ক্রমবৃদ্ধির ফলে জাহাজ নির্মাণশিল্প বেশ সম্প্রসারিত হয়েছিল। কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বহু পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক রফতানি বাণিজ্যের ফলে মুসলমান শাসনামলে বাংলা খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মোগল বিজয়ের ফলে উপমহাদেশে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশে বাংলার উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তৃত বাজার উন্মুক্ত হয়। সমগ্র প্রদেশব্যাপী সুতি বস্ত্রের কারখানার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ সময় কার্পেট, কাগজ, ইস্পাতদ্রব্য, কামান, বন্দুক ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটে। যবক্ষার নামক গোলাবারুদের অবশ্যকীয় উপাদান এ সময় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়। ইউরোপীয় কোম্পানির নিকট এর চাহিদা ছিল ব্যাপক। তবে মোগল আমলে মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের জাহাজ নির্মাণশিল্পের অবনতি ঘটে। মোগল শাসনামলে বাংলার ক্রমসম্প্রসারণশীল রফতানি বাণিজ্য এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাবসায়িক সম্প্রদায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে টাকা-পয়সা লেনদেনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যস্ত ব্যাবসায়িক পরিমণ্ডল ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। দেশীয় ব্যাংকের কারবার ও ঋণসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা মোগল আমলে উন্নতি লাভ করে। শেঠ, সাহা, মহাজন ও সাররাফ নামে পরিচিত ব্যাংকের কারবারিগণ প্রদেশে পুরোদমে ব্যাংকের ব্যাবসা চালাত। টাকা বিনিময় ও সরবরাহের ব্যাপারে সাররাফরা ছিল খুবই প্রভাবশালী।

---

[২৪৫] Ibid, p.134.

[২৪৬] Ibid, p.136-38.

[২৪৭] ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

https://nagorikpathagar.org

মানুষ তার উৎপত্তিলগ্নে জীবনধারণের লক্ষ্যে শিকারকে বেছে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শিকারি মানুষেরা কৃষিকাজ আয়ত্ত করে। নবোপলীয় যুগে মানুষ কৃষিকাজের সাথে পশুপালনের কৌশলও আয়ত্ত করে।[২৪৮] পশুপালক ও কৃষিজীবীদের সামাজিক শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে পণ্য বিনিময় প্রথা জন্মলাভ করে। এভাবে সূত্রপাত হয় ব্যাবসা-বাণিজ্যের। এ ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রোঞ্জযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে এবং ব্যবস্যা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার ব্যাবসা-বাণিজ্য সুবিদিত ছিল, কিন্তু প্রাচীন বাংলার ব্যাবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসের উৎস নিতান্তই অপ্রতুল।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের লক্ষণগুলো সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অর্থাৎ মৌর্য যুগে পরিস্ফুট হয়। প্রাচীনকালে বাংলার উত্তরাংশ ধান ও তিল উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এসব পণ্য উদ্বৃত্ত থাকত এবং উদ্বৃত্তের একাংশ সরকারি খাদ্যভান্ডারে সংরক্ষিত হতো। উৎপন্ন ফসলের বিশেষ করে ধানের একাংশ সমুদ্রপথে রফতানিও হতো। খ্রিষ্টের জন্মের পূর্ব থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মিশর, শ্রীলঙ্কাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন বাংলার বস্ত্র শিল্পের প্রশংসা লক্ষ করা যায় কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে। বস্ত্রপণ্যই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান রফতানিযোগ্য পণ্য। পেরিপ্লাসের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, চীনের রেশমও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হয়ে উপমহাদেশে আসত। এসব পণ্য দক্ষিণ ভারত হয়ে রোমের বাজারে পৌঁছত সমুদ্রপথে। আরবি ও ফারসি বিবরণীতে (নবম থেকে চতুর্দশ শতক) এবং সমকালীন চৈনিক রচনায় মসলিনের প্রশংসা পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে সুবাক (সুপারি) ও পান ব্যবসায়ের জগতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য ও বিলাসজাত সামগ্রীর পাশাপাশি প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যে পান, সুপারি, লবণ, নারিকেল ও ধানের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

নবম থেকে চতুর্দশ শতকের আরবি রচনায় বারবার এসেছে কামারুনী অগুরু কাঠ এবং গন্ডারের খড়্গের বর্ণনা। এসব বিবরণী থেকে আরও জানা যায়, এগুলো কামরূপ থেকে বাংলার একটি প্রধান বন্দরে আনা হতো। পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় দেশসমূহে এগুলোর বিশেষ কদর ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় অশ্ব ও যুদ্ধাশ্ব

---

[২৪৮] আব্দুল হালিম ও নুরুন নাহার, *মানুষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৬৯

https://nagorikpathagar.org

বাণিজ্যেরও তথ্য পাওয়া গেছে। আদি মধ্য যুগে বাংলার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ঘোড়া আমদানি হতো। চীনের শিঙ্গ রাজারা সমুদ্রপথে বাংলার বন্দর থেকে চীন দেশে ঘোড়া নিয়ে যেতেন। বাংলায় যেসব যুদ্ধাশ্ব আমদানি করা হতো, তার একাংশ সমুদ্রপথে অন্যত্র রফতানি হতো। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় (৭৫০-১২০০ খ্রি.) কড়ির ব্যবহার বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে কড়ি আসত সমুদ্রপথে মালদ্বীপ হতে। ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত করার জন্য আরাকান ও পেগু অঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় সোনা ও রুপা আমদানি করা হতো। তা ছাড়া বিত্তবান গোষ্ঠীর শখ-সৌখিনতা মেটাতে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুর ব্যাবসাও চলত।

প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত নগরগুলোর মধ্যে পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়, বাংলাদেশ), কোটিবর্ষ (বানগড়, পশ্চিমবঙ্গ), বিক্রমপুর (বাংলাদেশ) কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) রামাবতী (রামপালের রাজধানী) বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলা তথা সমগ্র মধ্যগঙ্গা উপত্যকার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি।[২৪৯] তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে সমুদ্রপথে তিনটি নৌবাণিজ্য পরিচালিত হতো। একটি দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে কলিঙ্গ করমণ্ডল উপকূল থেকে শ্রীলঙ্কা পার হয়ে পাশ্চাত্যের দিকে, একটি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূল ধরে মালয় প্রণালির মধ্য দিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত, শেষটি দক্ষিণ-পশ্চিম উড়িষ্যার গঞ্জম জেলার গোপালপুরের নিকট পালোরা উপকূল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপমালা পর্যন্ত। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে চীনে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। আদিযুগে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ থাকার কারণেই বাংলার অর্থনীতি কখনো স্তিমিত হয়ে পড়েনি, কিংবা এখানে আর্থিক অনটন দেখা দেয়নি।

অসংখ্য নদীনালার কল্যাণে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচব্যবস্থার কারণে বাংলার সমতল ভূমি ছিল খুবই উর্বর। এ অসাধারণ উর্বরা শক্তি প্রচুর শস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে সহায়তা করত। পাট, আখ, রেশম গুটি এবং জাহাজ নির্মাণকে কেন্দ্র করে অনেক শিল্পকারখানাও গড়ে উঠেছিল। কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃত্তি এবং সমুদ্রযাত্রায় মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনার ফলে বাংলার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিদেশি পর্যটক ও বণিকগণ বাংলার বন্দর ও নগর সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন চীনা দূতের বর্ণনামতে, 'সা-টি-কিং (চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম) সাগরের মুখে

[২৪৯] আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

https://nagorikpathagar.org

অবস্থিত। বিদেশি বণিকগণ এখানে আগমন করে এবং জাহাজ নোঙর করে। তারা এখানে সমবেত হয়ে পণ্যদ্রব্যের মুনাফা বণ্টন করে।'[২৫০]

বাংলার বাণিজ্যে বিদেশিদের আগমন

পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে পের্টোগ্রান্ডি (বড়ো বন্দর) বলে অভিহিত করত। আবুল ফজলও চট্টগ্রামকে একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫১] সাতগাঁও ছিল আরেকটি বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্র। ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ এটাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রাচুর্যপূর্ণ শহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ভাগীরথী গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে সাতগাঁও বন্দরের অবনতি হয় এবং বন্দর হিসেবে হুগলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া এ সময় অনেক অভ্যন্তরীণ শহর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দরে উন্নীত হয়। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সোনারগাঁও একটি প্রধান বন্দর ছিল। একজন চৈনিক দূত বলেন, 'সোনা-উর-কোঙ্গ (সোনারগাঁও) একটি বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র, এখানে সমস্ত পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বণ্টন করা হয়।'[২৫২] ষোড়শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর ছিল এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতি বস্ত্র বিদেশে যেত। প্রচুর চাল সমগ্র ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হতো।

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যে বাংলার প্রাচুর্য এবং রফতানি বাণিজ্য সপ্তদশ শতকে বার্নিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলার মতো নানা ধরনের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য বিদেশি বণিকদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি বলেন—'বাংলাদেশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত বেশি চাল উৎপন্ন করে যে, তা কেবল প্রতিবেশী রাজগুলোতে নয়; দূরবর্তী রাজসমূহেও সরবরাহ করে।' তিনি বাংলাদেশকে সুতা ও রেশমের অসাধারণ ভান্ডার বলে অভিহিত করেন। তা ছাড়া তিনি লবণ, লাক্ষা, আফিম, মোম, মরিচ, ঘি, আম, আনারস, লেবু, আদা প্রভৃতি বাণিজ্যিক পণ্যেরও বিবরণ প্রদান করেন।[২৫৩] সুলতানি যুগের পতনের প্রথম পর্বে পর্তুগিজ বণিকেরা বঙ্গোপসাগরে চলে আসে এবং ষোলো শতকের ত্রিশের দশকে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে

---

[২৫০] Allami, Abul Fadl, *Ain-i-Akbari*, Vol-2, Tr. H.S, Jarret (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1891 & 1894 respectively), p. 137.

[২৫১] ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩৫১

[২৫২] ড. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

[২৫৩] *বাংলাপিডিয়া*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

https://nagorikpathagar.org

তোলে।[২৫৪] ষোলো শতকের শেষ দুই দশকে বদ্বীপের গভীর অভ্যন্তরে মোগলদের আগমন অবধি পর্তুগিজরা হুগলিতে বন্দর গড়ে তোলে। চট্টগ্রামে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঘটায় তারা ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাণিজ্য বসতি স্থাপন করে। তাদের উদ্যোগে হুগলি বাংলার প্রধান বন্দরে পরিণত হয়।

১৬৩২ সাল পর্যন্ত বাংলার ব্যাবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করত পর্তুগিজরা। পর্তুগিজরা সাতগাঁওকে বলত 'পর্তুপিকোয়েনো'। এখান থেকে প্রতি বছর ৩০ থেকে ৩৫টি জাহাজ বিভিন্ন পণ্য বোঝাই করে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করত। ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন ক্যাবরাল লেখেন যে, হুগলি সারা পৃথিবীর সাধারণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে ভারত, চীন, মালাক্কা ও ম্যানিলার অনেক জাহাজ পুনর্মেরামতের জন্য আসত। তিনি আরও লিখেছেন—শুধু এ দেশের অধিবাসীরাই নয়; হিন্দুস্তানি মোগল, পারসিক ও আর্মেনীয় বণিকেরাও এখানে দ্রব্য ক্রয় করতে আসত।[২৫৫] পর্তুগিজরা দক্ষিণ ভারত, এমনকি সুমাত্রা, বোর্নিও, মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সিল্কের কারুকার্য করা বুটিদার জরির কাপড়, মখমল, বিভিন্ন দৃশ্যখচিত বস্ত্র, পাতলা চকচকে রেশমি কাপড়, মসলিন প্রভৃতি আমদানি করত। তারা মালাক্কা থেকে লবঙ্গ, জয়ফল, দাঁত বাঁধানোর ধাতু; শ্রীলঙ্কা থেকে দারুচিনি এবং চীন দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে চীনামাটির বাসন, তৈজসপত্র ও মূল্যবান মণিমুক্তা নিয়ে আসত। তারা সলোর ও তিমুর থেকে প্রচুর পরিমাণে লাল ও সাদা চন্দন আমদানি করত।

পর্তুগিজরা বাংলায় খুবই লাভজনক বাণিজ্য পরিচালনা করত এবং বাংলার সমুদ্র ও বহির্বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ক্রমেই তারা অত্যাচার ও লুটতরাজ শুরু করে এবং সত্তর শতকের শুরুতেই তাদের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। মোগল সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বাংলার সুবেদার কাসিম খান তাদের হুগলি থেকে বিতাড়িত করেন। তা ছাড়া ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের তীব্র প্রতিযোগিতাও পর্তুগিজ বাণিজ্যের অবনতির অন্যতম কারণ। পর্তুগিজদের পথ অনুসরণ করে হল্যান্ডের অধিবাসী ডাচ বা ওলন্দাজগণ ভারতবর্ষে আসে।

১৭ শতকের গোড়ার দিকে ওলন্দাজগণ 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাংলার পিপলি বন্দরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এবং পরবর্তী সময়ে বালেশ্বরে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থানান্তরিত করে। কিন্তু হুগলি নদীর তীরে তাদের কুঠি স্থাপিত হওয়ার পর বাংলার বহির্বাণিজ্যে তাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি হতে থাকে। তারা মাদ্রাজের নাগাপট্টম; পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, তেজগাঁও,

[২৫৪]প্রাগুক্ত,পৃ. ২৫৯

[২৫৫]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

https://nagorikpathagar.org

বুড়িগঙ্গা নদীর তীর এবং বর্তমান সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এলাকাতে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। ওলন্দাজগণ বাংলা থেকে কাঁচা রেশমি সুতা, সুতি কাপড়, চাল, ডাল, তামা ইত্যাদি রফতানি করত। মসলার বাণিজ্যে তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ। জন টেলরের মতে আঠারো শতকে ওলন্দাজ কোম্পানি দেশি গোমস্তা বা এজেন্টদের সাহায্যে ঢাকার মসলিন সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দিত।[২৫৬] প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাণিজ্য পরিচালনা করত। ফলে আঠারো শতকের দিকে তাদের বাণিজ্য হ্রাস পায়। পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের সাথে টিকতে না পেরে পর্তুগিজরা এ দেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় বসতি স্থাপন করে।

ডেনমার্কের অধিবাসী ডেনিশ বা দিনেমাররা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এ দেশে আসে।[২৫৭] তাদের বাণিজ্যের পরিধি ছিল সীমিত। তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল তাঞ্জোরের ট্রাঙ্কুরায় এবং পশ্চিম শ্রীরামপুরে। বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে না পেরে পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজদের নিকট বাণিজ্যকুঠি বিক্রি করে তারা এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সর্বশেষে বাণিজ্য করতে আসে ফরাসিগণ। তারা ১৬৬৪ সালে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে এ অঞ্চলে বাণিজ্য শুরু করে।[২৫৮]

ধীরে ধীরে তারা সুরাত, পন্ডিচেরি, চন্দননগর, মাহে, কারিকাল, মসলিপট্টম, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে কাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। তারা প্রায় ১০০ বছর এ দেশে বাণিজ্য করে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। পন্ডিচেরিতে তাদের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল। আধিপত্য কায়েমকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সাথে ফরাসিদের প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন কারণে ইউরোপ ও আমেরিকাতে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধের রেশ ধরেই ভারতেও এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে ফরাসিদের নিকট থেকে চন্দননগর এবং ১৭৬০ সালে পন্ডিচেরি কেড়ে নেয়। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধে জয়ের ফলে বাংলার ওপর ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরাসিরা এখান থেকে সরে পড়ে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার এবং ইংরেজ বণিক ছাড়াও ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্ল্যান্ডার্সের বণিকগণ 'ওস্টেন্ড কোম্পানি'; ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে

---

[২৫৬] *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Vol-VII, No. 2 pp. 306-307.

[২৫৭] *বাংলাপিডিয়া*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

[২৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

https://nagorikpathagar.org

সুইডেনের বণিক সম্প্রদায় 'সুইডিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'; অস্ট্রিয়ার বণিকগণ 'অস্ট্রিয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে এ অঞ্চলে বাণিজ্য করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তাদের কারও চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।[২৫৯]

ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি ছাড়াও অনেক বিদেশি ব্যবসায়ী বাংলার বাণিজ্যে বিশেষ তৎপর ছিল। সামসময়িক লেখকদের বিবরণীতে এসব ব্যবসায়ীদের মূর, মোগল, পাঠান, ইরানি, তুরানি ও আর্মেনিয়ান নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬০] প্রথম দিকে ইউরোপীয় বণিকদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল মসলা বাণিজ্যের দিকে। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা মসলার দ্বীপ বলে পরিচিত প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ থেকে মসলা সংগ্রহের চেষ্টা করে। এ কোম্পানিগুলো তাদের ভাষায় নতুন বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত রুপা দিয়ে মসলা ক্রয়ের প্রয়াস চালায়। কিন্তু তারা খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে যে, ওই অঞ্চলে রুপার কোনো চাহিদা নেই; বরং সেখানে রয়েছে বাংলার উৎপাদিত সস্তা দামের মোটা সুতি বস্ত্রের চাহিদা। তাই তারা বাংলার সুতি বস্ত্রের দিকে নজর দেয়। মসলা দ্বীপপুঞ্জের বিশাল চাহিদা মেটানোর জন্য প্রচুর সস্তা দামের মোটা কাপড় উৎপাদনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো করমণ্ডল উপকূলকে বেছে নেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে করমণ্ডল অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য ঝুঁকিপূর্ণ, অনিশ্চিত ও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো বাংলার দিকে নজর দেয়।

কোম্পানিগুলো বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বাংলা ছিল অধিকতর সুবিধাজনক এলাকা। বাংলা ছিল অপেক্ষাকৃত কম খরচে উন্নতমানের মোটা সুতি কাপড় উৎপাদন কেন্দ্র। দ্বিতীয়ত বাংলার সিল্ক ছিল তাদের কাছে লাভজনক পণ্য। উন্নতমান ও তুলনামূলকভাবে সস্তা হওয়ার কারণে এ সময় ইতালীয় ও পারসিক সিল্কের পরিবর্তে ইউরোপে বাংলা সিল্কের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উপরন্তু, তৃতীয় একটি লাভজনক বাণিজ্যপণ্য ছিল সোরা। ইউরোপে সোরার ভীষণ চাহিদা ছিল। আবার ইউরোপগামী জাহাজ সমুদ্রবক্ষে স্থির রাখার জন্য সোরার মতো ভারী জিনিস জাহাজের তলদেশে স্থাপন করা ছিল সুবিধাজনক। সুতরাং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো গভীর আগ্রহের সাথে বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে।

সতেরো শতকের সত্তরের দশকে বাংলা থেকে কাঁচা সিল্ক রফতানি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত সতেরো দশকের আশির দশকে বাংলার কাপড় রফতানি আকস্মিক বৃদ্ধি পেলে

---

[২৫৯]ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা* (কলকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ৬০

[২৬০]*Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, op.cit.

https://nagorikpathagar.org

কোম্পানিসমূহের এশীয় বাণিজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কারণ, এ সময় ইংল্যান্ড ও ইউরোপে বাংলার কাপড় ফ্যাশনে পরিণত হয়। ফলে বাংলার কাপড়ের চাহিদা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এরই ফলে কোম্পানিগুলোর এশীয় বাণিজ্যে বাংলা হয়ে দাঁড়ায় প্রধান ক্ষেত্র। সতেরো শতকের আশির দশক থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ডাচ ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অষ্টাদশ শতকের বিশের দশকে ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসি কোম্পানিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তুলনায় অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্য তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইংরেজ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজরা ইউরোপীয় ও এ দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দেয় এবং বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আর্য, শক, হূন, গ্রিক ও মুসলমানদের আগমন ঘটেছে প্রধানত স্থলপথে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে। কিন্তু ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে সমুদ্রপথে এবং তা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মসলাসহ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের যে চাহিদা ইউরোপে ছিল, তা তারা আরব বণিকদের মাধ্যমে সংগ্রহ করত। কেননা, ভারত বা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসার পথ তাদের জানা না থাকায় এসব ভূখণ্ডের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সরাসরি স্থাপিত হতে পারেনি। কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ অবস্থার অবসান ঘটে।

এ শতাব্দীতে ইউরোপের নানান জাতির মধ্যে দেখা দেয় অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। তারা বেরিয়ে পড়ে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে। এসব অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার। ইতালীয় নাবিক কলম্বাস স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলার সমর্থনপুষ্ট হয়ে ১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দে এ উদ্দেশ্যেই যাত্রা করে পৌঁছে যান এক নতুন ভূখণ্ডে এবং এর নাম দেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়া। আসলে সেটা ছিল আমেরিকা মহাদেশ। যাহোক, ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সফল হন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা। তিনি ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। নাবিক ভাস্কো দা গামার এ সাফল্যের ফলে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমুদ্রের এ এলাকায় আরব ও তুর্কি নৌশক্তির আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। শীঘ্রই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয় হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজ, হল্যান্ড ও ফ্রান্সকে বিতাড়িত করে ইংল্যান্ড অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

https://nagorikpathagar.org

বিদেশি বণিক ও কোম্পানির কার্যক্রম

ইংল্যান্ডের ২১৭ জন অংশীদার ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি বণিক সংঘ গঠন করে নাম দেন 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। কোম্পানি রানি এলিজাবেথের নিকট থেকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাবসা-বাণিজ্য করার রাজকীয় সনদ (Royal Charter) লাভ করে। রাজকীয় সনদের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হলেও তাদের প্রথম বাণিজ্য তরি ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে সুরাটে এসে পৌছায় ১৬০৮ সালে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে অনেক বিদেশি ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিল এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য সম্রাটের বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও সম্রাটের অনুকূল্য লাভের প্রচেষ্টা চালায়। উইলিয়াম হকিন্স ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের চিঠিসহ জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের চেষ্টা করেন। এ সময় পর্তুগিজ নাবিকেরা ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তারা অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকের বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের বিরোধিতা করত। পর্তুগিজরা উইলিয়াম হকিন্সকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হকিন্স সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সম্রাট হকিন্সকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান, চারশত মনসব প্রদান করেন এবং হকিন্স-এর আবেদন অনুযায়ী ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করেন।[২৬১]

১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা প্রথম জেমস স্যার টমাস রো নামক আরেকজন দূতকে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। সুদক্ষ কূটনীতিবিদ টমাস রো সম্রাজ্ঞী নুরজাহান, ভাবী সম্রাট খুররম (সম্রাট শাহজাহান) এবং আসফ খানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। খুররম বাংলাদেশে এবং মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা দানের প্রতিজ্ঞা করেন এবং সুরাট বন্দর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পর্তুগিজদের বিরোধিতার কারণে টমাস রো'র কাজ অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। রো একটি ফরমানের খসড়া রাজদরবারে পেশ করলে তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদের সামান্য বাণিজ্যিক সুবিধা দান করে একটি ফরমান জারি করেন। কিন্তু শাহজাদা খুররম ছিলেন ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ফলে ইংরেজরা স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে এবং ইচ্ছেমতো বন্দরে ঘর ভাড়া নেওয়ারও অধিকার পায়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের বাণিজ্যিক ইতিহাসে এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর থেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদের মর্যাদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে

---

[২৬১]ড. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

https://nagorikpathagar.org

থাকে। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে যখন টমাস রো ভারতবর্ষ ত্যাগ করছিলেন; তখন সুরাট, আগ্রা, আহমেদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে পুরো উদ্যমে বাণিজ্য পরিচালনা করছিল।

১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথরিনকে বিয়ে করলে ভারতে পর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চল বোম্বাই শহরটি তাকে যৌতুক হিসেবে প্রদান করা হয়। কয়েক বছর পর দ্বিতীয় চার্লস্ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট তা হস্তান্তর করেন। এরপর থেকেই বোম্বাই ইংরেজ কুঠিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুঠিতে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে ইংরেজরা গোলকুন্ডার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, মসুলিপট্টম, কালিকট-এর অনতিদূরে আরমাগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে গোলকুন্ডার সুলতানের নিকট থেকে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্কের বিনিময়ে গোলকুন্ডার সর্বত্র তারা বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট থেকে ফ্রান্সিস ডে নামক জনৈক ইংরেজ বণিক মাদ্রাজে সুরক্ষিত বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। এই সুরক্ষিত বাণিজ্যকুঠি তৎকালে ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে পরিচিত ছিল।[২৬২] উপরিউক্ত অঞ্চল ছাড়াও হরিহরপুর, হুগলি, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সতেরো শতকের প্রথম দিকে ভারতে বাণিজ্য শুরু করলেও বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন উড়িষ্যায় বাণিজ্যিক তৎপরতা শুরু করতে তাদের বেশ কিছু সময় লাগে। তারা প্রথমে উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং হরিহরপুরে কুঠি স্থাপন করে। সেখান থেকেই তারা বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করত। সম্রাট শাহজাহান প্রথম ইংরেজদেরকে হুগলিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ইংরেজ বণিকেরা সর্বপ্রথম ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার হুগলি বন্দরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। তারা বার্ষিক ৩০০০ টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজার নিকট হতে প্রদেশের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। এই বিরাট সুবিধা লাভ করার ফলে ইংরেজ বণিকগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বন্দর ও শহরগুলোতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়।

১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের বাংলাদেশ থেকে রফতানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৪ হাজার পাউন্ড। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার

---

[২৬২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

https://nagorikpathagar.org

পাউন্ডে। ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও তারা নামমাত্র ৩০০০ টাকা নজরানা দিত এবং বাণিজ্য শুল্ক দিতে অস্বীকার করত। এর ফলে মোগল সরকারগণ শুল্ক থেকে বঞ্চিত হতো। তা ছাড়া অন্যান্য দেশি ও বিদেশি বণিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হতো। উপরন্তু ৩০০০ টাকা কর দেওয়ার বিনিময়ে কোম্পানিকে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তার আড়ালে ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হতো এবং নিজেদের পণ্য কোম্পানির পণ্যরূপে ঘোষণা দিয়ে শুল্ক থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করত। সুতরাং শুল্কের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত জটিল। ইংরেজরা ব্যবসায় এতই লাভ করতে থাকে যে, তারা হুগলি, ঢাকা, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে এবং মূলধন বৃদ্ধি করে বাণিজ্যকুঠিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। ব্যাবসা বৃদ্ধি পেতে পেতে তাদের মূলধন মাত্র ২০ বছরে প্রায় ২৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ায় অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তা ছাড়া শাহ সুজা একজন সুবেদার হিসেবে ইংরেজ বণিকদের অনেক বেশি সুবিধা দিয়েছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাদের এ সুবিধা প্রদান করেননি। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব সকল ব্যবসায়ীদের ওপর একই হারে শুল্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি সকল ব্যবসায়ীর জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক ধার্য করেন। এতে ইংরেজরা অসন্তুষ্ট হয় এবং শুল্ক ফাঁকি দিতে শুরু করে। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বণিকদের অভিযোগ ছিল। হুগলির ইংরেজ কুঠির এজেন্ট উইলিয়াম হেজ সুবেদার শায়েস্তা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এ বিষয়ে তার নিকট অভিযোগ করেন ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। শায়েস্তা খান অভিযোগের প্রতিকার করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ থেকে রেহাই পায়নি। তখন উইলিয়াম হেজ ও অন্যান্য ইংরেজপ্রধানরা নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিলেতে বণিক সংঘের কর্মকর্তাদের নিকট প্রস্তাব পাঠান। তদানুযায়ী ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে সৈন্যসহ কয়েকটি জাহাজ ভারতে প্রেরণ করা হয়। এদের মধ্যে তিনটি সৈন্য বোঝাই জাহাজ হুগলিতে আসে। শায়েস্তা খান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে হুগলিতে সৈন্য সমাবেশ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

ইংরেজরা পরাজিত হয়ে হুগলি ত্যাগ করে এবং সুতানুটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুতানুটির ইংরেজ এজেন্ট জব চার্নক সুবেদারের সাথে আপস করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনোরূপ সমঝোতা না হলে ইংরেজরা সুতানুটি ত্যাগ করে হিজলির দিকে চলে যায়। পথে তারা মোগলদের থানা দুর্গ (বর্তমান মাটিয়াবুরুজ) অধিকার করে।

https://nagorikpathagar.org

তারা হিজলি দুর্গও অধিকার করে। শায়েস্তা খান ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য ১২,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ইংরেজদের সাথে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হিজলি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে শায়েস্তা খান পুনরায় ইংরেজদের হুগলিতে ফিরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু এ সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলে মোগলদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। ফলে শায়েস্তা খান তার অনুমতি প্রত্যাহার করেন। জব চার্নকও সুতানুটি ত্যাগ করেন।

ইতোমধ্যে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান বদলি হয়ে বাংলা ছেড়ে আগ্রায় চলে যান। তারপর খানজাহান বাহাদুর স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তী সময়ে ইবরাহিম খান ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। মোগল সরকার এবং ইংরেজ কোম্পানি উভয়েই উপলব্ধি করে যে, বাণিজ্য বন্ধ থাকা উভয়পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে স্বীকৃত হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব তাদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের আবার বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। সুবেদার ইবরাহিম খান ইংরেজদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনেন। জব চার্নক ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে হুগলির অনতিদূরে কলকাতা নামক স্থানে কুঠি স্থাপন করে কলকাতা নগরীর পত্তন করেন।[২৬৩] ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা আজিমুশশানের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রাম ক্রয় করে এবং ওই স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এ দুর্গ ইংল্যান্ডের রাজার নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম রাখা হয়। এ দুর্গই বাংলাদেশে ইংরেজদের সর্বপ্রথম জমিদারিতে পরিণত হয় এবং পরে তারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হতে সক্ষম হয়।[২৬৪]

১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব পৌত্র মুহাম্মাদ আজিমকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মুহাম্মাদ আজিম প্রথম তিন বছর নিরঙ্কুশভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একচেটিয়া কারবার করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। ফলে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্রাটের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মুর্শিদকুলি খানকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

মুর্শিদকুলি খান যখন বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন, তখন ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। কেননা, ১৬৯৮ সালে পার্লামেন্টের এক আইন অনুযায়ী ইংরেজ রাজা তৃতীয় উইলিয়াম পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যরত নতুন

---

[২৬৩]আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

[২৬৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০-৩১

https://nagorikpathagar.org

এক কোম্পানিকে সনদ প্রদান করেন। নতুন কোম্পানি নতুনভাবে বাণিজ্য শুরু করে। কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। তাই ইংরেজ রাজা নতুন কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করার জন্য স্যার উইলিয়াম নরিসকে মোগল সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। নতুন কোম্পানির সভাপতি স্যার এডওয়ার্ড লিটলটনও বাংলাদেশে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে ১৭০২ সালে ২২ জুলাই 'সংযুক্তিকরণ' সনদের মাধ্যমে দুটি কোম্পানিকে এক করে 'দি ইউনাইটেড কোম্পানি অব মার্চেন্টস অব ইংল্যান্ড ট্রেডিং টু দি ইস্ট ইন্ডিজ' নামকরণ করা হয়। ১৭০৮ সালে পার্লামেন্টের একটি আইনের মাধ্যমে উদ্যোগটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজদের কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭১০ থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ বণিকদের লক্ষ্য ছিল শাহি ফরমান লাভ করা।

১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ফারুখশিয়ার মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলার ইংরেজ বণিকগণ সারমান ও ড. হ্যামিল্টনকে সম্রাট ফারুখশিয়ারের নিকট প্রেরণ করেন। হ্যামিল্টন ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসায় সম্রাট ফারুখশিয়ার এক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি ইংরেজ বণিকদের এক নতুন ফরমান দ্বারা বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন,[২৬৫] এমনকি কোম্পানিকে নিজ টাঁকশালে টাকা তৈরির অনুমতি দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর কর্মকর্তাগণ এসব সুযোগ-সুবিধা কেবল ব্যাবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করেননি, এ সুযোগে তারা ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নানা কলাকৌশল গ্রহণ করেন। ফারুখশিয়ারের ফরমান বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের ম্যাগনাকার্টা হিসেবে বিবেচিত। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা—এ তিনটি গ্রামের ইজারা বহাল রাখা ছাড়াও আরও ৩৮টি গ্রাম ইজারা নেওয়ার অনুমতি ফরমানে ছিল। তা ছাড়া বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত 'দস্তক' (বিশেষ অনুমতি) ছাড়াই ব্রিটিশদের মালপত্র চলাচলের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা, ঢাকা, কাশিমবাজার এবং বাংলার অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্রের আশেপাশে তাঁতি সম্প্রদায় নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় দালালেরা তাঁতিদের কাঁচামাল সরবরাহ করত এবং ইউরোপীয় বাজারে বিক্রয় দ্রব্যাদি তৈরির ফরমাশ দিত। এসব দালালেরা কেবল কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে নয়, স্বনামেও কারিগরদের নিকট থেকে পণ্যাদি ক্রয় করত।[২৬৬] এভাবে ব্রিটিশদের বাণিজ্য অপ্রতিরোধ্যভাবে

---

[২৬৫] ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

[২৬৬] কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

https://nagorikpathagar.org

বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর কমতে থাকে নবাবের মুনাফা। এতে বাংলার নবাব খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। মূলত মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর (১৭২৭) পর ইংরেজদের বাণিজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের ফলে ইংরেজ বণিকেরা রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। নবাব আলিবর্দি খানের শাসনামলে (১৭৩৯-৬৫ খ্রি.) ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্বে ইংরেজ বণিকদের যেখানে চার থেকে পাঁচটি জাহাজে বাণিজ্য চলত, সেখানে ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে এরা ৪০ থেকে ৫০টি জাহাজ ব্যবহার করত।[২৬৭]

বণিকেরা প্রায়ই শুল্ক ফাঁকি দিত এবং বাণিজ্য প্রতিযোগিতা থেকে অন্যদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করত। ১৭৪৫ সালে নবাব এক ফরমানের মাধ্যমে সকল বণিকে উপনিবেশ দুর্গ স্থাপন করতে নিষেধ করেন। নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংরেজ বণিকেরা আলিবর্দির সময়ে কয়েকবার অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল। তবে আলিবর্দির প্রতাপে ভীত হয়ে তারা তার আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হতেন। কিন্তু ২২ বছরের তরুণ নবাবের শাসনকালের শুরু থেকেই ইংরেজ বণিকদের আচরণে অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। তারা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নবাবের সিংহাসন আরোহণের দিন উপহার-উপঢৌকনসহ অভিনন্দন জ্ঞাপনে বিরত থাকে। শুধু তা-ই নয়, কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের অবাধ্য ও অপরাধী কর্মচারীদের আশ্রয় প্রদান করে এবং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব এ দেশের ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের ওপর পড়ে। ইংরেজরা কলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে নতুন দুর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। নবাব দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন। ফরাসিরা তার আদেশ মেনে নিলেও ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে নতুনভাবে নির্মাণ করে দুর্ভেদ্য করে তোলে। ইংরেজ বণিকদের অবাধ্যতায় ক্ষুব্ধ হয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন।

১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুন নবাব ইংরেজদের কাশিমবাজার বাণিজ্যকুঠি অধিকার করে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। নবাব ২০ জুন কলকাতা দখল করেন। ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি ইংরেজ প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলকাতা আক্রমণ করে। ক্লাইভ সহজেই কলকাতা পুনরুদ্ধার করে এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষিত করে। নবাব পালটা আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে

---

[২৬৭] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

https://nagorikpathagar.org

আলিনগরের সন্ধি (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭) করতে বাধ্য হন। নবাব ইংরেজদের বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যার্পণ করেন এবং তাদের কলকাতার দুর্গ সুরক্ষিত করতে অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে আবারও নবাবের সাথে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশিতে চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হন। নবাবের নিকটাত্মীয় ঘষেটি বেগম এবং অমাত্যবর্গ জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ ও সেনানায়ক মির জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের বাহিনী পরাজিত হয়। বন্দি অবস্থায় নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[২৬৮]

[২৬৮] এ. কে. এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) পৃ. ৩৮০

https://nagorikpathagar.org

বাংলার মুদ্রা ও প্রশাসন

মুদ্রা

মুদ্রা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির পরিচয় বহনের সাথে সাথে ইতিহাস পুনর্গঠনেও ভূমিকা পালন করে থাকে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এটা এক অনন্য মাইলফলক। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম প্রশাসনে রোমান, সাসানীয় ও হিমারীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল। রাজস্ব প্রশাসনের অরাজকতা দূরীকরণে ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালেক দামেশকে সর্বপ্রথম খাঁটি আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা 'দিনার' এবং রৌপ্যমুদ্রা 'দিরহাম' চালু করেন। তিনি মুসলিম মুদ্রাকে আকর্ষণীয় করার জন্য রোমান দিনার অপেক্ষা মুসলিম মুদ্রায় ২% স্বর্ণ বেশি প্রদান করেছিলেন। আদি-মধ্য-পর্বে বাংলায় একটি জটিল ত্রি-স্তরবিশিষ্ট মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ত্রি-স্তর মুদ্রাব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল কড়ি আর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল রৌপ্যমুদ্রা। মধ্যবর্তী স্থানে ছিল 'ধাতব চূর্ণ'। মূলত আদি মধ্যকালীন বাংলায় মূল্যবান ধাতব মুদ্রা ছিল দুষ্প্রাপ্য। বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল কড়ি। পাল সেন শাসিত ভূখণ্ডের কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় না। মুসলিম শাসনব্যবস্থায় শাসকের স্বনামে মুদ্রা প্রচলন এবং খুতবায় নিজ নাম প্রচার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।

ত্রয়োদশ শতকে বাংলার মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রার পুনরাবির্ভাব ঘটে বাংলার সুলতানদের উদ্যোগে। বখতিয়ার খলজি গৌড় বিজয়ের স্মরণে দিল্লির সুলতান মুহাম্মাদ বিন শামসের নামে গৌড় থেকে স্বর্ণমুদ্রা জারি করেছিলেন। এই মুদ্রার মুখ্য দিকে লক্ষি দেবীর মূর্তি এবং নাগরী লিপিতে সুলতানের নাম মুহাম্মাদ বিন শামস লেখা ছিল। মুদ্রার গৌণ পিঠে বর্শাধারী একজন অশ্বারোহীর ছবি বিচিত্র রয়েছে এবং তার নিচে নগরী লিপিতে লিখা রয়েছে 'গৌড় বিজয়'। এটিই ছিল বাংলায় জারিকৃত প্রথম মুসলিম মুদ্রা। ৬০১ হিজরিতে গৌড় থেকে উৎকীর্ণ মুহাম্মাদ বিন শামসের ঘোড়সওয়ার শ্রেণির কিছু রৌপ্য মুদ্রাও পাওয়া গেছে। বখতিয়ার খলজির গৌড় বিজয়ের সময়কাল বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার (১৩৩৮ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত ১৩০ বছর বাংলা দিল্লির সুলতানদের অধীনে একটি প্রদেশ ছিল। বাংলার প্রাদেশিক গভর্নরগণ দিল্লি সালতানাতের অনুকরণে বাংলা থেকে স্বীয় সুলতানদের

https://nagorikpathagar.org

নামে মুদ্রা জারি করেন। গভর্নরদের চারজন সুলতানদের সঙ্গে মুদ্রায় নিজের নাম উৎকীর্ণ করেছিলেন। এর সবগুলোই ছিল রৌপ্যমুদ্রা।

এ সকল মুদ্রার একদিকে কখনো আব্বাসীয় খলিফা ও সুলতানের নাম এবং অপরদিকে গভর্নরের নাম কিংবা একদিকে শুধু আব্বাসীয় খলিফার নাম এবং অপরদিকে সুলতান ও গভর্নরের নাম অথবা একদিকে দিল্লির সুলতানের নাম এবং অপরদিকে উপাধিসহ গভর্নরের নাম এবং প্রান্তে টাঁকশাল ও তারিখ স্থান পেয়েছে। মোট চারজন গভর্নর নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এগুলো ছিল রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দনি মোবারক শাহ সোনারগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুদ্রা জারি করেন। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলের কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রতি বছরের প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। প্রাথমিক ইলিয়াস শাহি বংশের শাসনের প্রত্যেকেরই প্রচুর পরিমাণে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। ইলিয়াস শাহের একটি দুই টাকা মূল্যমানের স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে, অন্য স্বর্ণমুদ্রাগুলো এক টাকা মানের। ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও, শহর-ই-নও, চাউলিস্তান Did Avi সহ কামরু, মুয়াজ্জামাবাদ, জান্নাতাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রাগুলো জারিকৃত।

রাজা গণেশও ক্ষমতা গ্রহণ করে মুদ্রা জারি করেছিলেন এবং মুদ্রায় আরবির পরিবর্তনে বাংলালিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন। তার প্রচলিত মুদ্রায় হিজরির পরিবর্তে শকাব্দ সাল হিসাব ব্যবহৃত হয়েছে। তার পুত্র মহেন্দ্রও পিতার অনুকরণে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তাদের মুদ্রাগুলো পাণ্ডুনগর, চট্টগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম থেকে জারিকৃত। কিন্তু অপর পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ও তার পুত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা জারি করেছিলেন। পরবর্তী ইলিয়াস শাহি বংশের মোট পাঁচজন শাসকও মুদ্রা জারি করেছিলেন। এদের মধ্যে তিনজন শাসকের স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। হাবশি শাসনামলেও চারজন শাসকের প্রত্যেকের স্বনামে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। হাবশিপরবর্তী হোসেন শাহি বংশের সুলতানদের স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং কিছু তাম্রমুদ্রাও পাওয়া গেছে। হোসেন শাহি আমলে প্রাপ্ত প্রচুরসংখ্যক মুদ্রা বাংলার সমৃদ্ধির কথাই ঘোষণা করে। শেরশাহ তান্ডা ও বাংলা থেকে রৌপ্যমুদ্রা জারি করেছিলেন।

এ সময় মুদ্রাগুলো গোলাকৃতি, ষড়ভুজাকৃতি ও আট পাপড়ি আকৃতির ছিল। বাংলার সুলতানগণ ব্যাপকভাবে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। এসব মুদ্রা প্রাচীন ভারতের মুদ্রামানের সমতুল্য ওজন (১৭৫ গ্রেন) ছিল। নিরেট ধাতু কিংবা খাদ মেশানোর কারণে ওজনের সামান্য হেরফের হতো। প্রথম দিকের অনেক সুলতান দিল্লির সুলতানদের অনুকরণে ১৭০ গ্রেন ওজনের মুদ্রা চালু করলেও একটি নির্দিষ্ট

https://nagorikpathagar.org

মান হিসেবে তা ১৬৬ গ্রেনে এসে দাঁড়ায়। দিল্লির সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের মুদ্রায় প্রথম টংকা শব্দটি চালু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকা এই টংকা থেকেই উদ্ভূত। স্বর্ণমুদ্রা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম এবং বড়ো বড়ো লেনদেনে, স্মারক ও স্যুভেনির হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ প্রায় ২০০ বছর পর বাংলার মুদ্রায় পুনরায় কালিমার প্রবর্তন করেছিলেন। সাধারণত মুদ্রা জারিতে সাতাশটি টাঁকশাল ব্যবহৃত হয়েছিল সুলতানি বাংলায়।[২৬৯] সুলতানি মুদ্রার লিপিশৈলী ছিল মনোরম। প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মুদ্রা সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—

> ফখরুদ্দীনের মুদ্রা মুদ্রনশৈলীর যথার্থ রত্ন। সোনারগাঁও-এর শিল্পীদের দক্ষতা এ ব্যাপারে বিপুলভাবে সাক্ষ্য দেয়। মুদ্রাগুলোর আকৃতি স্বাভাবিক। এতে অঙ্কিত লিপি পরিচ্ছন্ন এবং আকৃতিতে ভালো। এগুলো নিজেরাই নিজেদের পরিশীলিত মাত্রার পরিচয় বহন করে। এগুলো দেখতে পাওয়া আনন্দের এবং পাঠ করা পরম সুখের বিষয়। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাংলায় মুদ্রা-মুদ্রণ আর কখনোই এতটা উৎকর্ষ অর্জন করেনি।[২৭০]

প্রশাসন

বাংলা বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি তার বিজিত রাজ্যকে তিনটি ইকতায় বিভক্ত করেছিলেন : লখনৌতি, গঙ্গাতীর ও বরসৌল। ইকতার প্রশাসক মুকতা নামে অভিহিত হতেন। গৌড়-লখনৌতি প্রধান শাসনকেন্দ্র হলেও বখতিয়ার খলজি দেবকোটেই অবস্থান করতেন। দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলাকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনাধীন করেন এবং নিজ পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে 'মালিক-উশ-শরক' উপাধি দিয়ে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তী অনেক শাসক দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে সুলতান উপাধি ধারণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দিল্লিতে খলজি বংশের শাসনের সময় বাংলাতে স্বাধীন বলবনি রাজবংশের শাসন চলছিল। দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বাংলা অধিকার করে অধিকৃত অঞ্চলকে তিনটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করেন। তুঘলক শাসনের পতনের যুগে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও প্রদেশ তিনটি স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লখনৌতির প্রশাসক আলাউদ্দিন আলি শাহ আল সুলতান আল আজম উপাধি ধারণ করেন।

---

[২৬৯]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫

[২৭০]নলিনী কান্ত ভট্টশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও বংশলক্রম*, অনু. মো. রেজাউল করিম (ঢাকা : জার্নিম্যান, ২০১৭), পৃ. ২৬

https://nagorikpathagar.org

সাতগাঁও-এর প্রশাসক হাজি ইলিয়াস শাহ সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও লখনৌতি রাজ্যদ্বয়ের শাসনকর্তাদের উৎখাত করে অখণ্ড, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীন সুলতানি আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যমণি ছিলেন সুলতান। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসেবে পরিগণিত সুলতান ছিলেন সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। শাসনক্ষমতায় তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ছিল অমাত্য পরিষদ। অমাত্য পরিষদের মধ্য থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়া হতো। সুলতান, তার অমাত্য পরিষদ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত হতো রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন সংগঠন। সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, যুদ্ধে সেনাপতিত্ব—এ সকল কাজ সুলতান নিজেই করতেন। রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারকও ছিলেন তিনি নিজে। তবে 'কাজি-উল-কুজ্জাত' ছিলেন প্রধান বিচারক। সুলতানের দরবারই ছিল সর্বোচ্চ বিচারালয়। তিনি কাজি, মুফতি, মৌলভি, আখুন্দ, আলিম ইত্যাদি ইসলামি শাস্ত্রবিদদের নিয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। প্রশাসনের দৈনন্দিন কার্যাবলি, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক প্রশাসক নিয়োগ সুলতানের নির্দেশক্রমেই হতো। রাজস্ব নির্ধারণ ও কর আদায় সুলতানের নির্দেশক্রমেই হতো। সুলতানের অনুমতি ছাড়া নতুন কর আদায় কিংবা রাজস্ব বৃদ্ধি করা যেত না। প্রজারঞ্জকমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করা ছাড়াও সুলতান সাহিত্য ও শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

অমাত্যবর্গের মধ্যে উজির পদাধিকারীরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। উজিরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি উজির এ আলা নামে পরিচিত ছিলেন। মজলিস-উস-মাজালিস, মজলিস-ই-আলা, মজলিস আল আজম, মজলিস-উস-শরক, খান-ই-খানান, খান-খাকান, খান-উল-আজম, খান মুয়াজ্জাম, খান আজম প্রভৃতি উপাধিধারী অমাত্যবর্গ কর্তৃক সুলতান পরিবেষ্টিত থাকতেন। এই খান উপাধিধারী অমাত্যবর্গের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও থাকতেন। মূলত সুলতানি আমলের এই প্রশাসন ছিল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সমন্বয়। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সুলতানই তাদের অমাত্যবর্গের হাতে নিহত হয়েছিলেন। অমাত্যবর্গের উচ্চাভিলাষ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিত।

বাংলার সুলতানেরা রাজ্যের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী রাখতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক রাজধানী ও শাসনকেন্দ্রে তারা দুর্গ ও সেনানিবাস নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ কেল্লাদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সুলতান নিজেই ছিলেন লস্কর বা সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তবে তিনি যুদ্ধাভিযানে নিজে যেতে না পারলে সেনাপতিদের মধ্যে একজনকে প্রধান

https://nagorikpathagar.org

সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। সেনাবাহিনী প্রধানত অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী ও পদাতিক বাহিনী—এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। পদাতিক বাহিনী পাইক নামেও পরিচিত ছিল। পদাতিক বাহিনীর মধ্যে তিরন্দাজ, বর্মধারী ইত্যাদি ভাগ ছিল। তা ছাড়া নৌবাহিনীও ছিল। রাজ্যের শাসন পরিচালনায় সেনাধ্যক্ষরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন।[২৭১]

কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎস ছিল গনিমত, খারাজ, ভূমিরাজস্ব, জাকাত, সয়ার (বাণিজ্য শুল্ক, ফেরি শুল্ক, লবণ শুল্ক, হস্তী শুল্ক, পিচকারি শুল্ক) ইত্যাদি। স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে ভূমি মুকতা বা ইজারা দেওয়ার প্রচলন ছিল। সাধারণত রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব হিন্দুদের ওপর ন্যস্ত ছিল। হোসেন শাহি শাসনামলের ভূস্বামীরা 'আরবাব' নামেও পরিচিত ছিলেন। রাজস্ব আদায়যোগ্য ভূখণ্ড তকসিম নামেও পরিচিত ছিল। আফগান শাসনামলে ভূস্বামীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সুলতানি আমলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হতো। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এগুলোকে বলা হতো ইকতা। পরবর্তীকালে প্রদেশসমূহ ইকলিম নামে পরিচিত হয়। হোসেন শাহি আমলে এগুলো মুলুক, চাকলা ইত্যাদি নামেও অভিহিত হতো। আফগান শাসনামলে এগুলোকে বলা হতো সরকার আর মোগল আমলে সুবা। সুলতানি আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা মালিক নামে পরিচিত ছিল। নিযুক্তির সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উচ্চ পদবিতে ভূষিত করা হতো এবং তাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হতো। তাদের যথেষ্ট পরিমাণে কর্তৃত্বও প্রদান করা হতো।[২৭২] মোগল আমলে সুবার প্রধান রাজকর্মচারীরা ছিলেন সুবেদার। তাদের ক্ষমতা সুলতানি আমলের মালিকদের চেয়ে সীমিত ছিল। সম্রাট উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে সুবেদার নিয়োগ করতেন। তিনি প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকতেন। তিনি উজিরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেন। রাজস্ব প্রতিষ্ঠান, সামরিক প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং বিচার বিভাগের ওপর সুবেদারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সুবেদারের অনুপস্থিতিতে নায়েব বা ডেপুটি সুবেদার কর্তব্যকর্ম চালিয়ে যেতেন।

সুলতানি আমলে বাংলার বিস্তৃত জনপদে শাসনকার্য নির্বাহের জন্য বহু আঞ্চলিক সরকারি কার্যালয় গড়ে উঠেছিল এবং বিপুলসংখ্যক রাজকর্মচারী এই সমস্ত

---

[২৭১] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস* (চট্টগ্রাম : ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২), পৃ. ১-৪১

[২৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৭

https://nagorikpathagar.org

কার্যালয়ে সরকারি কাজ সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। প্রশাসনের অনেক গোপন তথ্য রাজকর্মচারীদের জানা থাকত। তাই সুলতান আস্থাভাজন কাউকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অধীনে বহুসংখ্যক নিম্নপদের কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। সুলতানের দরবারের সমস্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতেন হাজির। সরকারের হিসাবপত্রের নিরীক্ষক হিসেবে কাজ করতেন মুস্তৌফি নামক রাজকর্মচারী। মহলিয়ান নওবত আলি (The chief of the guard of the royal household) রাজকীয় প্রাসাদের তত্ত্বাবধান করতেন। শরাবদার ছিলেন পানীয় বাহক। দিওয়ান (রাজস্ব বিভাগের প্রধান), জমিদার, কারফার্মা, সরখেল, কায়স্থ (Clerk), আরিন্দা (সংবাদ সংগ্রাহক), মজকুর (রাজস্ব সংগ্রাহক), মজুমদার (রাজস্ব সংশ্লিষ্ট), সাহেব জমা (আফগান আমলের রাজস্ব সংগ্রাহক), কানুনগো, আমিল প্রভৃতি উপাধিধারী দায়িত্বশীলগণ ছিলেন রাজকর্মচারী। সুলতানের একান্ত সচিব দবির খাস নামে অভিহিত হতেন।[২৭৩]

মোগল আমলে সুবা বাঙালা কয়েকবার রাজনৈতিক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়েছিল। *আইন-ই-আকবরি*-র বিবরণ অনুসারে সুবা বাঙালা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। সুবেদার শাহসুজার শাসনামলে আরও ১৫টি সরকার যুক্ত হয়ে সুবা বাঙ্গালার সরকার ৩৪টিতে উন্নীত হয়। এর মহল বা পরগনার সংখ্যা ১৩৫০-এ উন্নীত হয়। এই ব্যবস্থা ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এরপর মুর্শিদকুলি খান সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। চাকলার প্রশাসক হিসেবে ফৌজদারের পদ বহাল থাকে। তা ছাড়া মোগল শাসনামলে সুবা বাঙ্গালার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি স্বশাসিত করদরাজ্যও ছিল। করদরাজ্যগুলোর রাজারা তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। রাজা তার সভাসদবর্গকে নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এসব রাজ্যসমূহের নিজস্ব দুর্গ ও সেনাবাহিনী ছিল।

সুবার অন্তর্ভুক্ত সরকারের প্রধান ছিলেন ফৌজদার। ফৌজদার ও দেওয়ান ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের সুবেদারই নিযুক্ত করতেন। সুবেদার তার অধস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারতেন। সুবার সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন সুবেদার নিজেই। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার আজিম-উশ-শানের কার্যকালের পরিসমাপ্তি এবং মুর্শিদকুলি খানের শাসনভার গ্রহণ বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলে বিবেচিত হয়। তার শাসনামলে সুবেদারের স্থলে নায়েব নাজিম পদবির প্রচলন হয়। এভাবে সূত্রপাত হয় নবাবি শাসনের। নবাবের উত্তরাধিকারী বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে বাংলার শাসন পরিচালনায় কেন্দ্রীয়

[২৭৩] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১

https://nagorikpathagar.org

সরকারের আধিপত্যের অবসান ঘটে। সুবেদার বা নবাবকে সহযোগিতার জন্য ছিল অমাত্য পরিষদ। অমাত্য পরিষদের সদস্যরা আমির নামে পরিচিত হতেন। আমিরদের প্রধান আমির-উল-উমারা নামে পরিচিত হতেন। নেতৃস্থানীয় হিন্দু অমাত্যরা রায় রায়ান উপাধি লাভ করেছিলেন।

সুবা বাঙ্গালা অন্ততপক্ষে চারটি বিভাগে বিভক্ত হয়েছিল। প্রতিটি বিভাগে নায়েব-সুবেদার নিয়োগ হয়েছিল। সুবেদারি আমলে সরকারপ্রধান এবং নবাবি আমলে চাকলাপ্রধান ফৌজদার নামে পরিচিত ছিলেন। সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত এই ফৌজদার যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মোগল শাসনের পতনের যুগে ফৌজদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। নবাবি আমলে দেওয়ানও প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিভাগসমূহ যথা : থানা, মহকুমা, শিক, পরগনা ইত্যাদির দায়িত্ব প্রধানত দারোগা, হাকিম, শিকার, কাজি, আমিন প্রমুখ পদস্থ কর্মচারীরা পালন করতেন।

মোগল শাসনব্যবস্থা এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, প্রশাসনিক কার্যাবলিকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ বা দফতরে বিভক্ত করা হয়েছিল। সুবার বিচার বিভাগের প্রধান বা মির-ই-আদল কাজির পদ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মোগল প্রশাসনে কমপক্ষে দশ প্রকারের আদালত ছিল। কিসাস, হদুদ, তাআজির (ভর্ৎসনা), সিয়াসুতসহ বেশ কয়েক প্রকারের দণ্ডবিধি কায়েম ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উকিল বা মুকতারের সাহায্য নিতে পারত। সুবেদার থেকে গ্রামের শান্তিরক্ষক দিহিদার ও চৌকিদার পর্যন্ত বহু পর্যায়ের রাজকর্মচারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় হাতে ন্যস্ত থাকলেও সুবেদার নিজে হতেন এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। নবাবি আমলে স্বয়ং নবাব প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এ সময় বাংলার সামরিক শাখা ছুল ও নৌবাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। ছুলবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনীতে বিভক্ত ছিল। পদমর্যাদা অনুসারে সৈন্যরা সিপাহি, লস্কর, সেবান্দি, পাইবা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। নৌবাহিনীর প্রধান মির বহর হিসেবে আখ্যায়িত হতেন। তা ছাড়া সদর-ই-সুদুর (প্রাণ বিভাগ), বখশি (বেতন প্রদান), দারোগা, মুকাদ্দাম (পল্লি ভূমিরাজস্ব কর্মকর্তা), মুতাসদ্দি (ভূমি বণ্টন), মুস্তৌফি (সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ), পেশকার (প্রয়োজনীয় দলিলপত্র উত্থাপনকারী), গোমশতা (সরকারি কাজে নিযুক্ত), সাজাওয়াল (রাজসংগ্রাহক), কসিদ (চিঠিপত্র বাহক), হরকরা (সাধারণ ডাকপিয়ন) প্রমুখ কর্মচারীবৃন্দ মোগল প্রশাসনে নিযুক্ত ছিলেন।[২৭৪]

---

[২৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১১৭

https://nagorikpathagar.org

বাংলার গ্রামীণ প্রশাসন সুদূর অতীত কাল থেকে মোগল আমলের অবসান পর্যন্ত প্রায় একই ধারায় প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগেও গ্রাম বা মৌজা ছিল ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক বিভাগ। গ্রামীণ প্রশাসনে সাধারণত কেন্দ্রীয় প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামপ্রধান, মণ্ডল, ভদ্র, মুখ্য, বড়ুয়া, মাঝি, সর্দার ছিলেন গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপাধি। গ্রামীণ প্রশাসনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এদের নিয়েই গঠিত হতো। গ্রামীণ প্রশাসনে পঞ্চায়েত সভা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। মোগল শাসনামলে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর ছিল।

https://nagorikpathagar.org

পোড়ামাটির শিল্প

অলংকরণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ব্যবহার ছিল বাংলা অঞ্চলের সনাতন রীতি। মুসলমানগণ পোড়ামাটির এই শিল্পকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেন। ত্রিবেনির জাফর খানের মসজিদ (১২৯৮ খ্রি.) এবং ছোটো পাণ্ডুয়ার বারি মসজিদের (১৩০০ খ্রি.) পোড়ামাটির অলংকরণগুলো এখনও টিকে আছে। এগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরগুলো থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এসব পোড়ামাটির ফলকে বিমূর্ত বিষয়কেন্দ্রিক নকশা প্রাধান্য পেয়েছিল, যা ছিল মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য দ্বারা প্রভাবিত। ধীরে ধীরে পোড়ামাটির নকশা মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তাদের নির্দেশনায় পরবর্তী সময়ে বাংলার পোড়ামাটির শিল্পীরা এ শিল্পকে এক বিস্ময়কর উৎকর্ষে উন্নত করেছিল। স্থাপত্য বিন্যাসের বিভিন্ন অংশে তারা এর প্রয়োগ ঘটায়।[২৭৫] আদিনা মসজিদে (১৩৭৫ খ্রি.) একই সঙ্গে পোড়ামাটির অলংকরণ ও খোদাইকৃত পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। পুঁতির মালা, চতুর্পত্রী ফুল, লতাপাতা, লতানো তরু, গোলাপ, উদ্ভিজ্জ মোটি ও কর্ণপতরু প্রভৃতি বিমূর্ত বিষয়বস্তু নকশার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জালালুদ্দিন মুহাম্মাদের সমাধির ওপর নির্মিত সৌধে চেইন, লকেট, পদ্ম, হিন্দু ধর্মের প্রতীক, নেকলেস, ঝুলন্ত গুচ্ছসজ্জা, স্থানীয় বৃক্ষরাজি, গুল্ম, জালিকর্ম ও জ্যামিতিক নকশা ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে পোড়ামাটি ও টাইলসের সমন্বিত একটি নতুন অলংকরণ কৌশল ব্যবহৃত হয়, যা পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সমকালীন স্থাপত্যে পরিলক্ষিত হয়। আর্দ্র পরিবেশ টাইলসের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় নির্মাতারা পোড়ামাটির অলংকরণের ওপরই অধিক নির্ভরশীল ছিল। দেওয়াল, স্তম্ভ, মিহরাব ও বহুপত্রী খিলানে লকেট, জ্যামিতিক নকশা, তরুলতার ফালি, ছাঁচ নির্মাণ, ঝুলন্ত ফল ইত্যাদির নকশা স্থান পেয়েছে। হুসেন শাহি (১৪৯৩-১৫৩৮) আমলে কিছু পাথুরে মনুমেন্ট নির্মিত হলেও বেশির ভাগই ছিল ইটনির্মিত এবং অভূতপূর্ব পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। এমনকি ইট ও

---

[২৭৫] *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

https://nagorikpathagar.org

পাথরের তৈরি স্থাপত্যের ধনুকাকৃতি খিলান ও গম্বুজও পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। কানিংহাম ও মার্শালের মতে, তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০ খ্রি.) এ পর্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাঘা মসজিদের (১৫২৩) ভেতর ও বাইর দেওয়াল সম্পূর্ণভাবে পোড়ামাটির নকশা ফলক দ্বারা অলংকৃত। এই মসজিদের অলংকৃত তিনটি মিহরাব সে যুগের পোড়ামাটির শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। আয়তাকৃতির কুলুঙ্গিগুলো পোড়ামাটির বৃক্ষ দ্বারা পূর্ণ। কোথাও এক ঝোকা আম ঝুলছে—এ ধরনের দৃশ্যায়ন শিল্পী কারিগরদের পরিপক্বতা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করে। কোনার বুরুজগুলোও লতাপাতা, গোলাপ, গাছের ডাল, হীরক প্রভৃতি নকশা দ্বারা অলংকৃত। মিহরাবের উভয় পাশে লতানো গোলাপ, বৃক্ষ, মোচড়ানো পাতা এবং জালিকর্মের অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে।

কারুশিল্প : ধাতব নিদর্শন

অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে—বঙ্গের তৈরি তলোয়ার একদিকে যেমন ছিল ধারালো, অন্যদিকে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও ছিল এর বিশেষ গুণ। সেজন্য বঙ্গের তৈরি তলোয়ার বাইরেও রফতানি করা হতো। বাংলার আরেকটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হলো কুঠার। মোগল আমলের বেশ কিছু কুঠার জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, মোগল সম্রাট বাবর ভারতে ১৫২৬ (খ্রি.) প্রথম কামানের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেও উপমহাদেশে, এমনকি বাংলা অঞ্চলে কামান ব্যবহৃত হয়েছিল। ষোলো শতকের প্রথম দিকে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সৈন্যরা ধনমানিক্যের বিরুদ্ধে কামান ব্যবহার করেছিলেন। শেরশাহের সময়ে গৌড়ে এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ঢাকায় কামান প্রস্তুত হতো। বাংলার বারোভুঁইয়াদের প্রায় সকলেই স্থানীয় কারিগর দ্বারা প্রস্তুতকৃত কামান ব্যবহার করতেন। স্থানীয় কামান নির্মাতাদের মধ্যে জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জন্যুঞ্জয় কর্মকারের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বাংলায় লোহার তৈরি যেসব বৃহৎ আকারের কামান দেখা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুর্শিদাবাদের 'বাচ্চাওয়ালি' বা 'বাচোয়ালি', 'জাহানকোষা' এবং ঢাকার 'বিবি মরিয়ম কামান' প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদের 'জাহানকোষা' কামানটি ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জনার্দন কর্মকার কর্তৃক অষ্টধাতুতে নির্মিত। পেটানো লোহায় জনার্দন কর্মকারের তৈরি কামানটির দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি এবং ওজন ৬৪,৮১৪ পাউন্ড। *আইন-ই-আকবরি* অনুসারে তিন ধরনের গাদা বন্দুক তৈরি হতো এখানে।[২৭৬]

---

[২৭৬] *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯-৪৫০

https://nagorikpathagar.org

চিত্রকলা

বাংলার মুসলমান শাসনের প্রারম্ভিককালে চিত্রকলা দরবারি পৃষ্ঠপোষকতা তেমন না পেলেও গ্রামীণ পর্যায়ে সম্ভবত শিল্পটির ধারা রক্ষিত হয়েছিল। এ সময়ের চিত্রের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া না গেলেও স্থাপত্য অলংকরণে চিত্রশিল্পীর রূপ-ভাবনার পরিচয় মেলে। পোড়ামাটির ফলক ও গ্রেজ টালিতে আরবীয় বিমূর্ত জ্যামিতিক নকশা এবং ভারতীয় লতাপাতা নকশার সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

সুলতান সিকান্দার শাহের সময়ে (১৫১৯-১৫৩২) 'ইস্কান্দার নামা'য় অঙ্কিত চিত্রকলায় পারস্য প্রভাব প্রবল হলেও এতে স্থানীয় ঐতিহ্যগত চিত্র আঙ্গিকের ছায়া দৃশ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম চিত্রকলা নির্মিত হয়েছিল নিকটবর্তী হেলেনিস্টিক, খ্রিষ্টান ও সাসানীয় চিত্রকলার সংমিশ্রণে। মুসলিম চিত্রাবলিতে চৈনিক, তুর্কি ও পারসিক—এই তিন ধারার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। 'সিকান্দার নামায়' গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বাংলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলে বাংলার দরবারি ধারার শিল্পে পারস্য প্রভাব বজায় ছিল।

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর এখানে একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকের চিত্রকলার বিকাশ সাধিত হয়। এটি 'মুর্শিদাবাদ চিত্ররীতি' নামেও পরিচিত। বাংলার নবাব আলিবর্দি খানের শাসনামলে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) কেন্দ্রীয় মোগলশৈলীর বেশ কয়েকজন শিল্পী মুর্শিদাবাদ রাজ দরবারে আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময়ে মুর্শিদাবাদের স্বনামখ্যাত শিল্পী দ্বীপচাঁদ নবাব আলিবর্দি খানের শিকার দৃশ্য অঙ্কন করেছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে রাজস্থান থেকে আগত একদল শিল্পী মুর্শিদাবাদে স্থায়ী নিবাস তৈরি করেন। এদের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের চিত্রাবলিতে রাজপুত্র চিত্রশৈলীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাজপুত্র চিত্রকলার 'রাগমালা' বিষয়বস্তুকে মুর্শিদাবাদী চিত্রে উপস্থাপন মুসলিম চিত্ররীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং দরবারি চিত্ররীতিতে অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়।[২৭৭]

পাল চিত্রপরম্পরার মধ্যবর্তী পর্যায়ে বাংলায় মুসলমান সুলতানদের দরবারে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার অনুচিত্রের সূচনা ঘটে। এ চিত্রশৈলী সর্বাংশে পারস্য শিল্পকলার সাফাতি চিত্ররীতির প্রাথমিক পর্যায়ের পাণ্ডুলিপি চিত্রকলা দ্বারা অনুপ্রাণিত। ক্যালিওগ্রাফি ও জ্যামিতিক অলংকরণ ছিল এ চিত্রকলার দৃষ্টিনন্দন অলংকার। পারস্য প্রাচীনকাল থেকেই ছিল চিত্রকলাই সমৃদ্ধ। তুর্কিরা ইসলাম গ্রহণের পর আগমন ঘটে চৈনিক চিত্ররীতির। বাইজেন্টাইন চিত্ররীতির

---

[২৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩-৪৭৭

https://nagorikpathagar.org

ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। মূলত এই তিনটি শিল্পধারার মাধ্যমে মুসলিম পাণ্ডুলিপি চিত্রের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। পঞ্চদশ/ষোড়শ শতকে পারস্য শিল্প প্রভাবিত বাংলার সুলতানি চিত্রকলায় কিছু কিছু স্থানীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পাটাচিত্র ও পাটচিত্র

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বিষ্ণুপুর ও অন্যান্য স্থানে বাংলার চিত্রকলা এক অভূতপূর্ব সৃজনশীলতায় বিকাশ লাভ করে। এ ধারার অন্যতম নিদর্শন পুঁতির ঢাকনা বা প্রচ্ছক হিসেবে ব্যবহৃত কাঠের ফ্লকের ওপরে অঙ্কিত পাটাচিত্র। এ ছাড়া হাতে তৈরি কাগজে আঁকা জড়ানো পটের নিদর্শনও পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ১৬ শতক থেকে বাংলায় কাগজ তৈরি হচ্ছিল। তাতে গদের আঠা দিয়ে ভেষজ ও খনিজ রং মিশিয়ে চিত্র আঁকা হতো। এ ধরনের চিত্রে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণ ও রামের কাহিনি মুখ্য বিষয়বস্তু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভক্তিমূলক কাহিনিধর্মী এ চিত্রকলা সুডৌল রেখা দিয়ে অঙ্কিত। উজ্জ্বল রঙের ফিগারগুলো অধিকাংশ সময় প্রখর লাল বর্ণের পশ্চাৎপটে বিন্যস্ত হতো। এ পাটাচিত্রে পাল যুগের চিত্রকলার অবক্ষয়ী রূপ লক্ষ করা যায়। এ চিত্রে একই সাথে অনুচিত্রের অনুপুঙ্খ এবং দেওয়ালচিত্রের প্রসারতা দৃষ্টিগোচর হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পাটাচিত্রের অঙ্কনরীতিতে পশ্চিম-ভারতীয় রাজস্থায়ী চিত্রকলার প্রভাব দৃশ্যমান। পাটাচিত্র বাংলার চিত্রকলা ঐতিহ্যের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।[২৭৮]

গহনা শিল্প

প্রাচীনকালের প্রাপ্ত পোশাক ও গহনার নিদর্শন থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ দেশের নারী ও পুরুষ উভয়ই বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহার করতে পছন্দ করত। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন হয়েছিল—প্রথমে তুর্কি-আফগান অঞ্চল থেকে এবং পরে মধ্য এশিয়া থেকে পারস্যের জোরালো প্রভাব নিয়ে। তাদের আগমন ঘটেছিল এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে। তাদের পরিবার ও পরবর্তী সময়ে আগত বিপুল অভিবাসী নরনারী নানারূপ অলংকরণে সজ্জিত হয়ে এ দেশে এসেছিলেন। সেই অলংকারসামগ্রীর সঙ্গে দেশীয় রীতির সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল এক সমৃদ্ধ গহনা শিল্প।

স্থানীয় গহনা শিল্পীরাও নতুনত্ব প্রদর্শনে কার্পণ্য করেনি। নতুন নকশা ও পদ্ধতি দিয়ে তারা নতুন পৃষ্ঠপোষকদের তৃপ্ত করেছিল। নকশা ও মোটিভের ক্ষেত্রে বাংলার অলংকার শিল্পীরা তাদের কাজে পৃষ্ঠপোষকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের

---

[২৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

https://nagorikpathagar.org

প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। এ সময় মানুষের প্রতিকৃতি বাদ দিয়ে তারা উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের চিত্রণে মনোনিবেশ করে। গহনা ও মিনা কারিগরদের নিকট মাছ ও ময়ূরের মোটিভ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের অর্ধচন্দ্র ও তারার প্রতীক নকশাকারদের নকশার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে; বিশেষ করে কপালের অলংকার তৈরিতে। মোগল আমলের অলংকরণের ন্যায় গহনাতেও ফুল, লতা, পাতা, পতঙ্গ, পাখি মোটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই সাথে হিন্দুদের পবিত্র প্রতীক পদ্মার ব্যবহার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ঢাকার মসলিনের দক্ষ তাঁতিদের সাথে ঢাকার গহনা প্রস্তুতকারী শিল্পীরাও পূর্ব ভারতে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। এ যুগে চুলের মতো সূক্ষ্ম স্বর্ণ ও রৌপ্য তারের জটিল নকশায় তৈরি নতুন ধরনের গহনাগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এগুলো ফিলিগ্রি বা তারজালি নামে পরিচিত ছিল। জটিল জ্যামিতিক নকশা, ফুল, পতঙ্গ, পাখি, লতা ও পাতার মোটিভ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হতো জালিকাজ। বাংলার সুবেদার ও দিওয়ান মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট ১৭০১ সালে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে স্বর্ণের তারজালি, স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা কারুকার্য শোভিত গজদন্ত প্রেরণ করেছিল।

লিখন শিল্প

ইসলামি নকশাকলার একটি বড়ো উপাদান হলো লিপিকলা। মসজিদে ধর্মীয় ছবির অভাব পূরণ করেছে সুন্দর করে লেখা কুরআনের আয়াত। সুন্দর লিপিকলার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ইসলামের কথা মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার। প্রাক-ইসলামি আরবে স্মারকলিপি ও বক্রাকার লিপি (নাস্‌খ) প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ কুফা নগরী অধিকার করার পর (৬৩৮ খ্রি.) কুফি অর্থাৎ, কোনাকৃতি বর্ণমালায় সরকারিভাবে লেখার প্রচলন করেন। এই লিপিশৈলী শীঘ্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

হিজরি বর্ষের প্রথম পাঁচ শতাব্দী ধরে পবিত্র কুরআন কুফি লিপিশৈলীর বিভিন্ন প্রকার রীতিতে লিখিত হয়। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে কুফির স্থলে নাস্‌খ অর্থাৎ বক্রাকার লিপির প্রচলন শুরু হয়। নাস্‌খ লিপিশৈলীতে স্বরচিহ্ন, হরকত ও বিরামচিহ্ন সংযোজিত হয়ে লিপিশিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। পরবর্তী সময়ে হস্তলিপি শিল্পের সর্বাধুনিক ও সহজরীতি 'নাস্‌তালিক রীতি' প্রবর্তিত হয়। এই রীতিতে পূর্বেকার কৌণিক ও বক্রাকার রীতি বর্জন করে গোলাকার রীতিতে লিপিচর্চা করা হয়। আরবি লিপিমালার সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ কৌশল হচ্ছে 'তুঘরা'। এই হস্তলিখন শিল্প অন্য সভ্যতার প্রভাবমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে ইসলামি

https://nagorikpathagar.org

ঘরনার শিল্প। এই রীতি শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যের দিক থেকে যেকোনো সময়ের হস্তাক্ষরবিদদের শ্রেষ্ঠ লিখনশৈলীকেও ছাপিয়ে যাবে। সুলতানি ও মোগল আমলের শিলালিপিগুলো নাস্‌খ ও তুঘরা পদ্ধতিতে লিখিত হয়েছিল।

দিল্লির সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের অধীনস্থ বাংলার শাসনকর্তা জালাল উদ্দিন মাসউদ জানির (১২৪৭-৫০ খ্রি.) শাসনামলে প্রাপ্ত আরবি শিলালিপিটি নাস্‌খ রীতিতে লিখিত হয়েছে। আবার দিল্লির সুলতান রুকন উদ্দিন কায়কাউসের (১২৯১-১৩০১ খ্রি.) শাসনামলে বাংলার গভর্নর কতৃক রচিত শিলালিপি আরবি ও ফারসি শব্দে লিখিত হয়েছে। এটাতেও নাস্‌খ রীতির লিখন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সুলতান শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-৫৮ খ্রি.) শাসনামলের প্রাপ্ত শিলালিপিতে তুঘরা রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-২২ খ্রি.) এবং সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৪২-৫৮ খ্রি.) শিলালিপিতে নাখ্‌স-তুঘরার সংমিশ্রণ রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত সম্রাট নুর উদ্দিন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর পাদশা গাজির (১৬০৫-২৭ খ্রি.) রাজত্বকালের একটি আরবি ও ফারসি শিলালিপিতে নাস্‌তালিক পদ্ধতির লিখনরীতির দেখা মেলে। মোগল আমলের অন্যান্য শিলালিপিতে নাস্‌খ রীতি ও নাস্‌তালিক রীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তবে এ সময়ে নাস্‌তালিক রীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

A. English Sources

Aexander, Dow	:	*The History of Hindustan, Vol-111, New Delhi: 1985.*
Ahmad, Sufia	:	*Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dhaka: Oxford University Press Bangladesh, 1974.*
Ahmed, A.F. Salauddin	:	*Social Indeals and Social Change in Bengal (1818-1835), Leiden: Netherlands, 1965.*
Ahmed, Nafiz	:	*An Economic Geography of East Pakistan,* London: Oxford University press, 1968.
Akanda, S.N	:	*The District of Rajshahi, its Past and Present,* Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies 1983.
Allami, Abul Fadl	:	*Ain-i-Akbari,* Vol. 1, Tr. H. Blochmann, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1973, Vols. II & III, Tr. H.S. Jarret, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1891 & 1894 respectively.
Allen, B.C.	:	*Assam District Gazetters, Sylhet,* Vol. 11, Calcutta: Caledonian Steam Printing Works, 1905.
Amin, Shahid	:	*Sugarcane and Suagr in Gorakhpar : An Inquiry into peasant Production for Capitalist Enterprise in Colomial India, New Delhi: 1984.*
Ashraf, K.M.	:	*Life and Condition of the Peoples of Hindustan,* Delhi: Asiatic Society of Bengal, 1959.
Azizur Rahman Mallick	:	*British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856),* Dacca; A.K. Ahmad Ali AT Zeeco Press, 1961.
Bahadur, Rai Manohan Chakrabarti	:	*Summary of Channges in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916,* Calcutta, 1918.
Bakr, M. Abu	:	*Records of the Geological Survey of Bangladesh.* Vol.-1, part 2, Dhaka: Geological Survey of Bangladesh, 1977.
Bandyopadhyaya, N. C.	:	*Economic Life and Progress of Ancient Inida,* Vol. 1 Calcutta: Hare Press, 1925.
Bernier, Francois	:	*Travels in the Mughal Empire* (London : Oxford University Press, 1914), Vol. 1,
Bhattacharjee, D. and Khaled A.	:	*Marketing of Small Industries Products in East Pakistan,* Dacca University: Bureau of Economic Research, 1969.
Bolts, William	:	*Consideration on India Affairs,* London: 1772.
Bose, Sugata (Ed.)	:	*South Asia and World Capitalism,* Delhi: Oxford University Press, 1990.

https://nagorikpathagar.org

Bowrey, Thomas	:	*A Geographical Account of Countries Around the Bay of Bengal, 1669-1679.* Cambridge: The Hakluyt Society, 1903.
Bradley Birt, F.B.	:	*Dhaka: The Romance of an Eastern Capital.* London: Smith Elder, 1914.
Buchanon, D.H.	:	*The Development of Capitalist Enterprise in India.* New York: Macmillan and Co., 1934.
Chandra, Atul	:	*History of Bengal, Mughal Period,* Calcutta: 1964.
Chandra, Baghchi Probodh	:	*"Chinese Account" Visva Bharati Annals,* Vol. 1, 1945.
Chicherov, A.I	:	*India Economic Development in the 16th-18th Centuries,* Moscow, 1971.
Dani, Ahmed Hasan	:	*Dhaka: A Record of Its Changing Fortunes.* Dhaka Museum, 1956.
Datta, G.C.	:	*Ivery Carving in Bengal. Calcutt: Bengal* Secretariat Press, 1901.
Dighby, William	:	*Prosperous British India*, New Delhi: 1969.
Dowell (ed), H.H	:	*The Cambridge History of India*, Vols. V and V1, British India, 1947-1858.
Dutt, Ramesh	:	*Economic History of India in the Victorian Age,* London, 1908.
Dutta, R C.	:	*Economic History of India,* London, 7th ed. 1950.
Farouk, A.	:	*Marketing of Rice East in Pakistan, Un-published Doctoral Dessertation*, Dhaka University, 1954.
Francois Bervier	:	*Travels in the Mughal Empire, Vol-1,* Delhi: 1968.
Ghosal, H.R.	:	*Economic Transition in the Bengal Presidency, 1790-1833* Patua: 1950.
Gopal, R.	:	*How The British Occupied in Bengal*, Asia Publishing House, London, 1963.
Goswami, O.	:	*Industry, Trade and Peasant Society: The Jute Economy of Eastern India, 1900-1947*, London: Oxford University Press, 1991.
Gulia, Ranajit	:	*A Rule of Property for Bengal*, Paris: Mouton and Co, 1963.
Gupta, B.K.	:	*Sirajuddawllah and the East India Company*, London, 1962.
Hoque, M. Inamul	:	*Bengal Towards the close of Aurangzib's Reign,* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1994.
Hunter W.W.	:	*A statistical Account of Bengal*, Vol. IX, District of Pabna and Murshidabad, London: Trubner & Co. 1876.
————	:	*A Statistical Account of Bengal Vol-VII*, Maldah: 1876.
Husain, A.F.A.	:	*Employment of Middle Class Muslim Women in Dhaka,* Dhaka: Dhaka Univeristy, 1958.

https://nagorikpathagar.org

Islam, Mustafa Nurul	:	*Bengali Muslim Public opinion as Reflected in the Bengali Press (1901-1930),* Dacca: Bangla Academy, 1973.
Karim, A .	:	*Social History of the Muslims in Bengal,* Vol-I (1201-1576), Vol.11, (1576-1757), Karachi, Pakistan Publishing House and Pakistan Historical Society, 1967.
Karim, Abdul	:	*Dacca, the Mughal Capital*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964.
————	:	*"An Account of the District of Dacca, Dated 1800", Journal of The Asiatic Society of Pakistan, Vol-2.*
Karim, Khondkar Mahabubul	:	*The Provinees of Bihar and Bengal Under Shahjahan,* Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1974.
Mahdi, Husain (Tr)	:	*The Rehla of Ibn Battuta,* Baroda, 1953.
Mahmood, A. B. M.	:	*The Revenue Administration of North Bengal,* Dhaka, 1970.
Majumdar, R .C .	:	*An Advanced History of India,* London, 1961.
Mallick, A. R.	:	*British policy and the Muslims of Bengal (1757-1856),* Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1961.
Mareland W. H.	:	*India at the Death of Akbar: An Economic Study,* London: Macmillan, 1920.
Mazumdar, R.C.	:	*History of Bengal, Vol. 1*, Dhaka: Dhaka University Press, 1943.
Mishra, K.P.	:	*Benares in Transition 1738-1795*, New Delhi: 1975.
Mitra, D.B.	:	*The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833*, Calcutta: 1978.
Molla, M. K. U.	:	*The new Provirce of Eastern Bengal and Assam (1505-1511)*, The Institute of Bangladesh Studies, 1981.
Mookerji, R.	:	*India Shipping: A history of the sea-borne Trabe and Maritime Activity of Indians from the Earliest Times*, London: 1912.
Orme, Robert	:	*Historical Fragments of The Mogul Empire*, London: 1805.
Rubbee, Fuzli	:	*The origin of the Mussalmans of Bengal*, Calcutta, 1895.
Rahim, Muhammad Abdur,	:	*Social and Cultural History of Bengal*, vol. 1 Karachi: Pakistan Historical Soceity
Salim, Ghulam Hussain	:	*Riyazu-s-Salatin, Trans: Abdus Salam*, Delhi: Inarah-I Adabiyat-I, 1975.
Sarkar, J.N.	:	*History of Bengal, Vol-II*, Dhaka: Dhaka University Press, 1966.
Sen, Shila	:	*Muslim Politics in Bengal 1937-1947,* New Delhi: Impex India, 1976.
Sinha, D. P.	:	*The Education policy of the East India Company in Bengal,* Punthi Pustak, Calcutta.1969

https://nagorikpathagar.org

Sinha, J.C.	:	*Economic Annds of Bengal*, London : Macmillan, 1927.
Sinha, N. K.	:	*Economic History of Bengal From Plassey to the Permanent Settlement*, Vol. 1, Colcutta, 1961.
_____	:	*The History of Bengal 1757-1947*, University of Calcutta, Calcutta, 1967.
_____	:	*The Economic History of Bengal*, Vols. 2, Calcutta: Pharma K. L. Mukhopadhyaya, 1961.
_____	:	*Economic History of Bengal*, Vol. I, Calcutta: Gosain & Co., 1959.
_____	:	*Economic History of Bengal*, Calcutta: Pharma K.L. Mukharji, 1961.
Siraj, Minhaj al-din	:	*Tabaqat-i-Nasiri*, Vol.1Text ed. Abdul Hai Habibi, Kabul: Historical Society of Afghanistan, Second edition, 1963; Eng. Major Raverty, Vol. I Gilbert and Rivington, London. 1881: New Delhi, Reprint, 1990.
Sirajul Islam (ed)	:	*History of Bangladesh*, Vols-2, Asiatic society of Bangladesh, Dhaka, 1995.
Swan, I.A.L., ICS.	:	*Report on the Industrial Development of Bengal*, Calcutta: 1916.
Tarafdar, M.R.	:	*Hussain Shahi Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1965.
Warner	:	*The Silk Industry of The United Kingdom: Its Origin and Development*, London: 1971.
Yaqub Ali, A. K. M.	:	*Aspects of society and Culture of the Varenda* (1200-1576A.D), Rajshahi, 1898.

B. Bengali Sources

আন্তোনভা, কোকা	:	*ভারতবর্ষের ইতিহাস*, মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৬।
আলীম,এ. কে. এম আবদুল	:	*ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯
আনসারী, মুসা	:	*ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
আলম, ওহীদুল	:	*চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম : ১৯৮৯।
আসাদুল্লাহ, ড. আবু নেমান মো.	:	*রাজশাহীর প্রথম ইসলাম প্রচারক তুরকান শাহ শহীদ*, রাজশাহী : হেরিটেজ রাজশাহী, ২০১৯
আলী, ড. এম. ওয়াজেদ	:	*বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।
আহ্‌মেদ, তোফায়েল	:	*যুগে যুগে বাংলাদেশ*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২।
আহ্‌মেদ, মওদুদ	:	*বাংলাদেশ : স্বায়ত্ব শাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : ২০০৩।
আহ্‌মেদ, মওদুদ	:	*মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়*, ঢাকা : তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।
আহ্‌মেদ, রাজিব	:	*বাংলায় নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহের ইতিহাস*, ঢাকা : গতিধারা, ২০০৮।
আহ্‌মেদ, শরীফ উদ্দীন	:	*ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, ঢাকা : একাডেমিক প্রেস এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০১।
আহমেদ, তোফায়েল	:	*আমাদের প্রাচীন শিল্প*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৪।

https://nagorikpathagar.org

আহমেদ, ওয়াকিল : *মুসলিম বাংলায় বিদেশি পর্যটক*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদনা) : *মুক্তির সংগ্রাম*, ঢাকা : চন্দ্রাবতী একাডেমী, ২০১২।

আলী, ডক্টর মুহাম্মাদ মোহর : *মুঘল আমলে বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (১৬১৪-১৭৫৭), অনু. মুহাম্মাদ সিরাজ মান্নান , ঢাকা : মেধা বিকাশ, ২০১৭

আহমদ, ওয়াকিল : *বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ; প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ হান্নান, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৯

আর্নল্ড, টি. ডব্লিউ. : *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*, অনু. মো: সিরাজ মান্নান ও অন্যান্য, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২

আহ্‌মদ, তোফায়েল : *আমাদের প্রাচীন শিল্প* , ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৪

ইমাম, আলী : *বাংলা নামে দেশ*, ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯৭।

ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুল : *১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

কবির, মফিজুল্লাহ : *নীল বিদ্রোহের ইতিহাস*, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ, ১৯৭৮।

কবিরাজ, নরহরি : *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা*, ঢাকা : বানী প্রকাশ।

করিম, আব্দুল : *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

করিম, আবদুল : *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০০৬।

করিম, ড. আব্দুল : *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ, বাংলা একাডেমী*, ঢাকা : ১৯৭৮।

করিম, ড. আব্দুল : *ঢাকাই মসলিন, ঢাকা নগর জাদুঘর*, ঢাকা : ১৯৬৫।

কলিম, ড. আবদুল : *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ, অনুবাদ : মোকাদ্দেসুর রহমান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

কানুনগো, সুনীতি ভূষণ : *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, চট্টগ্রাম : ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২

খান, মিসবাহ্ উদ্দিন : *চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস (১৮৮৮-১৯০০)*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫

খলীকুজ্জামান, কাজী : *বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ : পথের সন্ধানে*, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ,১৯৮৩।

খান, আকবর আলী : *বাবংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯

খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪।

খান, মুহাম্মদ আলী আজগর : *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

খান, আকবর আলী : *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪

খান, আকবর আলী : *সমাজ রাষ্ট্র বিবর্তন, জ্ঞান তাপস আব্দুর রাজ্জাক গুণিজন বক্তৃতামালা (২০১৭-২০১৮)*, সম্পাদনা : আহরার আহমদ (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ০৯)

গেড্ডস্, প্যাট্রিক : *ঢাকা : নগর উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রতিবেদন*, অনুবাদ : আব্দুল মোহাইমেন, ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০।

খান, মিসবাহউদ্দিন : *চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস (১৮৮৮-১৯০০)*, ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ১৯৯৫।

ইসলাম, সিরাজুল : *বাংলার ইতিহাস : উপনিবেশিক শাসনকাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

ইসলাম, সিরাজুল : *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা।* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮।

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদক) : *বংলাদেশের ইতহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা) : *বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

ঘোষ, সুনীতি কুমার : *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭।

ঘোষ, বিনয় : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ২০০৯।

ঘোষ, বিনয় : *বাদশাহী আমল*, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ভাদ্র ১৩৮৮।

চৌধুরী, মোহাম্মদ সেকান্দার : *বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৩।

চৌধুরী, আব্দুল হক : *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

চৌধুরী, শ্রী কালীনাথ : *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : গতিধারা, ২০০৭।

চৌধুরী, শামসুদ্দোহ্ : *সোনার গাঁয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : আবির বুকস্, ২০১০।

চৌধুরী, হায়দার আলী : *পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

চৌধুরী, ড. সুশীল : *পলাশীর অজনা কাহিনী*, ঢাকা : স্বরলিপি প্রকাশন, ২০১৮।

চৌধুরী, ড. কিরণচন্দ্র : *ভারতের ইতিহাস কথা*, কলকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড, ২০০১।

চৌধুরী, ড. কিরণচন্দ্র : *ভারতের ইতিহাস কথা*, কলকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড, ২০০১।

চৌধুরী, ড. কিরণচন্দ্র : *অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৬।*

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম : *১৮৫৭ এবং তারপর*, ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০০৮।

টেলর, জেমস্ (অনূদিত) : *কোম্পানি আমলে ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।*

মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার : *সিরাজদ্দৌলা*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৩।

উমর, বদরুদ্দীন : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

জলীল, এ. এফ. এম. আবদুল : *পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ*, ঢাকা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭৪।

জাহাঙ্গীর, মহিউদ্দিন : *মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ন* ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০১৭।

জলিল, আলমগীর : *বাঙলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি*, ঢাকা : ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৫।

জলিল, মুহাম্মদ আবদুল : *রাজশাহী অঞ্চলের মৃৎশিল্প শাখের হাঁড়ি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সম্পা.) : *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৯।

চট্টোপাধ্যায়, তপরন মোহন : *পলাশীর যুদ্ধ*, কলিকাতা : ১৯৫৬।

তরফদার, মমতাজুর রহমান : *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।

তায়েশ, মুনশী রহমান আলী : *তাওয়ারিখে ঢাকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫।

তালুকদার, খগেশকিরণ : *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

তালিব, আব্দুল মান্নান : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০।

তালিব, মুহাম্মদ আবূ : *কিংবদন্তীর যশোর*, ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বৈশাখ ১৩৯৫।

তুঘলক, সুলতান ফীরুজশাহ : *ফুতূহাত-ই-ফীরুজশাহী*, অ নুঃ আবদুল করিম, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

দুলার, প্রদীপ চাঁদ : *বাংলার জৈন ব্যবসায়ী: ১৫৫৬-১৭৫৭*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৫-২৬, ২০০২।

https://nagorikpathagar.org

নুরুন নাহার, আব্দুল হালিম ও : *মানুষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১

ফ্রাংকলিন, ফে (সম্পা.) : *ইতিহাসের খেরোখাতা*, অনুবাদ : দিলীপ দেবনাথ, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৬।

ফারুক, আব্দুল্লাহ : *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩।

ফারুক, আব্দুল্লাহ্ : *বাংলাদেশের পণ্য বিপনন ব্যবস্থা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

ব্যানার্জী, রাখার দাস : *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা : নব্য ভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

বার্ট, এফ.বি. ব্রাডলী : *প্রাচ্যের রহস্য-নগরী*, অনুবাদঃ রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৫।

ভট্টশালী,নলিনী কান্ত : *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও বংশক্রম*, অনু. মো. রেজাউল করিম (ঢাকা : জার্নিম্যান, ২০১৭

মওদূদ, আবদুল : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৬৯।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য়, ৩য় এবং চতুর্থ খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১৯৭৫।

মজুমদার, শ্রী রমেশ চন্দ্র : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫-১৯৮৭), কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫।

মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ : *ঢাকার ইতিহাস*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

ইসলাম,মুহাম্মাদ জোহরুল : *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮

মালদহী,এম. আবিদ আলী খান : *ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি কথা*, অনু. অধ্যাপক কাজী মোঃ শহীদুল হক ও অন্যান্য, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭

মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ : *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ ঢাকার ইতিহাস* (দু-খণ্ড একত্রে), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

মিছের, কাজী মোহাম্মদ : *বগুড়ার ইতিকাহিনী* ,বগুড়া : কাজী প্রকাশনী, ১৯৫৭

ওয়াকিল আহমেদ, : *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক* , ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮

মান্নান, মোহাম্মদ সিরাজ : *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

মাইতি, অধ্যাপক প্রভাতাংশু : *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, কলিকাতা: শ্রীধর প্রকাশনী, ২০০০।

মামুন, মুনতাসীর : *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

মামুন, মুনতাসীর : *ইতিহাসের খেরোখাতা*, ঢাকা : অন্যান্য, ২০০৪।

মামুন, মুনতাসীর : *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬।

মাসুম, মোঃ আব্দুল্লাহ আল : বাংলায় মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

মাহ্মুদ, আব্দুল গণি : *লোপাট: পাটশিল্প*, ঢাকা : মাহ্মুদ প্রকাশনী, ১৯৯০।

মুখোপাধ্যায়, সুখময় : *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, কলকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৬৬।

রহমান, মোঃ মাহ্বুবুর (সম্পা.) : *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২।

রহমান, আসহাবুর : *বাঙলাদেশের কৃষি কাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬।

রহমান, প্রফেসর ড. মোঃ মাহ্বুবুর : *স্থানীয় ইতিহাস*, রাজশাহী : হেরিটেজ ট্রাস্ট প্রকাশন, সংখ্যা-১১, মার্চ ২০১৪।

https://nagorikpathagar.org

চারপাশে অমুসলিম জনগোষ্ঠী দ্বারা বেষ্টিত হয়েও কেন বাংলাদেশের মানুষ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ? প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে যুগে যুগে অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণ বিরামহীন চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে যথাযথ তথ্য-প্রমাণের অভাবে তাদের সেই প্রয়াস কিছু তত্ত্ব বা অনুমানের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে সব সময়। ফলে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস থেকে গেছে অসত্য ও অস্পষ্টতার অন্তরালে। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের নিজের শেকড় সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই।

ধোঁয়াশা কাটিয়ে মুসলমানদের প্রকৃত ইতিহাসের অভিমুখ অন্বেষণ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ ভূখণ্ড কেন আজ মুসলিম অধ্যুষিত, কী করে বাংলায় কায়েম হয়েছিল মুসলমানদের রাজ—এসব প্রশ্নের পেছনে ছুটতে লেখক সন্ধান করেছেন আমাদের শেকড় আর ক্ষয়িষ্ণু শেকড়ের ধ্বংসাবশেষ। এ গ্রন্থটি নিছক ইতিহাস নয়; আমাদের আত্মসত্তার প্রামাণ্য দলিলও বটে।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

02-57163214, 01710 197558
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

978-984-95582-0-0

https://nagorikpathagar.org